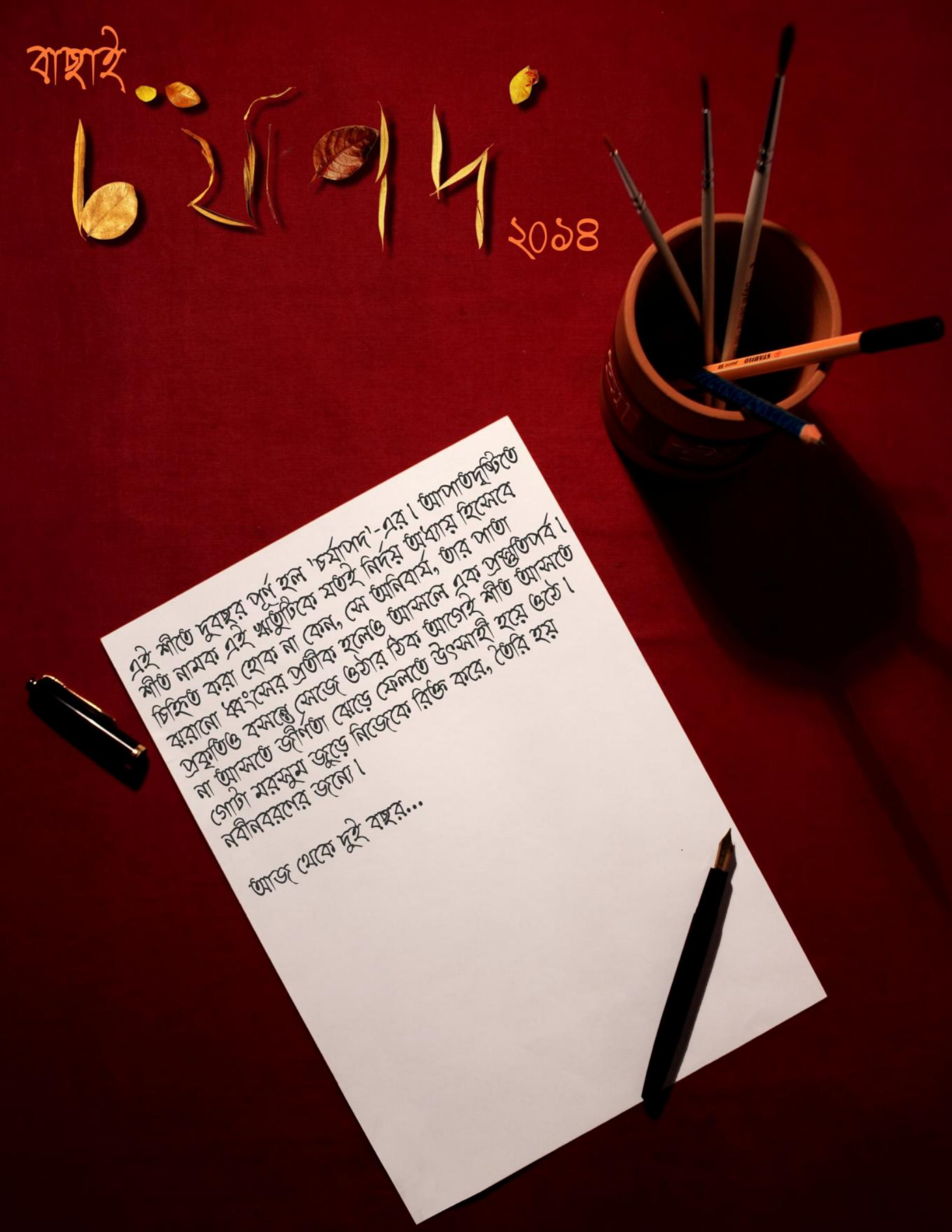

বাছাই
চর্যাপদ
২০১৪
এই শীতে দুবছর পূর্ণ হল 'চর্যাপদ'-এর। আপাতদৃষ্টিতে
শীত নামক এই ঋতুটিকে যতই নির্দয় অধ্যায় হিসেবে
চিহ্নিত করা হোক না কেন, সে অনিবার্য, তার পাতা
ঝরানো ধ্বংসের প্রতীক হলেও আসলে এক প্রস্তুতিপর্ব।
প্রকৃতিও বসন্তে সেজে ওঠার ঠিক আগেই শীত আসতে
না আসতে জীর্ণতা ঝেড়ে ফেলতে উৎসাহী হয়ে ওঠে।
গোটা মরসুম জুড়ে নিজেকে রিক্ত করে, তৈরি হয়
নবীনবরণের জন্যে।
আজ থেকে দুই বছর...

এই শীতে দু'বছর পূর্ণ হল 'চর্যাপদ'-এর। আপাতদৃষ্টিতে শীত নামক এই ঋতুটিকে যতই নির্দয় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হোক না কেন, সে অনিবার্য, তার পাতা ঝরানো ধ্বংসের প্রতীক হলেও আসলে এক প্রস্তুতিপর্ব। প্রকৃতিও বসন্তে সেজে ওঠার ঠিক আগেই শীত আসতে না আসতে জীর্ণতা ঝেড়ে ফেলতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। গোটা মরসুম জুড়ে নিজেকে রিক্ত করে, তৈরি হয় নবীনবরণের জন্যে।

আজ থেকে দুই বছর আগে ঠিক এইরকমই এক হিমশীতল হাতছানিতে ছিল এক সবুজ বসন্তের প্রতিশ্রুতি - পৃথিবী স্পর্শ করে 'চর্যাপদ'। মাত্র দু'বছরের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়কালের এই ছোট্ট পরিসরেই অঙ্কুরোদগম, চোখ মেলে তাকিয়ে দেখা ইতিউতি, ছোট ছোট দুই হাতের উষ্ণ অভ্যর্থনায় তার টলমল পায়ের দিকে এগিয়ে আসে সমর্থ হাত, এগিয়ে নিয়ে চলে ভবিষ্যতের দিকে।

এই এগিয়ে চলার পথে প্রথম বছর যাঁরা 'চর্যাপদ'-এর হাত ধরেছেন, তাঁদের সম্মান জানাতে প্রকাশিত হয়েছিল 'বাছাই চর্যাপদ - ২০১৩'। এবারে পালা দ্বিতীয় বর্ষে যাঁরা সঙ্গে ছিলেন এবং যোগ দিলেন। বিভিন্ন বিভাগ থেকে ২০১৪ এর সেরা ৩১টি লেখা সংগ্রহ করে প্রকাশিত হল এবারের সংকলন।

সম্পাদক, চর্যাপদ

৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৪

কবিতা

পলিটিক্যালি কারেক্ট কবিতারা	সৌরভ
ডায়েরির শেষ দিক থেকে	নবকলম
আমার স্কুল দিনের নীল চাইনিজ শার্টকে	থাংকমনি
অনামী	সত্যজিত
“এমন দিনে তারে বলা যায়”	মধ্যমপুরুষ

ছড়া ও অণুকবিতা

ঘুষ চুরি	পাগলা দাশু
ছুটকথা	নবকলম

গল্প

শুধুই প্রতীক্ষা	তুষার সেনগুপ্ত
একটি উপসংহার	শাক্যমুনি
ফিরে আসা	পাগলা দাশু
অপাঙতেয়	হযবরল
ফেরারী সময়	চিরন্তন

বারোয়ারী গল্প

কালঘুর্নি	আমরা সবাই

প্রবন্ধ

নিষিদ্ধ হস্তশিল্পঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	প্রত্যয়
অনেকের মাঝে একা হওয়ার একটু পরে	চু কিৎ কিৎ

মুক্তগদ্য

যাচ্ছেতাই আর কি	উত্তরায়ণ
হঠাৎ বৃষ্টি	চম
প্রাতর্ভ্রমণ	দাদামণি

সমকাল

একটি অনুপ্রেরণার অপমৃত্যু	মেঘনাদ
এলোপাথাড়ি ১	শাক্যমুনি
আধা গপ্পো, ফাঁদা গপ্পো	স্পন্দন চক্কোত্তি
বাজারবৃত্তি	হযবরল

রম্যরচনা

ভাতিছ গগন মাঝে	দাদামণি
তুমি বিষ ঢেলেছ কোন সকালে	হস্তিমূর্খ
রচনা যখন রম্য হল	শঙ্খ
পকেটমারের পাল্লায়	অতনু
কবি	অনুপম
ভক্তের ভগবান	পিব্যান্ডস

রান্নাবান্না

মিষ্টি পোলাও, ছোলার ডাল আর মাংসের ঝোল	দুর্বার

চিত্রগল্প

জিভের কেরামতি	প্রত্যয়

ভ্রমণ

একটি চমৎকার ভ্রমণকাহিনী	হস্তিমূর্খ

যাচ্ছেতাই আর কি

উত্তরায়ণ

নভেম্বর ২৪, ২০১৩

স্বয়ং অলস। মানে অলসতায় পি এইচ ডি। কিন্তু ব্যাপক আকাশচারী। হঠাৎ দেখে ফেলা যায় আকাশ ঘুড়ি। বাচাল মন অহেতুক ফুরফুরে। সাদা রুমাল পায়ে জড়িয়ে ভাড়া করা প্রেমিকার নতুন পারফিউমের মত পায়রা ওড়ে সুবাতাসে। চিন্তায় পেগ ৩ আর সস্তায় পেজ ৩ মিলেমিশে চেইন রিঅ্যাক্সন। খিচুড়ির সাথে ইলিশ ভাজার মত সেন্সরডের সাথে আনসেন্সরড ভাবনা। তবুও মাঝে মাঝেই মস্তিষ্কে তুখোড় বেচাল। ঘিলু ঘেঁটে একসা। কৌতূহলের জালে হাঁসফাঁস। বহুদিনের কল্পিত প্রশ্ন নতুনে অ্যাডেড হয়ে ফিরে ফিরে আসে ফিনিক্সের মত। বলতে পারেন গপ্প, সিনেমা, সিরিয়ালে সব নেপালি দারোয়ানের নাম কমন নাউনে বাহাদুর হয় কেন? সে সব বিদ্ধজনেরা পয়সা পেলে বলবেন। আমাকে তো কেউ দিচ্ছে না। তাই যা ছেঁড়াছেঁড়া এবং এলোমেলো বানান ভুল সহ লিখছিলাম সেভাবেই দিয়ে দি। সাজাতে বা মজাতে ইচ্ছে করল না... মাঝে মাঝে খারাপ লাগাতেও ইচ্ছে করে যে।

হেডলাইনের তেলেঙ্গানা আর জনমুক্তি মোরচার কভার স্টোরিতে মরচে ধরে। কেউ ইতিহাস ঘুরে আসে কেউ মাসল চেনায়। সময় মাত্র হোক বা বেশীমাত্রায়, ওয়াইজ নই তাই আওড়াতে পারব না "জা পল সাত্র"। তার চেয়ে ভালো ছোট্ট ইভানের রুসি গপ্পগুজবে ভল্গার তীর বা ওবেলিস্কের মেনহির। কে ফুল বা কে কতটা সেমি প্রাদেশিক সেটা বিচার করাতেই আলসেমি। চিন্তার ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়ে গ্লোবালাইসড কালনেমি। এ তো জানাই আছে নেপালিদের কাছে লেপচারা ব্রাত্য, বাঙ্গালিদের কাছে নেপালিরা ব্রাত্য আর ভারতবর্ষের কাছে বাঙ্গালীরা। ব্রাত্য ভুল বানানের প্রাবন্ধিক, কোটেশন ভুলে রবীন্দ্রনাথ ঘাঁটা একাডেমীর তার্কিক, সময়ের কাছে হেরে যাওয়া প্রেম প্লেটোনিক। প্রতিষ্ঠানের কাছে মানুষ, চাবুকের কাছে খোলা বুক। তাহলে কিসের লড়াই, কিসের আন্দোলন?

ঝোড়ো হাওয়ায় পর্দা উড়ছে। কিরাস্কিউরোর মাঝে মাঝে জানালার বাইরে টুকরো টুকরো ফ্রেম। একটা জল উপচে পড়া ম্যানহোল, একটা অন্ধকার গলিপথ, ভেজা আকাশের তেজ থেকে লুকোনো একটা শুকনো পাতার স্তূপ। ফাটা, দাঁত বের করা দেওয়ালে বোলবচন দেওয়াল লিখন, সিনেমার পোষ্টার। "বিপ্লব করব, আমরাই গড়ব"... ন্যাতানো কাগজের ছিলকে ওঠালেই ভুল বানান ইনটু সানি লিওনের মার্ডার টু। একসাথে দেখলে কি আপাদমস্তক বিপ্লবের চাড়টাই মার্ডার হয়ে যায় না?

শ্যামবাজারে আমার বন্ধুর বাড়িতে যেতাম। ঠিক শুটিং করে রাখবার মত ছাদ, ইটের দেওয়ালে জগৎসংসারের হিসেবের বলিরেখা, যাকে চলতি কথায় চিড় ধরা বলে। পুরনো বিয়ারের বোতল থেকে উঁকি মারা ছুটকো ছাটকা লম্বাটে ফুল, বৃষ্টির জল জমেছিল একটু একটু করে, কোনোদিন গল্পের থেকে কাক উড়ে এসে বীজ দিয়ে গেছে উপহার। তাতেই এই অ্যাল্কোহলিক ক্রিয়েশন। একটু খেয়াল করলেই ইলেট্রিকের তারে ছেঁড়া ঘুড়ির ধ্বংসস্তূপ, গত

বছরের বিশ্বকর্মা পুজোর চাঁদিয়াল ঢিল খেয়ে খেয়ে ড্রেনে উল্টে পড়া মাতালের থেকেও বেসামাল। বাড়িটাও আজ না হয় কাল শেষ নিশ্বাসের অপেক্ষায়; ফাটলের কোণে কোণে বাস্তুসাপের দল ঝিকিয়ে উঠছে। কোনাচে অন্ধকারে তাদের শরীর-পোশাকের শুকনো পরিচয়। বেশ একটা লিটল ম্যাগে অপার্থিব পদ্য জোগানোর মত পরিবেশ অথবা ভিন্টেজ কলকাতা নিয়ে ডকুমেন্টারির একটা এপিসোড। আমরা ভেবেছিলাম কোনোদিন সুযোগ পেলে এই ছাদে নিদেন একটা ছোট ছবি নামাবই। তা সে বাড়ির ফ্রেম ভেঙ্গেও পড়ল বছর চারেক আগে। আমাদের ক্যামেরার ফ্রেমও। দেড়শ বছরের ওজন সইতে পারলো না আর। আমাদেরও ছবি বানানো হল না। ইটের স্তূপে নতুন করে আশ্রয় নিল সাপগুলো। এখন তারা নিশ্চিন্তে খোলস ছাড়তে হয়তো অন্য বাড়ি খুঁজে নিয়েছে। তাতে কি আদৌ কবিতা গুলো মরে গেল? দ্রিমি দ্রিমি শব্দের কড়া নাড়া। মহুয়ায় ভর করে আজ নাচবে ওরা। ঝুরো ঝুরো ফুলকি ছুটবে দোটানায়। ছড়াবে ব্রাউনিয়ান মোশনে। ফসলের ঘ্রাণে বাতাস আনচান। আড়াল থেকে দেখবে অসংখ্য জ্বলন্ত চোখ। মিলেমিশে থাকলে নখের আঘাত পরোয়া করে না কেউ। চকচকে কত শরীর মিলে মিশে যাবে চাঁদের নীচে। বাধা নেই, বারণ নেই, এটিকেট নেই, কেতা নেই। ওদের পিঙ্ক ফ্লয়েডের শব্দ সাপোর্ট চাই না, ফেসবুক স্ট্যাটাসে বাঁধা বুকনি চাই না, চেনা আঁতেলের কবিতার বান চাই না... হয়তো ছিঁড়ে বেরোবার আগের মুহূর্ত এগুলোই। তাই নয় কি?

নিষিদ্ধ হস্তশিল্প : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

প্রত্যয়

জুন ২০, ২০১৪

ওদিকে যখন ভারতীয় লিবেরালরা ৩৭৭ ধারার অপ্রাকৃতিক যৌনতা সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা নিয়ে গলা ফাটাচ্ছেন, তখন মার্কিন মুলুকে মে মাসে সাড়ম্বরে পালিত হল ন্যাশনাল মাস্টারবেশন মান্থ। স্যান ফ্র্যান্সিস্কো, ফিলাডেলফিয়া আর মন্ট্রিয়েলে আয়োজন শুরু হয়েছে এবারের মাস্টারবেটোথন এর। ১৯৯৫ সালে গুড ভাইব্রেশন নামের সেক্স টয় কোম্পানি যখন প্রথম মে মাসকে জাতীয় হস্তমৈথুন মাস হিসেবে চিহ্নিত করল, তখন অনেক প্রাচীনপন্থীরাই নাক সিঁটকেছিলেন, বলেছিলেন এ কেবল তাদের প্রোডাক্ট বিক্রি করার ছলাকলা। সে যাই হোক না কেন, এরপর তারা আরো কিছু সংস্থার সঙ্গে মিলে ১৯৯৯ সালে প্রথম চালু করল হস্তমৈথুন নিয়ে ওলিম্পিকের মত উৎসব, মাস্টারবেটোথন। দেখা গেল মানুষ দলে দলে যোগ দিচ্ছেন। সেই থেকে খুব নিয়মিতভাবে না হলেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে এসেছে এই উৎসবের ধারা। এর ফলে গুড ভাইব্রেশনের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠুক না উঠুক, এর মাধ্যমে যৌন শিক্ষা, মেয়েদের যৌন স্বাস্থ্য এবং যৌনরোগ প্রতিরোধের জন্য সংগৃহীত হয়েছে ২৫০০০ ডলারেরও বেশি। আর হস্তমৈথুন সম্পর্কে সামাজিক নাক সিঁটকানিও ধীরে ধীরে অনেকটা কমে এসেছে এদেশে। মাস্টারবেটোথনে কি ধরনের প্রতিযোগিতা হয় তার বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। উইকিপিডিয়ার এই পেজ থেকে তার হদিস পেয়ে যাবেন, এমন কি বিশ্বরেকর্ডগুলির লিস্টি দেখে চোখ কপালে উঠতে পারে। কেউ হয়তো একে পার্ভারশন বলে ট্যাগ সেঁটে দেবেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? হস্তমৈথুন কে সমাজের চোখে ট্যাবু করে রাখার যে প্রচেষ্টা যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে, তার বিরুদ্ধেই মাস্টারবেটোথন এর জেহাদ। কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই লড়াই? আসুন একটু পিছন ফিরে দেখা যাক।

মাস্টারবেটোথনের লোগো

৩৭৭ ধারা অনুযায়ী কেবল হোমোসেক্সুয়ালিটি নয়, আরও বিভিন্ন রকম যৌন আচরণ অপরাধের তালিকায় পড়ে (উদাঃ – ওরাল সেক্স)। তবে হস্তমৈথুন সরাসরি এর আওতায় পড়েনা। কিন্তু আইনই তো সব না, ভারতবর্ষে হস্তমৈথুনই বোধহয় সেই কাজ যা সবচেয়ে বেশি লোকে অপরাধবোধে ভোগা সত্বেও করে থাকে। যৌন শিক্ষার

ব্যাপারে আমাদের সমাজের আগ্রহের অভাব, সংস্কৃতির ধুয়ো তুলে যৌনতাকে নিয়ে হাজারো বিধিনিষেধ এবং ফলস্বরূপ হাজারো প্রাচীন কুসংস্কার... এর ফলে একটি অ্যাডোলেসেন্ট ছেলে বা মেয়ের মনে নানান রকম ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়, যা কেবল তাদের ব্যক্তিগত জীবনই নয়, সামগ্রিকভাবে সমাজের পক্ষেও ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়। অথচ প্রাচীন ভারত কিন্তু ছিল যৌনতার ব্যাপারে অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় অনেক বেশি উদারমনস্ক। ঠিক কবে থেকে এবং কেন এই বিধিনিষেধ গুলি চালু হতে শুরু করল সেই নিয়ে চর্যাপদেই বন্ধু শাক্যমুনির একটি ব্লগে একবার আলোচনা হয়েছিল। তবে আমরা আজ শুধু ভারত নয়, সারা পৃথিবীর দিকেই তাকাবো। দেখব কিভাবে মানুষের স্বাভাবিক এই যৌন প্রবৃত্তিকে ধর্ম এবং কুসংস্কার এর সিন্দুকে বন্দি করে ফেলা হল।

সেই গুহাবাসী মানুষের সময় থেকেই হস্তমৈথুনের নিদর্শন পাওয়া যায় বিভিন্ন গুহাচিত্রের মাধ্যমে। এরপরে নানান প্রাচীন সভ্যতায় এর রেওয়াজ ছিল বলে দেখা গেছে। প্রাচীন গ্রীক, ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় সভ্যতায় এর ভুরি ভুরি নিদর্শন। প্রাচীন গ্রীসে পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই হাত এবং অন্যান্য বস্তুর সাহায্যে স্বমেহনে অভ্যস্ত ছিলেন। সেলফ সেক্সকে ঘিরে নানারকম রিচুয়ালস ও চালু ছিল সেই সময়। প্রাচীন চীন দেশেও হস্তমৈথুনের নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন সভ্যতায় এটিকে পাপ কাজ বলে মনে না করলেও এর ফলে শারীরিক ক্ষতি হবার ভয় থেকে তারা মুক্ত ছিল না। চীনদেশে যেমন এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বীর্যপাত করলে দেহের ভাইটাল শক্তির ক্ষয় হয় এবং সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। আধুনিক গবেষণা যদিও বলে এই ধরনের ভয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তবু সেই সময় কেন এরকম আশঙ্কা মানুষের মনে ছিল সেটা আন্দাজ করাই যায়। তখনও দেহে কোষের ভূমিকা সম্পর্কে মানুষ অবগত ছিলনা, জানতনা যে রক্ত থেকে শুরু করে দেহের অন্যান্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের কোষই কিছুদিন পর মরে যায়, আবার নতুন করে নতুন কোষের জন্ম হয়। তাই রক্তদান করলে যেমন মানুষের ক্ষতি হয়না, তেমনই দেহ থেকে বীর্য বার হয়ে গেলেও বীর্য বা শুক্রাণু কমে যায়না।

প্রাচীন গ্রীসের একটি পাত্রে হস্তমৈথুনের ছবি

ভারতেও এই ধরনের ভয়ের নিদর্শন পাওয়া গেছে। বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদে বর্ণিত আছে যে অপ্রয়োজনে বীর্যক্ষয় স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। মনু সংহিতায় বলা হয়েছে দেহের সুখলাভের জন্য স্বমেহন করলে সেটা পাপ এবং তার

প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন। তবু বলা যেতে পারে সনাতন হিন্দু ধর্মই ছিল সমস্ত প্রাচীন ধর্মের মধ্যে যৌনতার ব্যাপারে সবচেয়ে মুক্তমনা। এই ধরনের ছুটকো ছাটকা কিছু নির্দেশ বাদে বাদবাকি সমস্ত জায়গাতেই যৌনতার ব্যাপারে কোনও রাখঢাক করা হয়নি, বরং সেটিকে জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাৎস্যায়নে কামসূত্রে তো হস্তমৈথুনের ব্যাপারে আলাদা করে বর্ণনাই আছে, কিভাবে শ্রেষ্ঠ উপায়ে সেটা করা যায় তারও নির্দেশ দেওয়া আছে। দুর্ভাগ্যবশত সনাতন ভারতের সেই মুক্ত মন পরবর্তীকালে সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। তার ওপর ২০০ বছরের ইংরেজ শাসনও তার ভিক্টোরিয়ান মনোভাব চাপিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সমাজের ওপর। তাই কামসূত্র হয়ে গেছে "নিষিদ্ধ" বই, আর ঘেঁটে যাওয়া ব্রহ্মচর্যের কনসেপ্ট চাপানোর চেষ্টা চালানো হয়েছে কিশোরদের ওপর। আর কিশোরীদের? ধুর! মেয়েদের আবার যৌন খিদে থাকতে আছে নাকি?

নানান প্রাচীন সভ্যতায় হস্তমৈথুনের দিব্যি চল থাকলেও অষ্টাদশ শতকের শুরুর দিক থেকে বিভিন্ন দেশে শুরু হয় এর প্রবল বিরোধিতা। হঠাৎ করে শুরু হয় বললে ভুল হবে। গোঁড়া ধার্মিকরা বহুদিন থেকেই এই অভ্যাসকে "পাপ" আখ্যা দিয়ে মানুষকে ভয় দেখিয়ে আসছেন। ইসলাম, খ্রীষ্টান, ইহুদী সব ধর্মের ধর্মগুরুরাই এর বিরোধিতা করেছেন, সে তাঁদের মূল ধর্মগ্রন্থে স্পেসিফিকালি একে পাপ বলে উল্লেখ থাক বা না থাক। আসলে সন্তান ধারনের প্রয়োজন ছাড়াও স্রেফ দৈহিক সুখলাভের জন্য যৌনতা – এই ব্যাপারটাই সব ধর্মের না-পসন্দ। "প্রোক্রিয়েশন" এর বাণী আউড়ে খ্রীষ্টান ক্যাথলিক চার্চগুলো অন্য যে কোনো ধরণের যৌনতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। শুধু হস্তমৈথুন নয়, তার মধ্যে রয়েছে সমকামিতা, ওরাল বা অ্যানাল সেক্স, এমনকি জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্য কন্ডোম জাতীয় ব্যারিয়ারের ব্যবহারও। এমনকি মাদার টেরেসার মত ব্যক্তিত্বও এই ধরণের প্রচার করে গেছেন! এক সময় চার্চ এমনও বলেছে যে ধর্ষণের চেয়েও হস্তমৈথুন বড় পাপ। কেন? না ধর্ষণে তো তাও "প্রোক্রিয়েশন" অর্থাৎ নতুন শিশুর জন্মের সম্ভাবনা থাকে, হস্তমৈথুনে সেটাও নেই!! আমেরিকার কিছু অঞ্চলে হস্তমৈথুনের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডও ঘোষণা করা হয়েছিল!

ইহুদীরাও এই ধরণের তত্ত্বে বিশ্বাস করত। তাই যে ধরণের যৌনতায় সন্তানলাভের সম্ভাবনা নেই তাকে পাপ হিসেবে ঘোষণা করেছিল তারা। বিশেষ করে "পুল আউট" পদ্ধতি, অর্থাৎ সঙ্গমের সময় যোনির বাইরে বীর্যপাতের মাধ্যমে কন্ট্রাসেপশন অভ্যাস করলেও সেটা অপরাধ হিসেবে গণ্য হত। গোঁড়া ধার্মিকরা তো ছিলেনই, অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় শুরু হল ডাক্তারদের তরফে হস্তমৈথুনের বিরোধিতা। সুইস ডাক্তার স্যামুয়েল টিসোর লেখা বিখ্যাত বই "ওনানিসম" এ ব্যাখ্যা করা হয় যে হস্তমৈথুন করলে গেঁটে বাত এবং দৃষ্টিশক্তির সমস্যা থেকে শুরু করে নার্ভাস সিস্টেমের চরম ক্ষতি এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। আরও বিভিন্ন হাতুড়ে ডাক্তার এই ধরনের প্রচার চালাতে থাকেন। ধর্মবিশ্বাসীরা তো আগেই পাপের ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলেন, এখন অন্যান্যরাও ভয় পেতে শুরু করলেন। এই ভয় ছড়িয়ে গেল সারা বিশ্বেই। মার্ক টোয়েনের মত ব্যক্তিত্বও এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন "When you feel a revolutionary uprising in your system, get your Vendome Column down some other way- don't jerk it down." অথচ সদ্য কৈশোরে পা দেওয়া ছেলে-মেয়েরা তো এত জানেনা। তারা হস্তমৈথুন করতে গিয়ে অনেক সময়ই ধরা পড়ে যায় বাবা-মায়ের কাছে। তারপর যা হয় সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। বাবা-মা-রা সন্তানের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে এইসব হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়া শুরু করলেন।

এবং সেই ডাক্তাররা চিকিৎসা হিসেবে ছেলেদের লিঙ্গের ফোরস্কিন বিশ্রীভাবে কেটে দেওয়া বা মেয়েদের ক্লিটোরিস কেটে বাদ দেওয়া অথবা গরম ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া, এই ধরণের আসুরিক চিকিৎসা করতে লাগলেন... যাতে ব্যাথার চোটে তারা হস্তমৈথুনে বিরত থাকে। এমন কি পুরুষাঙ্গ বা অণ্ডকোষ কেটে বাদ দেওয়ার মত ঘটনাও ঘটেছে খোদ আমেরিকার বুকে। যারা ধরা পড়ে গিয়ে এই ধরণের অত্যাচারের শিকার হত তাদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, বাকি যারা লুকিয়ে স্বমেহন চালিয়ে গেল তাদেরও মনে জন্ম নিল অস্বাভাবিক ভয় এবং সেগুলো নিঃসন্দেহে তাদের মানসিকভাবে সমস্যায় ফেলতে লাগল।

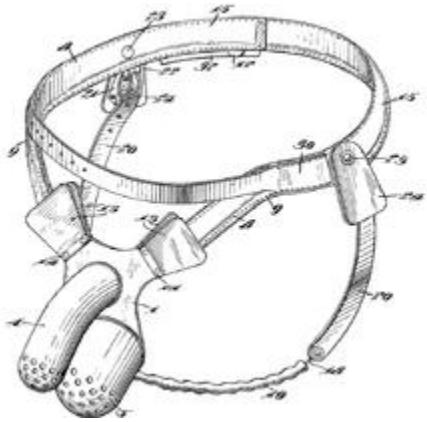

একটি চেস্টিটি বেল্টের ডিজাইন

এই পরিস্থিতি চলতে থাকে অনেকদিন পর্যন্ত। এমনকি বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও আমেরিকার স্কুলপাঠ্য জীবনবিজ্ঞান বইয়ে হস্তমৈথুনকে একটা রোগ হিসেবে উল্লেখ করা ছিল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রোগের কারণ হিসেবে জীবাণুর ভূমিকা সম্পর্কে মানুষ যত অবগত হতে লাগল তত এই ধরণের ভুল ধারণা ভাঙতে শুরু করল। সিফিলিস, গনোরিয়ার মত যৌনরোগ যে আসলে জীবাণুর আক্রমণে হয় সেগুলো আবিষ্কার হওয়ার পর বোঝা গেল ওই অসুস্থতাগুলো তবে হস্তমৈথুনের কারণে হত না। আর হবেই বা কিভাবে ভাবুন দেখি? সঙ্গমের সময় যেভাবে যৌনাঙ্গগুলি উত্তেজিত হয় সেটাকেই হাতের সাহায্যে সিমুলেট করা হচ্ছে, তা যদি ক্ষতিকর হত তবে তো যৌনমিলন ব্যাপারটাই ক্ষতিকর হত! ওদিকে কিনসের বিখ্যাত সার্ভে থেকে দেখা গেল প্রায় ৯০ শতাংশ পুরুষ এবং ৭০ শতাংশ নারী এই অভ্যাসে অভ্যস্ত। এত বিপুল পরিমাণ লোক যখন দিব্যি স্বাভাবিক রয়েছেন তখন এটি যে ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর কিছু নয় সেটা বলাই বাহুল্য। বরং ধীরে ধীরে গবেষণায় দেখা যেতে লাগল হস্তমৈথুন খারাপ তো নয়ই, বরং এর অনেক ভাল গুণ আছে। তার মধ্যে বেশিরভাগই যেকোন উপায়ে যৌন তৃপ্তির পাওয়ার সঙ্গেই যুক্ত। অর্থাৎ মন ভাল থাকা, স্ট্রেসমুক্ত থাকা থেকে শুরু করে পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রোস্টেট ক্যান্সারের সম্ভাবনা কমানোরও নিদর্শন পাওয়া গেছে। তার সঙ্গে উপরি পাওনা হল এর মাধ্যমে এইডস বা অন্যান্য যৌন ব্যাধি ছড়াবার ভয় নেই, যা কিনা অনেক অপরিণত ছেলেমেয়ে আনসেফ সেক্স এর মাধ্যমে বাধিয়ে বসে। তাই আজকালকার ডাক্তাররা এতে বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, বরং উৎসাহ দেন। কেবল সিঙ্গল নর-নারীর জন্যেই নয়, কাপলদের জন্যও একক বা যৌথ হস্তমৈথুন সময় বিশেষে উপযোগী বলা হয়। এও দেখা গেছে যাঁরা আগে

থেকে হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত, সেরকম কাপলদের মধ্যে সেক্সুয়াল কম্যুনিকেশন অনেক ভাল হয়। আপনি কিভাবে সবচেয়ে বেশি অ্যারাউজড হন সেইটে নিজে ভাল ভাবে বুঝলে তবেই না সেটা আপনার পার্টনারকে বলতে পারবেন? আফটার অল, কবি তো বলেইছেন – "আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবেনা/ এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা..."। তাই আধুনিক যৌনবিজ্ঞান বলছে "হস্তমৈথুন কেবল লুজার-রা করে (অর্থাৎ যারা সেক্স পার্টনার জোটাতে পারেনা তারা)" এই প্রাচীন ধারণাকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলার সময় এসেছে।

কিন্তু তবু সমাজ কি সেটা মেনে নিয়েছে? পশ্চিমে কিছুটা মেনে নিলেও ভারতে তো একেবারেই না। সবাই জানে যে বেশিরভাগ মানুষই হস্তমৈথুন করে থাকেন, বা অন্তত কখনো করেছেন। তবু একে ঘিরে এক অদ্ভুত লুকোছাপা। সেক্স এডুকেশন ব্যাপারটাই এখনও গৃহীত নয় সেভাবে। সুতরাং এ আর আশ্চর্য কি? সভ্য সমাজে এই শব্দটি উচ্চারণ করাটাই অশ্লীলতা বলে মনে করেন অনেকে। অনেকে যুক্তি দেবেন এটা তো একটা খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার, এ নিয়ে আলোচনা করতে যাব কেন? যুক্তিটা ঠিক ধোপে টেকেনা। প্রেম-ভালোবাসা, যৌনতা এই সমস্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেটা আপনি কারো সাথে শেয়ার করবেন কিনা সে আপনার ইচ্ছে। তা বলে কেউ সে নিয়ে আলোচনা করলেই "ছি ছি" রব, বা হস্তমৈথুন নিয়ে রাখঢাকের মাধ্যমে সেই সংক্রান্ত কুসংস্কারগুলি জিইয়ে রাখা কি কাজের কথা? ভাবুন তো, আপনার সন্তান যদি এই ভয় নিয়ে স্বমেহন করে যে এর ফলে তার হাতের চেটোয় চুল গজাবে, বা মুখে ব্রন হবে, কিম্বা শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে, তাহলে তার মানসিক প্রভাবটা কি ভাল কিছু হবে? গবেষণায় দেখা গেছে টিনেজারদের মধ্যে হস্তমৈথুনের খারাপ প্রভাব সত্যি সত্যি হয়ে থাকে অনেক সময়, আর সেটা পুরোটাই এই ধরনের ভয় বা অপরাধবোধ থেকে জন্মানো। এই ধরনের একটি মানসিক সমস্যার কথা জানতে এই আর্টিকলটি পড়ে দেখতে পারেন। এরকম অপরাধবোধ না থাকলে কোনো ধরনের শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনাই নেই যদি না এটি নেশায় পরিণত হয়। যে কোনো ধরনের নেশা (এমন কি চায়ের নেশাও) বা কম্পালসিভ আচরণের মতই এই নেশাও মানসিক দিক থেকে ক্ষতিকর। তা না হলে হস্তমৈথুন যে অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি কাজ, সেই গ্রহণযোগ্যতাটা সবার আগে আসা দরকার। সেই সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই আসবে সমাজে, শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্রে এই ব্যাপারে মুক্ত চিন্তা।

চলচ্চিত্র বলতে মনে পড়ল অ্যানি হল ছবিতে উডি অ্যালেনের সেই ডায়ালগ – "Don't knock masturbation. It's sex with someone you love." মজার হলেও কথাটা কিন্তু ভাবার! পশ্চিমী এরকম অনেক ছবিতেই স্থান পেয়েছে হস্তমৈথুন। অথচ ভারতীয় ফিল্মে সুড়সুড়ি দেওয়া যৌনতার ছড়াছড়ি হলেও এই ব্যাপারটি ব্রাত্য থেকে গেছে। সম্প্রতি একটি সেন্সর পাশ বাংলা ফিল্মে স্পষ্টভাবে এর উল্লেখ দেখলাম। এছাড়া আরও হাতে গোনা কিছু ফিল্ম বাদে এই ব্যাপারে কিছুই চোখে পড়েনি, চিত্রায়ণ তো দূরের কথা। সাহিত্যের ব্যাপারেও একই কথা খাটে। অথচ স্বমেহন কিন্তু সাহিত্য বা ফিল্মে স্থান পাওয়ার মত একটি অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং বিষয়, কারণ এর সঙ্গে যুক্ত থাকে গভীর সাইকোলজিকাল ব্যাপার স্যাপার। মানুষের সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসির বহিঃপ্রকাশের একটি অন্যতম ক্ষেত্র হল স্বমেহন। ফরাসী সাহিত্যিক ফ্লবেয়ার এর বিখ্যাত উক্তি "Pleasure is found first in anticipation, later in memory" যে যৌন ফ্যান্টাসির ক্ষেত্রে কতটা সত্য তা রসিক মাত্রেই জানেন। এই ফ্যান্টাসি অনেক সময় তথাকথিত এথিক্স এর গণ্ডিও ছাড়িয়ে যায়। সেটা ঠিক কি ভুল সে তর্কে না গিয়ে এটুকু বলাই যায় যে এমন

ইন্টারেস্টিং একটি সাবজেক্ট নিয়ে ভবিষ্যতে ভারতীয় শিল্পে সাহিত্যে আরও খোলামেলা প্রকাশ দেখার অপেক্ষায় থাকব।

একবার আমার এক প্রতিভাবান বন্ধুকে (তিনিও ঘটনাচক্রে এই ব্লগের সদস্য) সেই বিখ্যাত "নিষিদ্ধ" ফিল্ম Y2K এর কায়দায় জিজ্ঞেস করেছিলাম "আচ্ছা রবি ঠাকুর কি কখনও হস্তমৈথুন নিয়ে কাব্যি লিখেছেন?" সে বললে "হ্যাঁ, সেরকম আছে বটে, বৃদ্ধ বয়েসে একদিন কবি হঠাৎ সফলভাবে হস্তমৈথুন করতে পেরে আনন্দে লিখে ফেলেন -

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন, ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে।
লক্ষ যুগের অন্ধকারে ছিল সঙ্গোপন, ওগো, তায় জাগাইনু রে॥
পোষ মেনেছে হাতের তলে যা বলাই সে তেমনি বলে –
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনু রে॥"

খিল্লি অ্যাপার্ট, এ যুগেও হস্তমৈথুন নিয়ে রাখঢাক কিন্তু কেবল ব্যক্তিগত গোপনীয়তার কারণেই সীমাবদ্ধ নেই। হস্তমৈথুন নামক "রোগ" নিরাময়ের উপায় জানেন বলে দেওয়ালে দেওয়ালে বিজ্ঞাপন দেওয়া হাতুড়ে ডাক্তারদের ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি পর্যন্ত মনে করেন এটি ন্যাচারাল নয়, একটি কৃত্রিম ব্যাপার, সেহেতু বর্জনীয়। অথচ বিজ্ঞান বলছে অন্য কথা! কুকুর, ঘোড়া, বাঁদর থেকে শুরু করে সজারুকে পর্যন্ত নিয়মিত স্বমেহন করতে দেখা গেছে। টেকনিকালি একে "হস্ত"মৈথুন বলা যাবেনা, কেউ ব্যবহার করে পা, কেউ অন্য কোনো অঙ্গ। এমন কি গাছের ডাল ইত্যাদি বাহ্যিক বস্তুর সাহায্য নিতেও দেখা গেছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে হোমোসেক্সুয়ালিটি বা স্বমেহন কে জাস্টিফাই করার জন্য অন্যান্য জীবজন্তুর উদাহরণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আমি দেখিনা। যদি এমনও হত কেবল মানুষই এই অভ্যাসে অভ্যস্ত, তবু তাকে আন-ন্যাচারাল মোটেই বলা চলেনা। মানুষের করা যেকোনো জিনিসকেই আমরা দুম করে আন-ন্যাচারাল আখ্যা দিয়ে দিই। অথচ মৌমাছি যখন তার কারখানায় মধু তৈরি করে, তাকে কিন্তু আমরা "হান্ড্রেড পার সেন্ট ন্যাচারাল হানি" বলে থাকি! সব চেয়ে বড় কথা, অপ্রাকৃতিক হলেও সেটা খারাপ বা বর্জনীয় এমনও কোনো কথা নেই। তাহলে তো সেই যুক্তিতে রোগ হলে পরে চিকিৎসার ব্যবস্থা সবার আগে বন্ধ করে দিতে হয়! আর পেসমেকার এর মত কৃত্রিম জিনিস তো নৈব নৈব চ!

যা দিয়ে শুরু করেছিলাম ফিরে আসি সেই মাস্টারবেটাথনে। এটা কি কেবল একটি সেক্স টয় কোম্পানির নিজেদের প্রোডাক্ট বেচার ছলছুতো? নাকি সত্যিই এর প্রয়োজন আছে আমেরিকার মত দেশে? বছর কয়েক আগেও আমার ধারণা ছিল এই ধরণের ব্যাপারে আমেরিকা খুব লিবেরাল একটি দেশ। এসে বুঝলাম সে ধারণা কতটা ভুল। ভারতের তুলনায় বেশি উদার তো বটেই, কিন্তু এখনও এখানে প্রাচীনপন্থী এবং গোঁড়া লোকজনের অভাব নেই। ফলতঃ এদেশের রাজনীতি এখনও ধর্মীয় এবং গোঁড়া ব্যাপারস্যাপার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তারই ভুক্তভোগী প্রাক্তন ইউ এস সার্জন জেনারেল জোসেলিন এল্ডার্স। এইডস এর প্রবল প্রকোপ সামলাতে যখন সারা

দেশ হিমশিম খাচ্ছে তখন ইনি সেক্স এডুকেশন এবং হস্তমৈথুনকে প্রোমোট করতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন যে যৌনতার এই নিরাপদতর উপায়টি সম্পর্কে স্কুলের ছেলেমেয়েদের জানানো উচিত। তাঁর এই "অতি-প্রোগ্রেসিভ" মন্তব্য নেওয়ার মত সাবালক তখনও হতে পারেনি আমেরিকা। ক্লিন্টন সরকার তাই এই কেচ্ছা চাপা দিতে তৎপর হয়ে ওঠে এবং জোসেলিনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। মজার ব্যাপার, এই ক্লিন্টনই কিছুদিন পর ফেঁসে যান যৌন কেচ্ছায়। তিনি অবশ্য পদত্যাগ করেননি।

জোসেলিন এল্ডার্স

শেষ করার আগে এ কথা বলতেই হয় যে যদিও ডাক্তারী শাস্ত্র এই মুহূর্তে বলছে হস্তমৈথুন এমনকি বেশি বেশি করলেও অসুবিধে কিছু নেই, তবু বিজ্ঞানে চরম সত্য বলে কিছু নেই। হয়তো ভবিষ্যতে কোনো ক্ষতিকর দিক (শারীরিক না হলেও মানসিক) আবিষ্কার হতেই পারে। কিন্তু তার জন্য দরকার লুকোছাপা বন্ধ করে মুক্ত মনে একে গ্রহণ করা এবং প্রয়োজন মত গবেষণা চালানো। শুধু পশ্চিমেই নয়, আমাদের দেশেও অনেক বিজ্ঞানী এই ধরনের বিষয় নিয়ে নিরলস গবেষণা করে চলেছেন। আমাদের সমাজ কবে এই গোঁড়ামি কাটিয়ে উঠতে পারে সেটাই দেখার...

**পুনশ্চ – বিখ্যাত ব্যক্তিদের উক্তি আউট অফ কনটেক্সট ব্যবহার করা এবং রবি ঠাকুরকে নিয়ে খিল্লি করার জন্য কেউ রেগে গিয়ে থাকলে মার্জনা চাইছি। আসলে রঞ্জন বাবু তো দেখিয়েই দিয়েছেন যে বিখ্যাত লোকেদের সঙ্গে যৌনতা অ্যাড করতে পারলে তাঁদের খ্যাতি এবং "বটতলা" দুদিকেরই মাইলেজ পাওয়া যায়। সেই ভেবেই...* 😛

*** লেখাটির তথ্যাবলী বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত। পদে পদে রেফারেন্স দিয়ে রসভঙ্গ করতে চাইনি। এই বিষয়ে আরও জানতে চাইলে কেউ নিচের বই দুটি পড়ে দেখতে পারেন, আমার বেশিরভাগ তথ্যের উৎসই সেখানে পাবেন।*

১) Masturbation as a Means of Achieving Sexual Health, editor: Eli Coleman and Walter Bockting

২) Sex and Reason, Richard A Posner

এছাড়া এই আর্টিকলটি এবং দার্শনিক অ্যালান ওয়াটস এর এই বক্তৃতাটি বেশ ইন্টারেস্টিং। যথক্রমে পড়ে এবং শুনে দেখার অনুরোধ রইল। ছবির সূত্র – উইকিপিডিয়া।

পলিটিক্যালি কারেক্ট কবিতারা

সৌরভ

নভেম্বর ৮, ২০১৪

স্বপ্নে দেখেছি -
সার সার লাইন দিয়ে
দাঁড়িয়ে আছে ওরা,
কেউ কারোর দিকে
ঢলে নেই একটুও,
দাঁড়ি, কমা, যতিচিহ্নের জঙ্গলে
আমার পলিটিক্যালি কারেক্ট কবিতারা।

ব্যুৎপত্তিগতভাবে নিখুঁত করতে চেয়ে
ওদের প্রেম, সেক্স, বিদ্রোহগুলো
কেড়ে নিয়েছি, ওদের স্নানঘর
কেড়ে নিয়েছি।
স্নানের সময়গুলো আশ্চর্যরকম ভাবে
শুধু ফেনার জন্ম দেয়...
রাতে নিশ্চিন্তে ঘুম এনে দেয়
পলিটিক্যালি কারেক্ট কবিতারা।

শুধুই প্রতীক্ষা

তুষার সেনগুপ্ত

জুলাই ২০, ২০১৪

সোহাগীর আজ সকাল থেকেই মন ভালো নেই। তিন বাড়ির ঠিকে কাজ, বাসন মাজা আর ঘর ঝাড়-পোঁছ। নায়েক গিন্নি বাপের বাড়ি গেছে। কেন কে জানে গিন্নি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বাপের বাড়ি গেলে দাদা একা থাকলেই সোহাগীর সচেতন ছুটি। এইতো আজই, মহালয়ার দিন গেল, ফিরতে ফিরতে সেই লক্ষ্মীপুজো। যাওয়ার আগে অবশ্য শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ ঠিক মনে করে দিয়ে গেছে, সঙ্গে একশো টাকা পুজোর বকশিসও। নায়েক বাড়ি ছুটি, বাকি দু'বাড়িতেও ডুব মেরে দিলো সোহাগী। তিন বছর হয়ে গেলো বিয়ে হয়েছে, সেই সুদূর মেদনিপুরের কোলাঘাট থেকে একেবারে উড়িষ্যার পারাদ্বীপের এই মেছুয়া বস্তিতে। ছেলেপুলে হয়নি বলে পাড়া পড়শি গুজগুজ ফুসফুস করে, কানে এলেও গায়ে মাখেনা। আজ একটু তরিবৎ করেই রাঁধছে সোহাগী। বাঙালী হলেও উড়িয়া ঘরের বৌ তো! বিয়ের পরেপরেই ডালমা রাঁধাটা শিখে নিয়েছে। অন্যদিন হলে চার-পাঁচ হাতা ডালমা দিয়েই দু'থালা গরম ভাত জগাইয়ের পেটে সেঁধিয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। আজ আবার তার সাথে কষাকষা মুরগির মাংস। রান্না শেষ, সার কারখানার বেলা দুটোর সাইরেন বেজে গেলো। বেআক্কেলে লোকটার এখনও পাত্তা নেই। সেই সাত সকালে একথালা পখাল (পান্তাভাত) আলুচোখা (আলুসেদ্ধ) দিয়ে সাঁটিয়ে কোথায় যে চরতে গেলো, নিশ্চয় তাসের আসরে। শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে জানলা দিয়ে আকাশটা দেখল, কেমন যেন মেঘলা মেঘলা ভাব। অজানা আতঙ্কে কপালে হাত ঠেকিয়ে চোখ বুজে মনেমনে জগন্নাথের কাছে মানত করে নিলো, এযাত্রায় জগাই ফিরলেই একেবার পুরী গিয়ে মহাপ্রভুর চরণে পুরো একশো এক টাকার পুজো চড়িয়ে আসবে।

***

জগাইয়ের ভালোবাসার মিষ্টি অত্যাচারে সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি সোহাগী। জগাইয়ের মৃদু ধাক্কায় চোখ খুলেই বুঝল, স্বামীসোহাগের ক্লান্তিতে কাকভোরে জগাইয়ের উদোম চওড়া বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখ খুলে জগাইয়ের সুঠাম শরীরে নিজের শরীরটা একেবারে মিশিয়ে দিয়ে আবেশ মাখানো আদুরে গলায়, অদ্ভুত একটা স্বভাবসুলভ উড়িয়া মেশানো বাংলায় বলল,

- হ্যাঁগো! মেঘটা ভালো ঠেকতিসে না, তমে সত্যই যিবা পড়িব?

কোনও উত্তর না দিয়ে, সোহাগীর ঠোঁটে হালকা চুমু খেয়ে জগাই উঠে পড়লো। এখুনি তৈরি হয়ে বেরতে হবে, বাকী সবাই বোধহয় এতক্ষণে এসে গেছে। সকাল সকাল ট্রলার না ছাড়লে জাহাজের যাতায়াত শুরু হয়ে যাবে, পোর্টের সিগনাল স্টেশন আর যাওয়ার অনুমতি দেবেনা।

সোহাগীর বানানো মিষ্টি চা, সাথে গত রাতের দুটো বাসি রুটি। কোনও মতে রুটির শেষ টুকরোটা মুখে ঢুকিয়েই বেড়িয়ে পড়লো জগাই আর প্রতিবারের মতই পিছুপিছু সোহাগী। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে জেটিতে পৌঁছে দেখল সাগরপাড়ি দিতে ওদের ট্রলার তৈরি, জগাইয়ের জন্যেই অপেক্ষা করছে। জেটির সাথে বাঁধা ট্রলারের দড়িটা খুলে দিয়েই লাফ দিয়ে চড়ে গেলো ট্রলারে। ভুটভুট শব্দ করতে করতে ট্রলারটা ব্রেকওয়াটার পেরিয়ে ক্রমশই দূরে আরও দূরে...

***

ক্রমশ আবছা হতে থাকা ট্রলারটা অসীম দরিয়ায় মিলিয়ে যেতেই সজল চোখে ঘাড় ঘোড়াতেই সোহাগীর নজরে পড়লো সুভদ্রাকে। এইতো গতবছর ঠিক দুগ্গাপুজোর আগে আগেই সুভদ্রার কপাল পুড়ল। মহালয়ার দিন সাতসকালে ট্রলার ভাসল। আরও আটজনের সাথে বলরামও গেল সমুদ্রে মাছ ধরতে। কে জানতো মহা অষ্টমীর সন্ধ্যেয় তছনছ করে দেবে সবকিছু। রাক্ষুসে তুফান ফাইলিনে হারিয়ে গেলো ট্রলারটা। সুভদ্রা কিন্তু এখনও বলরামের ফেরার অপেক্ষায় রোজ কাকভোরে দূর দরিয়ার বুক চিরে উঠতে থাকা লাল সূর্যটার মঝে খুঁজে বেড়ায় সেই লাল কালো ডোরাকাটা ট্রলারটা...

এই প্রথমবার সোহাগী সুভদ্রার মধ্যে নিজের ছায়া খুঁজে পেল। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে আলতো করে হাত রাখল সুভদ্রার কাঁধে। ততোক্ষণে লাল সূর্যটা গনগনে হলুদ। মালবাহী জাহাজগুলোর আনাগোনা শুরু। ফিসফিসিয়ে সুভদ্রার কানেকানে বললো -

- কাল ভোরে আসার আগে আমাকেও ডাকিস...

বলেই হনহন করে পা চালাল নোয়াবাজারের পোর্ট কোয়ার্টারের দিকে। কাল ডুব দিয়েছে, আজ কাজে না গেলে গিন্নিরা আর আস্ত রাখবে না...

ভাতিছ গগন মাঝে

দাদামনি

অক্টোবর ২৪, ২০১৪

(আজ ২৪শে অক্টোবর ২০১৪। গত বছর এই দিনেই চলে গিয়েছিলেন এক কিংবদন্তী; - মান্না দে।)

আমি তখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফাইনাল ইয়ারে। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি। নতুন সেশন শুরু হয়েছে। আর একটা বছর পার করলেই ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরবো। বেশ একটা মস্তান মস্তান ভাব। হাজার হোক কলেজে আমরা সবচেয়ে সিনিয়র। নতুন সেশন। যথারীতি ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের র‍্যাগিং চলছে। আমাদের সময় কিন্তু র‍্যাগিংটা ছিল একটা হালকা মজা; আজকাল যে সব বীভৎস ঘটনা শুনি তা আমাদের সময় অকল্পনীয় ছিল। অঘটন যে একেবারেই ঘটত না তা নয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ খুব কড়া ব্যবস্থা নিতেন।

জুলাই মাসের ৯ তারিখে ক্লাস শুরু হত আমাদের। রবিবার পড়লে ১০ তারিখ। মোটামুটি মাস খানেক ধরে চলত র‍্যাগিং। ১৫ই অগাস্ট থেকে ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেওয়া হত। অগাস্টের প্রথম দিকের এক রবিবার বিকেলে আমাদের হস্টেলের কমন রুমে সব ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের জড়ো করা হয়েছে। ফাইনাল র‍্যাগিং, প্রত্যেকেই কিছু না কিছু করে দেখাবে, গান, শের শায়েরি, আবৃত্তি, অভিনয় যা খুশি। যারা পারবে না তাদের হলের একটা কোনে দেয়ালের দিকে মুখ করে, কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

এক এক করে সব ছেলের নাম ডাকা হচ্ছে। বেশ জমে উঠেছে। বেশ কিছুক্ষণ পর একটি ছেলে সামনে এসে দাঁড়াল। ছেলেটির জামা কাপড় বেশ মলিন, চেহারায় একটা নিষ্পাপ সারল্য, দেখে মনে হয় কোনও প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসেছে। যথারীতি নিজের পরিচয় দিল; হিন্দীতে। আমাদের সহপাঠী কয়েক জনের ইংরিজি প্রশ্নের উত্তরে সবিনয়ে জানাল, "ক্ষমা কিজিয়েগা, মুঝে অংরেজি নহি আতী"। "তব কয়া আতা হ্যায়"। ছেলেটি মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মনে হল এই পরিবেশের সঙ্গে ও একদম মানিয়ে নিতে পারছে না। চারিদিকে সিনিয়রদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, তার মাঝে ফার্স্ট ইয়ারেরই আরেকটি ছেলে, বোধহয় বন্ধুর করুণ অবস্থা আর সহ্য করতে না পেরে পাশ থেকে বলে উঠল, "উসে গানা আতা হ্যায়"। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, "কোই খাস নহি"। আমরা বললাম, তোমাকে গাইতেই হবে।

কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটি। দেখে মনে হল হয়তো বা গাইবার জন্য তৈরি হচ্ছে। একটু গুনগুন করে সুরটা ঠিক করে নিল। তারপর হঠাৎ গলা ছেড়ে ধরল, 'পুছো না ক্যায়সে ম্যায়নে র‍্যায়েন বিতায়ী', সে একবারে অবাক করা এক মসৃণ গলা আর তেমনি সুরের জাদু। ধীরে ধীরে যখন গলা উঠল, 'উতজল দীপক, ইত মন মেরা, ফির ভি না জায়ে মেরা ঘরকা অন্ধেরা' আবার নেবে এল, 'তড়পত-তরসত উমর গওয়াই' – মনে হল

যেন ঘরের মধ্যে সুর ভাসছে। গান শেষ হল, চারিদিক নিঃস্তব্ধ কয়েক সেকেন্ড। তারপর পুরো কমন রুম ফেটে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে আমরা হাততালি দিলাম। কয়েক জন গিয়ে তো জড়িয়ে ধরল ছেলেটাকে। তারপর যা হয়, 'ঔর এক সুনাও'। ছেলেটি ততক্ষণে বেশ সহজ হয়ে উঠেছে। একে একে গাইল, 'দিলকা হাল সুনে দিলওয়ালা, অ্যায় মেরে প্যারে ওয়াতন, কৌন আয়া মেরা মনকে দ্বারে, ইয়ে রাত ভিগি ভিগি, তু প্যার কা সাগর হ্যায়, আ জা সনম মধুর চান্দনিমে হম' – আসর জমে গেল। মাঝখান থেকে পরের ছেলেগুলোকে আর কিছুই করতে হল না। অনুরোধের পর অনুরোধ। এক সময়, রফি, কিশোর আর মুকেশের গানও গাইতে বলা হল। আর তখনই ছেলেটি হঠাৎ বেঁকে বসল। মাথা নীচু করে মৃদু কিন্তু দৃঢ় গলায় ঘোষণা করল, 'ম্যায় ঔর কিসিকা গানা নহি গাতা'। আশ্চর্য, ছেলেটি মান্না দে ছাড়া কারও গান গাইবে না। কিছুতেই না। শুধু বলল 'সবকো সম্মান করতা হুঁ, লেকিন গানা সির্ফ মান্নাজীকা হি গাতা হুঁ'। সাংঘাতিক গোঁ, একেবারে গাঁওয়ার যাকে বলে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি শুধু মান্না দের ফ্যান? ছেলেটা উত্তরে বলল না আমি সবার ফ্যান, সবার গান শুনি। কিন্তু মান্নাজীর আমি ফ্যান নই, ভক্ত পূজারী।

সেদিনের অনুষ্ঠান শেষ হল। ছেলেটি খুবই মুখচোরা, খুব একটা দেখা হত না। ওর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে খোঁজ খবর নিতাম। শুনলাম ছেলেটি পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে; শুধু কলেজ আর হস্টেল, হস্টেল আর কলেজে। কলেজের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবার দেখলাম। স্টেজে উঠে দুটো গান গাইল – পুছোনা ক্যায়সে আর লগা চুনরিমে দাগ। সে কি সুরের মূর্চ্ছনা; কলেজের রাশভারী প্রফেসরদের দেখলাম গম্ভীর মুখ কিন্তু গানের সুরে সুরে দুলছেন।

দেখতে দেখতে বছর প্রায় শেষ হয়ে এল। পরীক্ষার আর মোটে দুমাস বাকি। জোর কদমে চলছে পড়াশোনা, হাজার হোক ফাইনাল ডিগ্রির ব্যাপার, একদম ফাঁকি দেওয়া চলবে না। এক রবিবার কলেজের লাইব্রেরিতে কিছু রেফারেন্স বই থেকে নোটস নিচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পর মনে হল কলেজ ক্যান্টিন থেকে এক কাপ চা খেয়ে আসা যাক। ক্যান্টিনে ঢুকে দেখি সেই ছেলেটি, এক কোনায় একা বসে এক খাতা থেকে অন্য খাতায় কিছু টুকছে। বোধহয় কোনও ক্লাসে যেতে পারেনি, সহপাঠীর নোটস দেখে লিখে নিচ্ছে। আমি এক কাপ চা নিয়ে সোজা ছেলেটির সামনে গিয়ে বসলাম। হঠাৎ আমাকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেলেও সামলে নিল। বললাম অনেক দিন থেকেই তোমার সঙ্গে একটু কথা বার্তা বলব ভাবছি। ছেলেটি দেখলাম আগের থেকে অনেকটা সাবলীল এবং আত্মবিশ্বাসী। বেশ ইংরিজিও বলছে মাঝে মাঝে। আমি ওকে বললাম যে আমিও মান্না দের একজন খুব বড় ফ্যান। শুনে ছেলেটি হাসল। আমি বললাম তুমি কি জানো যে মান্নাজী বাংলাতেও প্রচুর গান গেয়েছেন এবং জবরদস্ত সব গান। শুনে ছেলেটি গম্ভীর হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "জরুর গায়ে হোঙ্গে"। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সুননা চাহোগে?" ছেলেটি বলল নিশ্চয়ই, "সিখনা ভি চাহুঙ্গা"। আমি বললাম তোমাকে কি আমি দু একটা রেকর্ড কিনে দেব? ছেলেটি তখন একটু ম্লান হেসে ওর পুরো পারিবারিক পরিস্থিতির কথা জানাল।

বলল যে রেকর্ড বাজিয়ে শোনার আর্থিক ক্ষমতা ওর নেই। গরীব কিসানের ছেলে। বাবার মতের বিরুদ্ধে পড়তে এসেছে। স্কুলের মাস্টারজীরা জোর করে পড়তে পাঠিয়েছেন। বাপু অনেকবার স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিতে

এসেছিলেন। মাস্টারজীরা রুখে দাঁড়িয়ে আটকেছেন। সেকেন্ডারি পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করায় স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে এসেছে। বাপুর ভয়ে ছুটিতে নিজের গাঁও পর্যন্ত যায়না, পাশে গ্রামে মামার বাড়ি গিয়ে লুকিয়ে থাকে। রেকর্ড প্লেয়ার কেনা তো দূরের কথা, গ্রামে বিজলীও নেই।

কথা শেষ করে হঠাৎ খাতাটা খুলে আমাকে বলল, ‘দো চার লাইন হমে বাতাইয়ে ম্যায় লিখ লেতা হুঁ, একদিন খুদ ম্যায় খরিদ লুঙ্গা’। আমি সে যুগের কয়েকটি গানের লাইন আমার বেসুরো গলায় ওকে শোনাই – ও আমার মন যমুনার অঙ্গে অঙ্গে ভাব তরঙ্গে, রাধা চলেছে মুখটি ঘুরায়ে, ইত্যাদি। ছেলেটি সযত্নে লাইন গুলো লিখে নেয়। তারপর স্বপ্নাদিষ্ট চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,- ‘একদিন মান্না-জীসে মৈ জরুর মিলুঙ্গা।’

এর পর আর কোনও দিন দেখা হয় নি ছেলেটির সঙ্গে। নামটাও ভুলে গেছি। কিছুতেই মনে করতে পারছি না। এখন কোথায় আছে কে জানে? যে সময়কার কথা বললাম তখন ফার্স্ট ইয়ার আর ফাইনাল ইয়ারের মাঝে তফাৎটা খুব বেশি মনে হত। কিন্তু এখন এই বয়সে তিন চার বছরের ব্যবধানটা খুবই গৌন। সেও তো এখন আমার মত একজন প্রবীণ নাগরিক। মান্না দের বাংলা গানগুলো কি সংগ্রহ করেছিল? কে জানে?

মান্নাজীর সঙ্গে কি ওর দেখা হয়েছিল? তাও জানি না। যদি না হয়ে থাকে তবে আর হবেও না কোনও দিন।

ঘুষ চুরি

পাগলা দাশু

অক্টোবর ১৫, ২০১৪

(এটি একটি প্যারডি। মূল কবিতা : গোঁফ চুরি)

হেডঅফিসের বড়বাবু দিনের শেষে শ্রান্ত,
ব্যাগ গোছাতে চেঁচিয়ে ওঠেন, "এইদিকে আয় কান্ত!"
ছোকরা পি-এ কান্তচরণ হুঙ্কারেতে কাঁপে,
ইতিউতি এপাশওপাশ পরিস্থিতি মাপে।
শান্ত বসের কি যে হলো, পাল্টে গেল ভোল;
হকচকিয়ে কান্ত শুধায়, "কে পাকালো গোল?
ফায়ার করুন, সবায় জানান, ডাকব নাকি পুলিশ?"
"লিগ্যাল প্রসেস? পাগল নাকি? হতচ্ছাড়া ফুলিশ!"
"সাবধানেতে কইবি কথা, সবার ঘোরাঘুরি,"
বাবু বলেন ফিসফিসিয়ে, "ঘুষ গিয়েছে চুরি!"
চমকে গিয়ে কান্ত ভাবে, এও কি হয় সত্যি!
বাবুর ঘুষের প্রসাদ পেয়েই লাগছে গায়ে গত্তি।
ঠিকই শুনি, দিন কখনো সবার সমান যায় না,
ঘুষের টাকাও যাচ্ছে চুরি, কক্ষনো যা হয় না।
রেগে আগুন তেলে বেগুন, ফুঁসে বলেন তিনি,
"একশ মোটে এক প্যাকেটে, কে দিল কি জানি!
জানলে পরে নিতুম না খাম, কে করে হাত ময়লা?
এই ক'টাকা নেয় তো শুধু পাড়ার মোড়ের গয়লা।
লাগছে যেন দিনদুপুরে করলো আমায় জবাই,
ঠিক সময়ে কাজ হাতিয়ে সুযোগ খোঁজে সবাই।"
অনেক ভেবে বলেন, "এসব চলবে না আর হেথায়,
ঘুষ মেরে কেউ পার পাবে না, যায় দেখি সব কোথায়!
কাজের আগে 'বাবু, বাবু', তেল মাখাবে জবর,
কাজ মিটলে টাকার বেলায় থাকবে না তো খবর।

ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের এক এক করে বাছি,
ঠকবাজদের পকেটগুলো আগেই করি কাঁচি।
ঘুষের সাথে মামদোবাজি – ঘুষ কি কারো কেনা?
কার ক্ষমতা কোথায় কত, ঘুষ দিয়ে যায় চেনা।"

একটি অনুপ্রেরণার অপমৃত্যু

মেঘনাদ

সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১৪

শেষপর্যন্ত একপ্রকার মুক্তিই পেয়ে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার দৌড়বিদ অস্কার পিস্টোরিয়াস। কয়েক মাস যাবৎ বিচার চলার পর কোর্ট রায় দিল যে তিনি খুন করেননি, নেহাতই দুর্ঘটনাবশত মেরে ফেলেছেন তাঁর বান্ধবী রিভাকে। শুধু তাই নয়, শাস্তি যদ্দিন না ঘোষণা হচ্ছে তদ্দিন জামিনও পেয়ে গেছেন অস্কার!

এই নিয়ে গতকাল থেকে শোরগোল পড়ে গেছে মিডিয়ায়। কেউ বলছেন এরকমভাবে দুমদাম অনিচ্ছাকৃত হত্যার তকমা দেওয়া একেবারেই অনুচিত, বিচারক মাসিপা এক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছেন। রিভার বাবা মা স্বভাবতই ক্ষুব্ধ, সেই সঙ্গে ক্ষুব্ধ নারীবাদী মহলও। আবার অনেকে বলছেন অস্কারের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত হত্যার সত্যিই তো কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

অস্কার পিস্টোরিয়াস

অথচ বছর দুয়েক আগে অসাধারণ কীর্তিকলাপের মাধ্যমে সারা বিশ্বের ইন্সপিরেশন হয়ে উঠেছিলেন এই অস্কার। মাত্র ১১ বছর বয়েসে তাঁর দুটি পা-ই অ্যাম্পিউট করে বাদ দিতে হয়। তার পরও তিনি নিজের পেশা হিসেবে বেছে নেন স্প্রিন্ট, অর্থাৎ দৌড় কে। দু পায়ে ব্লেড লাগিয়ে নিজের প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে শুরু

করেন অ্যাথলেটিক ট্র্যাকের জীবন। কি সাহস! ভেবে দেখুন একবার! নানান ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে ওঠেন তিনি। ব্যর্থতা, সাফল্য, বারবার নানাভাবে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়া, ১৬ বছর বয়েসে মায়ের মৃত্যু, সমস্ত কিছুর সঙ্গে তাল রেখে প্যারালিম্পিক্স (শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধীদের ওলিম্পিক্স) এ সোনা জিতে দেখান ২০০৪ এবং ২০০৮ সালে। এরপর তিনি চেষ্টা শুরু করেন এবল-বডিড দৌড়বিদদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার। এই সময় এসে হঠাৎই বাধার সম্মুখীন হতে হয় অস্কারকে। সাধারণভাবে যদিও মনে হয় দু-পা কাটা একজন প্রতিযোগী হিসেবে অন্যদের তুলনায় দুর্বল, কিন্তু আসলে সে কথা সবক্ষেত্রে সত্যি নাও হতে পারে। বরং যান্ত্রিক পা থাকার জন্য তিনি সুবধেই পান এই দাবি ওঠে কোনো কোনো মহল থেকে। ফলতঃ নানারকম বিতর্কের সূত্রপাত হয় তাঁকে ঘিরে। হাই ডেফিনিশন ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে তাঁর দৌড় রেকর্ড করে দেখা হয় তিনি সত্যিই কোনো আনফেয়ার অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছেন কিনা সাধারণ দৌড়বিদদের তুলনায়। শেষ পর্যন্ত অনেক পর্যালোচনার পর তাঁকে ছাড়পত্র দেয় আই এ এ এফ(ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন)। ২০১২ সালের লন্ডন ওলিম্পিক্সে কোয়ালিফাই করে তিনি শোরগোল ফেলে দেন। শেষপর্যন্ত কোনো পদক জিততে না পারলেও দুই পা না থাকা একজন অ্যাথলিট সমানতালে পাল্লা দিয়ে লড়ছেন এবল-বডিড অ্যাথলিটদের সাথে, এ এক অনন্য ব্যাপার, ওলিম্পিকের ইতিহাসে এই প্রথম! দেখতে দেখতে অস্কার হয়ে ওঠেন সারা পৃথিবীর কাছে এক ইন্সপিরেশন। আমরা যারা সারাক্ষণ ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা বলে অজুহাত খুঁজি, তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে অস্কার পিস্টোরিয়াস দেখিয়ে দিলেন কিভাবে হাজারো প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নিজের সাফল্য নিজেকে খুঁজে নিতে হয়, গড়ে নিতে হয় নিজের ভাগ্য।

এই অস্কারই কিনা গত বছর ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র দিন নিজের হাতে খুন করলেন নিজের বান্ধবীকে! রিভা বাথরুমে থাকা অবস্থায় বাইরে থেকে বন্দুকের গুলি চালান অস্কার। বিচার শুরু হবার পর তাঁর দাবি ছিল তিনি জানতেননা বাথরুমে রয়েছেন রিভা। অন্ধকার বাড়িতে ঢুকে বাথরুমের ভিতর আওয়াজ শুনে নাকি তিনি ভয় পেয়ে যান, ভাবেন কোনো দুষ্কৃতি সেখানে ঢুকেছে। সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে দেন গুলি! একটা আধটা নয়, চার চারটে গুলি খরচ করেন অস্কার! দীর্ঘ কয়েক মাসের বিচারের পর বিচারক মাসিপা পিস্টোরিয়াসের কথাই বিশ্বাস করলেন। ইতিমধ্যে কোর্টের মধ্যেই হয়েছে অনেক নাটক। রিভার মৃতদেহের বর্ণনা ইত্যাদির মুহূর্তে বারবার ভেঙে পড়েছেন অস্কার। এমনকি কোর্টের মধ্যে বমিও করেছেন। সবই কি নাটক? হয়তো নয়। অন্তত পথের কাঁটাকে সরিয়ে দেবার মত পরিকল্পিত হত্যা হয়তো নয়। কিন্তু রাগের মাথায় জেনে বুঝেই বান্ধবীকে গুলি করা এবং পরে সেই নিয়ে অনুশোচনায় ভোগা খুবই সম্ভব। বাথরুমের ভিতর অজ্ঞাত আততায়ীকে কল্পনা করে বিনা প্ররোচনায় একের পর এক গুলি চালানো কতটা যুক্তিগ্রাহ্য সে নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়। বিচারক মাসিপা, যিনি ইতিপূর্বে বেশ কিছু কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে, তিনি কিকরে এত নরম হলেন? আসামীর প্রতিবন্ধকতা, ওঠাপড়ায় ভরা জীবন, সব সমস্যা জয় করে আন্তর্জাতিক মানের সাফল্য, এই সমস্ত কি তাঁকে পক্ষপাতদুষ্ট করে দিয়েছিল? এমনিতেই আধুনিক পৃথিবীর 'সভ্য' দেশগুলোয় বিনা প্ররোচনায় দুমদাম গুলি চালিয়ে হত্যা করা প্রায় ছেলেখেলার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তার ওপর পুরুষ-শাসিত সমাজে গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে তাঁকে খুন করার নিদর্শনও বড় কম নয়। অস্কারের প্রাক্তন গার্লফ্রেন্ডও বলেছেন অস্কারের পক্ষে সেরকম মাথা গরম করে খুন করা

একেবারেই অসম্ভব নয়। সেই রকমের অভিযোগ প্রমাণ হলে ১৫ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারত! এখন কি হবে সেটা পরের শুনানির আগে জানা যাবেনা, কিন্তু জামিন ইত্যাদি দিয়ে তাঁর অপরাধ যে লঘু করে ফেলা হল অনেকটা, সে নিয়ে সন্দেহ নেই।

খেলাধুলোর জগত আমাদের অনেক অনুপ্রেরণা জোগায়। খেলার জগতে প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে জয় পাওয়া আমাদের শেখায় জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে। তার ওপর যদি সেই খেলোয়াড় নিজের জীবনে অসম্ভব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সফল হন, তবে তো কথাই নেই। তবু এই সব হিরোরা কেন এমনভাবে কলুষিত হয়ে যান? ল্যান্স আর্মস্ট্রং কিম্বা অস্কার পিস্টোরিয়াসরা কেন পারেননা তাঁদের ওই অতিমানবতাকে ধরে রাখতে? তাঁরাও দোষেগুণে ভরা সাধারণ মানুষের মত, এটাই বুঝি প্রমাণ হয়ে যায় বারবার যখন আমাদের এই হিরোরা আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসেন রাতারাতি। আর আমরা, নিতান্ত সাধারণ মানুষেরা, নিজেদের ব্যর্থতাকে বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে ভুলে থাকার চেষ্টা করা মানুষেরা, বারবার খুঁজে ফিরি আরও একজন এমন হিরো-কে, আরও অনুপ্রেরণাকে...

(*এই পত্রিকা প্রকাশের সময় অস্কার পিস্টোরিয়াস পাঁচ বছরের কারাবাসের সাজা পেয়েছেন।*)

ডায়েরীর শেষ দিক থেকে

নবকলম

এপ্রিল ১৯, ২০১৪

(১)

তোমার বাড়িতে যাওয়া পথগুলো
বেঁকে গিয়ে খোঁজে চায়ের দোকান;
তুমি আছ ওই না থাকারই মতো,
মনের ঠিকানা এখান-সেখান।

গল্প করার জগার’স পার্কটা
ভালবাসাদের ভালো বাসা দেয়;
আমাদের কাজ আমাদেরই, তবু
কম ভিড় চান ‘কম-নামী খান’।

আমার হ্যাঁয়েতে তুমি ‘না’ না’হলে
পার্কের লেক ছায়াঘন হতো;
ঠোঁটে লালরঙ কম হলে বা কি,
লজ্জা আছে তো, তোমার দু-কান!

(২)

ভোরবেলার প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল।
বিছানা হাতড়ে সকাল খুঁজলাম,
পাওয়া গেল শুধু মেঘ ও মশারিতে
ফিল্টার হয়ে আসা জালিআঁকা- আলো।

চশমা খুঁজে পাবার পরে
পেলাম ভেজা পায়রা,
আলুথালু ফিঙে–শালিক।

বারান্দায় বেরোতেই দেখলাম নয়নতারা,
ক্লান্তি কেটে গেছে,
কয়েক ফোঁটা সঞ্জীবনীতে যৌবন ফিরেছে তার।

ছাদ থেকে অঝোরে নেমে আসা জমা জল
উচ্ছ্বাসে যে মায়াজগত বুনেছিল,
তাতে ভ্রম জন্মাল যে আমি নৈসর্গিক
রিসোর্টে আছি।
আর আমার সঙ্গে আছে অনন্ত ছুটি,
ছেদহীন।

বিরামপিয়াসী চোখ বুজে এলো অভূতপূর্ব আরামের আশ্বাসে-।
সকালের ঘুমে,
ঘুমের দ্বিতীয় খণ্ডে তলিয়ে গেলাম, গভীর।

তুমি বিষ ঢেলেছ কোন সকালে

হস্তিমূর্খ

আগস্ট ৩০, ২০১৪

সাধারণ ভাবে একজন মানুষের দুই হাতে নখের সংখ্যা কত? অনেকেই ইতিমধ্যেই ভাবতে শুরু করেছেন এত বোকা বোকা প্রশ্নের অর্থ কি? দশটি সুস্থ আঙুলে দশটা নখ থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক! হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন। এই প্রশ্নে বিন্দুমাত্র বুদ্ধিমত্তার ছাপ নেই। আসলে কি জানেন, আমার হাতে এই প্রশ্নটার উত্তর হল নয়। অনুগ্রহ করে ভুল বুঝবেন না। যদ্দূর জানি এবং ঠিকই জানি, আমি ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যদি কথা বলতে পারতাম তাহলে কিন্তু জবাব দিতাম 'দশ'। তারপর থেকে আজ প্রায় আটত্রিশ বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেল আমার ডানহাতের মধ্যমাটিকে দেখলে এক বিরলকেশ শ্মশ্রুগুম্ফহীন অতিবৃদ্ধের কথাই শুধু মনে পড়ে, মনে হয় কোনোকালেই যেন ও জানতে পারেনি যৌবন কাকে বলে।

কোনও এক দুর্ঘটনায় এই নখটি হারানোর সময় আমার নিশ্চয় খুব ব্যথা লেগেছিল, এবং এই কথাও বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে পুরো প্রক্রিয়াটি মিনিট, ঘণ্টা পেরিয়ে দিনের হিসেবে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল, নিশ্চয় মাঝরাতে আধো ঘুমে আমার কান্না শুনে আমার বাবা কিংবা মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে জানতে চেয়েছিলেন ব্যথা লাগছে কিনা। তারপর অবশ্যই চেষ্টা করেছিলেন আমাকে ঘুম পাড়াতে। আবার এরকমও হতে পারে ঘটেনি এসব কিছুই। হয়ত ক্ষত এতটাই গভীর ছিল যে সে পর্যন্ত আমার শারীরিক অনুভূতি পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছিল। ঘটনা যাই ঘটে থাকুক না কেন আঘাত এবং তদ্দজনিত ক্ষত দুইই যথেষ্ট গভীর ছিল। আর আজ? আজ আমার মনে সেই আঘাতের কোনও স্মৃতি এমনকি তার তলানিটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। শুধু এক নখবিহীন মধ্যমা। ক্ষত মিলিয়ে গেলেও অমলিন চিহ্ন।

অর্থাৎ সময় এগোনোর সাথে সাথে ক্ষত মিলিয়ে গেলেও যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে কাটাতে হবে সারা জীবনটাই। এর বাইরেও থেকে যায় এমন কিছু আঘাত যা মনের গহীন গহ্বরে ঘাপটি মেরে রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে যায়, টের পেতে দেয় না যে সে আছে, আর অপেক্ষা করে আত্মপ্রকাশের মাহেন্দ্রক্ষণের জন্যে। শুধু মাঝে মধ্যে নিজের কোনও অঙ্গকে সুকৌশলে একবার ভাসিয়ে আবার ডুবিয়ে দিয়ে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে যায়। তবু ভুলে যাই।

মনে পড়া-ভুলে যাওয়ার এই চক্রে হঠাৎ যখন একদিন পাকাপাকি ভাবে 'মনে পড়া' অনিবার্য জয় লাভ করে, তখন 'মানুষ সেই জিনিস ভুলে যায় যা সে মনে রাখতে চায় না' এই কথাটির প্রতি অবিশ্বাস জন্মাতে থাকে। শেষ অবধি সৃষ্টি করে অক্ষত এক ক্ষত, মিলিয়ে যেতে দেয় না, স্মৃতি বিশ্বাসঘাতক হয়ে ওঠে অন্য অর্থে।

বাবার হাত ধরে অফিস পিকনিকে যাওয়া শিশুটি অন্তত সেই সময় ভাবেনি সে কোনওদিন এই রকমই এক বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে পড়বে। বাবার গলায় বক্স ক্যামেরা, তারও কিছু একটা থাকতে হয়, অতএব বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে তার বড় প্রিয় বায়নোকুলারটি গলায় ঝুলিয়েছিল। সেবার গন্তব্য ডায়মন্ডহারবার। এর আগেও সে বাবার অফিস পিকনিকে গেছে, প্রতিবার খোলা মাঠে আশেপাশের স্থানীয় সমবয়স্ক বাচ্চাদের সাথে খেলেছে, কাকুদের হাত ধরে হেঁটেছে ধানক্ষেতের আল ধরে, আদ্যন্ত শহুরে তার কাছে সেসব হত বড় নতুন পাওনা। কিন্তু এবারের মত খাওয়া দাওয়া শেষে একটা বাড়িতে ঢুকে কোলাপিসবল গেট বন্ধ করে দেওয়ার মত ঘটনা কখনও ঘটেনি। গঙ্গা একদম সামনে হওয়াতেই কি এই ব্যবস্থা? কি লাভ হল তবে বায়নোকুলারটা নিয়ে এসে? সকাল থেকে যদিও যোজন দূরের অনেক বস্তুই এসে পড়েছে একেবারে সামনে তবু কোথাও যেন রয়ে গেছে এক অপূর্ণতা। গঙ্গাপারের ছেলে সে, তবু ওপার দেখা যায় না, এরকমটা তো চোখে পড়েনি! 'গঙ্গা এখানে অনেক চওড়া' – বড়দের কথার উত্তরে সে জিজ্ঞেস করতে পারত – 'কত চওড়া যে আমার বায়নোকুলারে দেখা যায় না?' কিন্তু তর্ক করেনি সে। বেশ কয়েকবার ব্যর্থ হয়েও আশাহত হয়নি, এখনও তো সময় পড়ে আছে, দেখা যাবে, নিশ্চয় দেখা যাবে। অনেক দূরের জিনিস কত বড় হয়ে একেবারে সামনে চলে আসে!

অতএব বন্ধ কোলাপসিবলের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতর থেকেই চোখ রাখে বায়নোকুলারে।

না। গঙ্গার ওপার সামনে আসার বদলে দৃষ্টি হঠাৎ উল্টোদিকে অচেনা কিছুতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এ তো ঠিক অত দূরের বলে মনে হচ্ছে না। সরিয়ে নেয় বায়নোকুলার। চোখে পড়ে বন্ধ দরজার ওপারে তার প্রায় সমবয়সী কয়েকটি ছেলেমেয়ে। কোথায় ছিল এরা!! সকাল থেকে দেখতে পেলে একটু খেলতে পারত।

- তোমার হাতে কি?

উত্তর দেবে কি দেবে না ভাবতে ভাবতেই উত্তর দিয়ে ফেলল। কে জানে কি বুঝল ওরা। আবার প্রশ্ন - কি হয় ওটাতে?

- অনেক দূরের জিনিস দেখা যায়

- দেবে একবার?

বলা বাহুল্য অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব। গেটটা যদি খোলা থাকত, হয়ত এটা দ্বিধাগ্রস্ত হতে হত না। এমন সময় আকস্মিক ভাবেই পরিত্রাতা নাকি পরিত্রাত্রী হিসেবেই হল আবির্ভূত হল ঐ দলেরই একটি মেয়ে।

- না, দেবে না। কেন দেবে?

কিছু একটা বলে সে তার সঙ্গীসাথীদের না দেওয়ার কারণ হিসেবে। শুনতে পেলেও বোধগম্য হয় না ঠিক কি বলল। কিন্তু এটুকু বোঝে মেয়েটির যুক্তি অকাট্য, সঙ্গীদের মুখে ভেসে ওঠা অন্ধকার তাকে আশ্বস্ত করে। কাজেই

কি কারণ সেটা আর জানার দরকারই বা কি? তাকে দিতে বারণ করেছে প্রত্যাশীদের একজন, অন্যেরা মেনে নিয়েছে, এটাই তো যথেষ্ট!

- তোমার নাম কি ভাই?

নাম বলে সে।

- তবে? আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি।

মেয়েটির অর্থপূর্ণ এক দৃষ্টির সামনে ভীষণ বোকার মত তাকায় ছেলেটি। কি বুঝতে পেরেছে? তাকে দেখলেই কি বোঝা যায় নাকি তার নাম, সে কাউকে কিছু দিতে চায় না? এ তো মহা মিথ্যা অপবাদ! তার স্কুলের বন্ধুদের তো ডেকে ডেকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া টিফিনের ভাগ দেয়!! সম্মান বাঁচানোর তাগিদে আমতা আমতা করে বেশ অনিচ্ছে সহকারে বলতে চাইল - 'নেবে এটা? দেখবে?'

এবারও তাকে প্রায় থামিয়ে দিয়ে মুখ খোলে মেয়েটি - 'তোমরা কি......?' কিন্তু শেষের শব্দটি বুঝতে না পেরে জানতে চায় সে। আবার জিজ্ঞেস করে মেয়েটি। নাঃ এবারেও বুঝতে পারেনা। আবার জানতে চাওয়ার আগেই ভেতর থেকে কানে আসে বাবার গলা - কি করছিস ওখানে?

- বাবা ডাকছে...

- তুমি যাও।

আর দাঁড়ায় না কেউই। মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে যায় বাইরেটা।

- কি করছিস এখানে?

- দেখছিলাম...

পুরো ঘটনাটাই চেপে যায়। পাছে বাবা বলে বসেন - তুমি অন্যায় করেছ। একবার দিতে পারতে ওদের। ওরা তো তোমার জিনিস আবার তোমায় ফিরিয়ে দিত।

ফলে অজানাই থেকে যায় মনের ভেতরে ঘুরপাক খেতে থাকা প্রশ্নক'টার উত্তর। সত্যিই কি তাকে দেখলে তার নাম জানা যায়? সত্যিই কি তাকে দেখে মনে হয় সে কাউকে কিছু দিতে চায় না?

আসলে সেসব কিছুই নয়। বহুদিন পর বোঝার বয়সে পৌঁছে খুঁজে পায় মেয়েটির শেষ প্রশ্নের বুঝতে না পারা শেষ শব্দটি। আমার ডানহাতের পঙ্গু মধ্যমার মতই জেগে থাকে সে শব্দ। তারপর বহুবার শুনেছে সেই শব্দ, কিন্তু

বারে বারেই মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসে সেই সময়ে শোনার অভিঘাত, আজ এতদিন পরেও, চাইলে হয়ত মনেও করতে পারে সেই মেয়েটির মুখ। একদম নিঃসংশয় সে। শব্দটি ছিল - হিন্দু...

হঠাৎ বৃষ্টি

চম

এপ্রিল ২২, ২০১৪

ডিপার্টমেন্ট থেকে মিটিং শেষে বাস ধরব বলে বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছি। মাঝপথেই এক ফোঁটা দু ফোঁটা দিয়ে শুরু করে চড়বড় করে বৃষ্টি চলে এল। ব্যাগ থেকে ছাতাটা ঝট্‌তি বের করে না নিলে ভিজে কাক হয়ে যেতাম। দুম্ করে ঠান্ডা লেগে গেলে আর দেখতে হত না! এখানে শরীর খারাপ হতেও ভয় করে। একা হাতে সব কিছু; আমি বিগড়ে গেলে আমাকে যে আমিটা দেখাশোনা করে, রান্না করে দেয়, গল্প করে, বেড়াতে যায় – তাকে প্রচুর miss করব। অগত্যা, ছাতা।

বড় Oak গাছটা রাস্তার ওপর cover করে আছে। ওটার নীচে দাঁড়িয়ে থাকা আমেরিকান ললনাটিকে ছাতার তলায় আসার অফার দেব কিনা ভাবতে ভাবতেই দেখি সে বৃষ্টির মধ্যেই অন্যদিকে দৌড় দিল। আমার এই চিরকাল হার্ড লাক। যাগ্‌গে, আমি যাই বরং বাসস্ট্যান্ডের দিকে। স্ট্যান্ডের ছাউনির তলায় দাঁড়িয়ে তবে স্বস্তি। ছাতাটাকে গুটিয়ে রেখে বসলাম একটু। সামনে Hillsborough Street এর ওপর অঝোর ধারায় জল পড়ছে; জলের ছিটকে আসা ফোঁটাগুলোকে মাড়িয়ে চলেছে গাড়ির দল। একটা Towhee এ গাছ থেকে ও গাছ করল কিছুক্ষণ – যাকে বলে এক্কেবারে উড়ন্ত স্নান। বৃষ্টি এলেই মনে কেমন একটা অনুভূতি জন্ম নেয়। ভাল-মন্দ মেশানো। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বৃষ্টির কথা কিছু বলি। যতটা মনে করতে পারি।

"জলে বুট ছপ্‌ছপ্, রিকশার পর্দা দিয়ে টুকি"

তখন একটু বৃষ্টি হলেই হসপিটাল মোড়ে জল জমে যেত। রেনকোট গায়ে রিকশায় উঠে পর্দার দড়িটার ওপর দিয়ে রাস্তা দেখার মজাই ছিল আলাদা। অবশ্য যখন খুব ছোট ছিলাম তখন অত উঁচু অব্দি চোখ যেত না। তখন পাশ দিয়েই অল্প ফাঁক করে উঁকি মারা হত। রিকশার চাকা চলছে জল কেটে, পাশে একটা বড় গাড়ি গেলেই পুরো সমুদ্রের ঢেউ। পুরী-দিঘা না গিয়েই খোদ নিজের শহরেই সমুদ্রসুলভ পরিস্থিতি তৈরি হওয়াতে মজা বেড়ে যেত দশগুণ। জলে কত কি না ভেসে যেত! জানতাম জিনিসগুলো খুব একটা সুবিধের নয়; ওই জলে বেশিক্ষণ থাকলে পা কুট্‌কুট্, তারপর বাড়ি ফিরে অবধারিত একটা "হ্যাঁচ্চো!" তাই রিকশার ভেতরে থাকার সময়টাও যত পারো মজা লুটে নাও। ভেজা পায়ে জুতোর ভেতরটা অদ্ভুত ভারী হয়ে যেত। অস্বস্তি হত কিছুক্ষণ পর। শুকনো জায়গায় হাঁটলেই কেমন ভুস্‌ভুস্ আওয়াজ হত বুটে।

স্কুলের খেলার মাঠটায় ঘাস বলে কিছু কোনোদিন মুখ তুলতে সাহস করেনি আমাদের অত্যাচারে। দেখতে লাগত পুরো Roland Garros-এর মত। বৃষ্টি হলেই অসামান্য রূপ হত তার। গোটা মাঠ জুড়ে অসংখ্য ছোট ছোট নদী, তার শাখা-প্রশাখা বের করে চলেছে মাঠের ধারের পুকুরটার দিকে। ওই মাঠে একবার নামলেই কাদা-প্রিন্ট সাদা জামার গ্যারান্টি দিতাম আমরা। কাউকে হতাশ হয়ে ফিরতে হত না। স্কুলের সামনেই গঙ্গা। বর্ষার জলে ফুলে ওঠা নদীর চেহারাই আলাদা তখন। জলের রঙ হালকা লাল্চে হলে বুঝতাম ইলিশ আসছে। একপশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরবর্তী সময়টা অসামান্য লাগত। চারিদিকে কেমন প্রশান্তি, মৃদু ঠান্ডা হাওয়া, আর বাড়িতে গরম চা, সাথে একটু পাঁপড় বা চপ হলে তো কথাই নেই। তখনকার দিনে বৃষ্টিতে হাঁটতাম আমরা বৃষ্টিতে ভেজার জন্যই, আজকালকার মতো "no one can see me cry" -এর দমবন্ধ করা পরিস্থিতির শিকার হয়ে নয়।

"ধুর! আবার জল ঠেঙিয়ে যেতে হবে"

লিলুয়া ছেড়ে হাওড়ার দিকে যেতে ট্রেন তো এমনিতে দাঁড়িয়ে পড়েই, তার সাথে বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। সেই কবে থেকে একটা কথা শুনতাম যে মাঝে মাঝে মনে হত পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে "কারশেডে জল জমেছে - কথাটার ব্যাখ্যা করো", তবে পুরো নম্বর বাঁধা। সকালে বৃষ্টি দেখলেই মেজাজ বিগড়ে যেত। আবার সেই মাঝপথে দাঁড়িয়ে থাকো, খাটালসুলভ হাওড়ার বাস্স্ট্যান্ড থেকে শর্ট জাম্প, লং জাম্প দিয়ে জল পেরিয়ে বাসে ওঠো – এসব ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যেত। জলগুলোও ঈষৎ লাল্চে; না, ডাঙ্গায় ইলিশ ওঠেনি, ওগুলো কিছু মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত গুটখার অবশিষ্ট সমূহ। পাগল, সিপিয়েম, অ্যান্টি-সিপিয়েম, ট্যাক্সি ইউনিয়ন – সব্বাইকে গালিগালাজ করতে করতে পার্ক স্ট্রিটে নামার পরেও রেহাই নেই। পার্ক হোটেলের সুইমিং পুলটা মনে হচ্ছে সাধারণদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, কোনোদিন মজা পাইনি এই জমা জল ঠেঙিয়ে কলেজ যেতে। এখন অবশ্য ভাবি, একটু মজা পেলে মন্দ হত না।

বাড়ি ফেরার পথে ট্রেনে জানলার ধারে বসে বৃষ্টি উপভোগ করা খুব একটা হত না। যদিও বা বসতে পারলাম, জানলাটা বন্ধই রাখতে হত। আমি একা না হয় মুখের ওপর water spray-র আনন্দ নিতে না করব না, কিন্তু বাকিরা দেখতাম তাতে মোটেও সায় নেই। অগত্যা! একবার জল মাড়িয়ে সারাদিন ক্লাস করে বাড়ি ফিরেই জ্বর বাধালাম। তবে থেকেই বেশ একটা ভয় কাজ করত। বুঝলাম, ছোটবেলাটা দুম্ করে বিদায় নেবার সাথে সাথে আমিও ভিতু হয়ে গেছি।

"তারে গাছ পড়েছে"

পুকুরের ওপাড়ের দিক থেকে বাজের আওয়াজের সাথে সাথেই লোডশেডিং। তা একদিক থেকে ভালই। বাজ জিনিসটাকে আমি বেশ ভয়ই পাই। রাতে বাড়ির সামনের তালগাছগুলোর দিকে তাকালে বেশ ভয় লাগত ছোটবেলায়। কিছুই না, ওই রসের হাঁড়িগুলোকে কেমন যেন ভূতের মাথা মনে হত। সেই তালগাছের একটাই

যখন দেখলাম বাজ পড়ার কয়েকদিন বাদে পুরো ন্যাড়া হয়ে গেল, সেদিন থেকে বাজকে বেশ সমীহ করে চলি। একে তো ওই পিলে চম্‌কানি আওয়াজ, তার সাথে দুম্‌ করে ভূতের মুন্ডু উড়িয়ে দিল! বৃষ্টি জোরে শুরু হলে একটু নিশ্চিন্তি, আকাশের ঘনঘন টর্চলাইট প্রদর্শন কম হবে। বৃষ্টি থামলেও দেখা যেত তখনও হয়ত কারেন্ট আসেনি। পাড়ার অন্য বাড়িতে খোঁজ, "মাসিমা, আপনাদের লাইট আছে?" না থাকলে ইলেকট্রিক অফিসে ফোন। "তারে গাছ পড়েছে, কাজ করতে লোক গ্যাছে।" ব্যাস, হয়ে গেল। নাও দেখো কখন ফেরে বাবাজীবন। এর মধ্যে আবার টিপ্‌টিপ্‌ শুরু।

"নিম্নচাপ"

বাসে, ট্রেনে, আনন্দবাজারের পাতায় যে শব্দটা এই একটানা বৃষ্টির সময় ঘুরেফিরে আসে সেটা হল নিম্নচাপ। দাদা-ও এককালে টক্কর দিত, কিন্তু তিনি অবসর নেওয়ার পর টেক্কা মেরে বেরিয়ে গেছে নিম্নচাপ। অবসর নেওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না অদূর ভবিষ্যতে। জীবনে যে চাপ খালি আমাদের না, প্রকৃতিরও হয় তার মোক্ষম প্রমাণ এই নিম্নচাপ। নীচে চাপ পড়লে কি কষ্ট সে কি আর আমরা বুঝি না বলুন! তবে একে দেখে সেখা উচিৎ। চাপ এল কি দে ঢেলে ওই মানুষগুলোর ওপর। 'চাপ নিতে না, দিতে হয়, তার সেরার সেরা উদাহরণ। এমনিতেই এক ঘন্টার বৃষ্টিতে কলকাতার পুরোটাই water amusement park হয়ে যায়, তার ওপর এই টানা পাঁচ দিনের বৃষ্টিতে বাড়ি থেকে বেরিয়েই ভেনিস।

"বৃষ্টি = আরো কাছাকাছি"

পুরনো সিনেমা থেকে হালের – বৃষ্টির দৃশ্য অধিকাংশেই এক্কেবারে বাঁধা। কড়কড়কড়াত করে একটু বিদ্যুৎ চমকালেই নায়িকা সোজ্জা নায়কের বুকে। তারপরের দৃশ্য তো চেনা – থম্‌ মেরে যাওয়া নায়ক-নায়িকা, চোখাচোখি। পরের sequence টা censor board নির্ভরশীল। পাঠক-পাঠিকারা নিজেদের মতো করে দৃশ্য সাজিয়ে ফেলুন, শুরু তো করেই দিলাম।

তবে বৃষ্টির রোম্যান্টিকতাকে অস্বীকার করিই বা কি করে! এক জায়গায় একটা ছবি দেখেছিলাম। কেরলের ছবি। ভারতবর্ষের বুকে প্রবেশ করছে কুমারী বর্ষা, সে তখনও রানী হয়ে ওঠেনি। চপল, কৃষ্ণকোমল বর্ষা। প্রত্যক্ষদর্শী সমুদ্রের পাড়ে হাত ধরে দাঁড়ানো দুজন। ছবিটা খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু ছবির একজন আর হতে পারলাম কই?

বিঃ দ্রঃ – কলকাতার পার্কগুলোতে বৃষ্টি ছাড়াই ছাতা দেখা যায়। অগুন্তি ছাতা, চারপেয়ে। এরা censor board-এর ঊর্ধে।

শেষ করা যাক। বৃষ্টিকে মোটেও মিস্ করি না এখানে। এখন যেখানে থাকি সেই র‍্যালে শহরে কারণে-অকারণে বৃষ্টি হয়। নির্মল বৃষ্টি। সবুজ বৃষ্টি। ধূসর বৃষ্টি। কখনও কখনও বৃষ্টিতে হাঁটতে ভাল লাগে। চোখে জলও আসে। বৃষ্টির সাথে ভাগ করে নি সেই আনন্দাশ্রু।

একটি উপসংহার

শাক্য মুনি

নভেম্বর ৯, ২০১৩

হেমন্তের এক জাফরানি বিকেলে আমি ও আমার পরম সুহৃদ ধর্মকেতু পাহাড়-চূড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমার কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, তাতে বাপুজি কেক ও জলের বোতল। তাছাড়া ধর্মকেতুর নকশা করা প্রিয় মাঙ্কি টুপি যা খরিদ করবার জন্য, কেননা শীতকাল সমাগত, ধর্মকেতু পাড়ি দিয়েছিল মার্কিন মুলুকে। ফিরে এসে আশেপাশের একঘেয়ে গোবরা মানুষদের দেখে সে উন্মার্গগামী হয়ে উঠলো। মানুষের তেলচিটে সংসার তার আর ভালো লাগেনা, এইবার সে নিসর্গের তূরীয় দ্রবণ চায়। এখানে আর তার মন টেকে না। যেনতেন প্রকারেণ সে একটা পাহাড়ের চুড়ায় যাবেই। এই এক বিচিত্র ব্যামো তার মাথায় ইদানীং। বাতাসে আঙুলের তুলি বুলিয়ে যখন তখন পেড়ে আনে বিদঘুটে নকশা চিত্র, আবছায়া জ্যামিতিক পমেটম ও বেরঙা ছাতারে। তাছাড়া গোসাপের থুতু সংগ্রহ করে তাই দিয়ে অতি উত্তম মদ প্রস্তুত করবার পন্থা শিখে এসেছে। ভূত পোষে কিনা তা অবশ্য আমার জানা নেই। সে যাক।

আমাদের যাত্রা শুরু হল। জনপদ পেরিয়ে খোলা প্রান্তর পেরিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে তবে আমাদের সেই পাহাড়। অজানার ডাকে নিরীহ আমরা আজ কুণ্ডলী থেকে বেরিয়ে এসেছি, আমাদের রক্ত ঠান্ডা। ধর্মকেতু যোগী পুরুষ, যে কোনো রকম আশু বিপদের ইঙ্গিত সে পায়, দুনিয়ার যাবতীয় উচাটন-ক্রিয়ায় সে সিদ্ধহস্ত! তার সঙ্গে থাকলে আমার আর ভয় কি?

আমরা হাঁটছি। যদিও রাস্তা চিনিনা, রাস্তাই চিনে নিয়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে, এবং যেন আমরা নেই এইভাবে, ঈষৎ নিষ্প্রভ, আমাদের পরোয়া না করে সমস্ত দৃশ্যমানতা নিয়ে ভোজবাজীর মত ঝাঁপ দিচ্ছে পিছনের শব্দহীন নির্জনতায়। নিরালম্বের মত শূন্যে ভেসে রয়েছি আমরা। মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে গড়িয়ে যাচ্ছে জীবন, যেমন ছাতিম ফুলের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে বিন্দু বিন্দু জ্যোৎস্না। আমরা হাঁটছি। টেরিকাটা পরিপাটি চুলের গোড়ায় বাসা বাঁধছে অনাত্মীয় ধুলো। মুখের ওপর নুইয়ে পড়া গোধূলির বোরখা সরিয়ে সরিয়ে আমরা চলেছি। বহুদূর ফেলে আসা মলিন গ্রামের বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে শাঁখের আজান। পৃথিবীর সমস্ত উন্মাদের জীবনে নেমে আসছে শুকনো জমাট মাংসের মত আরেকটা নিঃসঙ্গ রাত। আমাদের এখনও বহুদূর যাওয়া বাকি।

***

মনুষ্য বসতির শেষ মাইল ফলক পেরিয়ে এসেছি কিছুক্ষণ আগে। সামনে দেখা যায় জঙ্গলের সীমানা। তারও পরে বৃদ্ধ ‘আরাবল্লি’র আলিঙ্গনে ধূসর হয়েছে ক্যানভাস। এসব জঙ্গল আমাদের বন্ধু নয়, সবুজের ঝাঁঝালো কোহল নিঃশ্বাসে হিংস্র আহ্লাদ ঝরে পড়ছে। সন্ধ্যার পোয়াতি আবছায়ায় আমরা এসে বসি এক ছদ্মবেশী হ্রদের পাড়ে,

পরিশ্রান্ত পথিক যেমন। হ্রদের স্নেহহীন প্ল্যাসিড জলস্তরের ওপরে আদিম বুদবুদ ভেসে উঠছে, হ্রদের গভীরে এখন রাত্রি দুই প্রহর। যেকোনো মুহূর্তে সে এক দানবের রূপ ধরে উঠে এসে গিলে খেতে পারে আমাদের। একটি কিশোরী শিরীষ গাছ ধর্মকেতুকে কানে কানে এই বিপদ সংকেত জানিয়েছে। সে এখন তাই এক গুহ্য যৌগিক ক্রিয়ায় মগ্ন, নদীর দেবতাকে তুষ্ট করতে না পারলে আমাদের যাত্রা সফল হবেনা। ইউক্যালিপটাসের মাথায় নেমে এসেছে দলে দলে জীন ও পরীরা, গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঝিকমিক করছে তাদের অভ্র বিভঙ্গ, তুঙ্গ টুং টাং। আকাশে নক্ষত্র পতনের মহাজাগতিক নৈশব্দে কান পাতা দায়। আর ঠিক এমনই মুহূর্তে নিকটবর্তী জঙ্গলের মধ্যে বেজে ওঠে দ্রিমিকি দ্রিমিকি দাদুরী দিদুরা – দ্রিম দ্রিম দারা – দ্রিম দ্রিম দারা... বাজতেই থাকে বাজতেই থাকে বাজতেই থাকে। আর বাজনার তালে তালে জঙ্গলের প্রাচীন বনস্পতিরা মাটি কাঁপিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে আমাদের চারিপাশে। এ যেন এক নৈসর্গিক অর্জির সূচনা হয়েছে। আমরা সচকিত হই। ধর্মকেতুর ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে, সে উঠে এসে আমার পাশে বসে। বহুদূরে আকাশের কোণ ঘেঁসে দিকচক্রবাল রেখায় তখন কালচে বেগুনী নিশ্চলতা।

সন্ধ্যে আরেকটু নিটোল হলে আমরা অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করি। দুন্দুভি-ধ্বনি ক্রমশ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে এক উদ্ভট গ্র্যান্ড অপেরার জন্ম দিয়েছে। হাড়ে তাক লাগানো উত্তরে হাওয়ায় বাবলা গাছের মাথা দুলছে, ভালো করে কান পাতলে তীক্ষ্ণ বাঁশির সুর, স্নায়ুর ওপর বুলিয়ে দিয়ে যায় তার মোলায়েম সেলোফেন অঙ্গুলি।

আর তখনই মুখ তুলে তাকিয়ে আমার খটকা লাগে, দূরের সারিবদ্ধ পাহাড় কি ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে? পাহাড়ে পাহাড়ে কথা হচ্ছে কি ফিসফিস? জঙ্গলের অপদেবতা পাসাংমারা কি জেগে উঠেছে তবে? এইসব পাহাড় অরণ্য সব তাঁর সম্পত্তি, এখানে তাঁর আইন চলে, বাইরের মানুষের উপস্থিতিতে রুষ্ট হন তিনি, তখন পাহাড়ে পাহাড়ে গোপন নির্দেশ চালাচালি হয়, বহুযুগের আদিম অন্ধকার এগিয়ে এসে ঘিরে ফেলে অরণ্যকে, সেই অন্ধকার থেকে জ্বলে ওঠে প্রতিহিংসার আগুন।

আমাদের হাতে বেশী সময় নেই, কাজ সারতে হবে দ্রুত। আমরা পা চালাই। চারিদিকে ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড়, ভয়ার্ত কর্কশ ডাক ছেড়ে উড়ে যাচ্ছে সন্ধ্যের শেষ পাখির দল, জংলি ফুলের রেণুতে বারুদ বারুদ গন্ধ। মায়া উদ্ভিদ থেকে পথের দুধারে ঝরে পড়েছে করুণার চূর্ণ ফুল, রাত্রির চিদস্পর্শে জরাগ্রস্থ ডাকিনীর অস্পষ্ট প্রেতদাগ। চারিদিকে কেমন একটা অপার্থিব নিশ্চলতা, কেবল দামামার শীৎকারে মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে অরগ্যাসমিক চাঁদ।

***

এদিকে পাহাড়ের দেখা নেই! গত তিন ঘণ্টা ধরে আমরা এই ভুতুড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এমনটা তো হবার কথা নয়। ধর্মকেতু গণনা করে দেখেছে জঙ্গলের প্যাঁচানো পথে খানিকদূর গেলেই পাহাড়ের উৎরাই শুরু হওয়ার কথা। ধর্মকেতুর গণনা তো মিথ্যে হয়না, সে গণিতের দিগগজ বটে। কদিন আগেই গণনা করে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের পা এর মাপ আবিষ্কার করেছে। এদিকে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের সুকতলা ক্ষয়ে যাবার যোগাড়! আমরা কি তবে জঙ্গলে পথ হারিয়েছি? ধর্মকেতু আবার নক্ষত্রের অবস্থান মিলিয়ে মাটিতে হিজিবিজি ছক কেটে আঁক কষতে

বসলো। আর ওমনি জঙ্গলের অন্ধকারও যেন আরও এক পোঁচ ঘন হয়ে ঝুপ করে নেমে এলো তার কোলের ওপর, আকাশের বুকে কোত্থেকে এক পাল জমাট মেঘ এসে ঢেকে দিল নক্ষত্রদের। এ কি অলুক্ষুনে কাণ্ড!

আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি কোনও একটা অতিপ্রাকৃতিক শক্তি প্রবল ভাবে বাধা দিতে চাইছে আমাদের। তারা চায়না যে আমরা তাদের জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করি। তারা চায়না তাদের পবিত্র পাহাড়ের চুড়ায় পড়ুক বিধর্মী মানুষের পায়ের ছাপ। বিকেলের দামামার শব্দ, যাকে আমরা অলৌকিক রণবাদ্য ভেবে আমোদ পেয়েছিলাম তা আসলে ছিল তারই সংকেত। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে এই কথা। দুটো বিষধর শহুরে দ্বিপদকে দেখা গেছে এ অঞ্চলে। নিশ্চিহ্ন করো ওদের, রক্তবীজের বংশ ওরা, এসেছে সব লুটে পুটে নিতে। ওরা মায়াবী, জাদু-মন্তর জানে, সহজ ব্যবহারে ভুলিয়ে নিতে এসেছে তোমার অধিকারের অরণ্য, প্রিয় সবুজ, যুগ যুগ ধরে এভাবেই আসছে ওরা, ওদের বিশ্বাস করোনা। মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা সোনার প্রতি ওদের লোভ, প্রান্তরের বুকে ছড়িয়ে থাকা কুয়াশার প্রতি ওদের লোভ, আলুলায়িত অরণ্যের যুবতী শরীরের প্রতি ওদের লোভ। এই লোভই ওদের পরমারাধ্য দেবতা, ওদের চালিকাশক্তি। ওদের হত্যা করো, খতম করো। নিকষ অন্ধকারের জমাট হাত দিয়ে কে যেন আমাদের গলা টিপে ধরেছে, বন্ধ হয়ে আসতে থাকে আমাদের নিঃশ্বাস, আমি ছটফট করে উঠি, পালাবার পথ খুঁজতে থাকি। পাশে তাকিয়ে দেখি ধর্মকেতু নিশ্চল ধ্যানের ভঙ্গিতে বসে রয়েছে। আমি তাকে পালাতে বলি। সে আমাকে নিশ্চয়তা দেয়, সমাহিত স্বরে বলে, প্রায়শ্চিত্তের সময় এসেছে বন্ধু, আমাদের পিতৃপুরুষের বহু ঋণ শোধ করা বাকি ছিল, তারাই টেনে এনেছে আমাদের এই গহনে, মুক্তির আর দেরী নেই, অগ্রজের পাপকে বয়ে বেড়ানোর এই বুঝি শেষ, প্রস্তুত হও। আমার মাথা কাজ করেনা, প্রশ্ন করি, তাহলে আমাদের পাহাড়ের চূড়ায় যাওয়ার কি হবে? সে মৃদু হেসে বলে, ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখো, পাহাড়ের চূড়াতেই তো বসে আছো, চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে অধর্মের পর্বতশ্রেণী আর পাপের সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ!

আমার পা অবশ হয়ে আসছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি দূরের বনভূমির আকাশে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে, দুন্দুভির রণবাদ্যে কান পাতা দায়। প্রকৃতির পরম মমতাময়ী সংহারক এই আগুন এসেছে আমাদের মুক্তি দিতে, আমাদেরই পাপের আগুন এগিয়ে আসছে ক্রমে, এই শাশ্বত আগুনে পুড়ে ছারখার হবে সমস্ত অধর্মের ইতিহাস, সমস্ত স্বেচ্ছাচারের মহাকাব্য। ধর্মকেতু নিশ্চল ধ্যান-মুদ্রায়, অর্ধ-নিমীলিত চোখ মাটির ওপর রেখে বিড়বিড় করে প্রলাপ আওড়াতে থাকে। তার বিকারগ্রস্ত অস্তিত্ব আমার স্নায়ুর ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে, আমি সেই নারকীয় অন্ধকারের মধ্যে পাগলের মত এদিক সেদিক ছুটোছুটি করে এই গোলকধাঁধা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার রাস্তা খুঁজতে থাকি। ধর্মকেতুকে চিৎকার করে বলি, কিছু করো বন্ধু, তন্ত্র মন্ত্র মারণ উচাটন - কিছু একটা করো, আর তার গোঙানির মত বিড়বিড়ানির শব্দ আমার কানে সহস্র জলপ্রপাতের মত আছড়ে আছড়ে পড়ে, “বড় দেরী হয়ে গেছে বন্ধু, বড়ই দেরী হয়ে গেছে, পালাবার আর কোনও পথ নেই, পুরুষকারকে প্রকৃতির হাতে সমর্পণের পালা এইবার, সভ্যতার ইতিহাসের উপসংহার লেখা হবে আদিমের বর্ণমালায়, প্রস্তুত হও সকলে প্রস্তুত হও...”

অনেকের মাঝে একা হওয়ার একটু পরে

চু কিৎ কিৎ

জুলাই ৫, ২০১৪

ট্রেন যথাসময়ে ছেড়ে যখন শিয়ালদহ এবং বিধাননগরের মাঝামাঝি জায়গায়, ঠিক এমন সময় আমার মোবাইল ফোনটি বেজে উঠল। কথা শেষ হওয়ার আগেই লাইন কেটে গেল। নো নেটওয়ার্ক কভারেজ। অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল – ওঃ শিট। তারপর এক এক মুহূর্তকে মনে হতে লাগল এক ঘণ্টা। আমার কথাবার্তা একটু লম্বা হওয়ার দিকে ছিল, সেই সঙ্গে মনে পড়ল দমদম ছেড়ে ট্রেন একটু এগোলে আবার একই সমস্যার মুখোমুখি হব, এছাড়াও ভিড়ের মধ্যে হয়ত ঠিকঠাক শুনতেও পারব না। কাজেই একবার নেটওয়ার্ক ফিরে পেতেই একটা টেক্সট পাঠিয়ে দিলাম যে আধঘণ্টা পরে ফোন করছি। আমি নিশ্চিত তখন এই সমস্যা থাকবে না।

আধঘণ্টা কেটে গেল। ট্রেন থেকে নেমে অটোর লাইনে দাঁড়িয়ে ফোন করলাম। কথা বলছি, আবার একই অবস্থা। দু'চারবার হ্যালো হ্যালো বলে ওপ্রান্ত থেকে সাড়া না পেয়ে ফোনটা সামনে নিয়ে দেখলাম চার্জ নেই, ফোন বন্ধ। অর্থাৎ প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ধাক্কা। আধঘণ্টা লাগবে বাড়ি পৌঁছতে, তারপরে মিনিট পনের চার্জ দিয়ে তবেই কথা বলতে পারব। একবার নিজেকে মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়ে নিলাম, প্রিপেড কানেকশনের বদলে পোস্টপেড নেওয়ার জন্যে। অন্তত ব্যালান্স শেষ হয়ে যাওয়া জনিত কারণে আমাকে কখনও বিপাকে পড়তে হয় না। অটোতে উঠলাম, সেই ট্রেনের অভিজ্ঞতা, এক মুহূর্তকে মনে হচ্ছে কয়েকদিন। কোথাও জ্যামে সামান্যতম আটকালেও মুখে গালাগাল উঠে আসছে। বহু কষ্টে সংযত রইলাম। বাড়িতে ঢুকে মোবাইলটা চার্জে বসাব, জামার পকেটে হাত দিয়ে বুঝলাম মোবাইলটা ওখানে নেই। এরপর বুঝলাম আমার জামার পকেট কেন, প্যান্টের পকেট কিংবা ব্যাগেও নেই। আবার বের হলাম, রাস্তায় দেখতে দেখতে। নাহ্ নেই। অর্থাৎ এতক্ষণ কথা বলতে পারছিলাম না, এখন এর সাথে জুড়ল সমস্ত কন্ট্যাক্ট, মেসেজ সব কিছুর জলাঞ্জলি। তবে মন্দের ভাল, আপডেটেড না থাকলেও একটা ব্যাক-আপ রাখা আছে।

কি মনে হচ্ছে? বানিয়ে বানিয়ে কি সব লিখছি, তাই তো? ঠিক ধরেছেন। একদম ঠিক। বানিয়ে বানিয়েই লিখছি। সবরকম দুর্ঘটনা একইসঙ্গে এভাবে সচরাচর ঘটে না। ঈশ্বর অত্যন্ত দয়ালু।

কারো কারো ক্ষেত্রে সমস্যা শুরু হয় এর অনেক আগে থেকেই। কারণ ঈশ্বর দয়ালু হলেও এখনও এতটা দয়ালু হয়ে উঠতে পারেননি যে এর প্রতিটি থেকেই সর্বদা বাঁচিয়ে দেবেন। অতএব ঘটতে পারে এর যে কোনও কিছুই, আলাদাভাবে হলেও। এই 'ঘটতে পারে' থেকেই শুরু হয় বিপত্তি। এক সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে যে এই 'ঘটতে পারে' যে চাপ সৃষ্টি করে তার তুলনা প্রথম চাকরি শুরু করা, প্রথমবার দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ার কাছাকাছি। একটু পুরোনো একটি গবেষণা এ-ও জানাচ্ছে যে ইংল্যান্ডের প্রায় ৫৩ শতাংশ মোবাইল

ব্যবহারকারী আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন এই ব্যাধিতে। অর্থাৎ 'কি ঘটলে কি ঘটতে পারে' এই ভবিষ্যৎচিন্তায় মাথা খারাপ হয়ে উঠেছে তাঁদের। হ্যাঁ, এটি একটি মানসিক অসুখ যার নাম 'নো মোবাইল ফোন ফোবিয়া' সংক্ষেপে 'নোমোফোবিয়া'। মাত্র ছয় বছর আগে এই অসুখটির নামকরণ হলেও পিছিয়ে নেই আমাদের এই পোড়া দেশও। প্রায় চার বছর আগে ইন্দোরে একটি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের ভেতর সমীক্ষা চালিয়ে এই অসুখটির উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে নিশ্চয় আরও বেড়েছে, কারণ মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট এখন অনেক বেশি উন্নত হয়েছে। আরও বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি হয়েছে। বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা হয়ে থাকা অনেক সহজ হয়েছে, সেই সঙ্গে অজান্তেই হয়ত এগিয়ে গিয়েছি অন্য দিকে।

একটি ব্যাধি হিসেবে একে সদ্যোজাতই বলা যায়। অতএব বিতর্ক আছে। আজকের দিনে গতির সঙ্গে তাল মেলাতে গেলে মোবাইল ফোন তো অপরিহার্য। তাহলে কাকে বলব নোমোফোবিক? উপায় কিছু বেরিয়েছে। মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে।

১. হ্যান্ডসেটের সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতিতেই সীমাহীন অধৈর্য হয়ে পড়া
২. কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটছে কিনা তা নিয়ে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কনশাস হয়ে ওঠা
৩. হ্যান্ডসেটটির জন্যে প্রায় জেড প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা
৪. অন্যের হ্যান্ডসেটের বিষয়ে অতিরিক্ত আগ্রহী হয়ে ওঠা

এই দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে যাঁরা চাইছেন তাঁরা যে পদ্ধতি অনুসরণ করছেন, তা হল -

১. দিনের কিছু সময় ফোনহীন থাকা
২. আপনি যে গাড়ি চালাচ্ছেন বলে ফোন ধরতে পারছেন না, তা টেক্সট করে জানানো অদরকারী
৩. ঘুমোতে যাওয়ার ঠিক আগে বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার দরকার নেই। আগামীকাল বলে কিছু একটার অস্তিত্ব আছে।
৪. এমনি একটু হেঁটে আসছেন শুধুমাত্র জামাকাপড় পরে।
৫. দিনের কোনও একটা সময়ে লিখে ফেলছেন কাদের সাথে ফোনে কথা বলেছেন এবং সেটা কতটা জরুরি ছিল।

অর্থাৎ সেই সব পদ্ধতিই অনুসরণ করছেন যা আমাদের বাইরের জগত থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে নিজেদের অন্তরমহলটাকে দেখার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। আসলে এই পৃথিবীতে একাই এসেছি, আবার ফিরে যাব একাই, আমি থাকি বা না থাকি এই গ্রহের কিছুই যায় আসে না, সে ঘুরতেই থাকবে আর নিত্য নতুন প্রাণের জন্ম দেবে, এত ভেতরেই কেউ সাময়িক অপরিহার্য হয়ে উঠব, কিন্তু কোনোদিনই এতটা অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারব না যে আমার অনুপস্থিতি এই গ্রহের ঘূর্ণন বন্ধ করে দিতে পারে।

জিভের কেরামতি

প্রত্যয়

এপ্রিল ২১, ২০১৪

[এই ছবি-ব্লগটির প্রথম দুটি ছবি (ক্যামেরা – ক্যানন পাওয়ারশট এস থ্রি আই এস) বাদে কোনোটিই আমার তোলা নয়। ফোটগ্রাফারের নাম প্রতিটি ছবির নিচে দেওয়া হল।]

পাখি বলে কি জিভে জল আসতে নেই? আপনার সামনে ভাল মন্দ খাবার দিলে আপনার জিভ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে, আর পাখিদের বেলায় যত দোষ? দেখুন না, এক খানা জব্বর মাছের সন্ধান পেয়ে মিস্টার গ্রেট ব্লু হেরন কিরকম জিভ দিয়ে চেটে নিচ্চেন নিজের ঠোঁট।

ভালমন্দ খাবার দেখে ম্যালার্ড হাঁসের জিভে জল-

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে ব্যস্ত গ্রেট ব্লু হেরন

উপরের দুটো ছবিই স্রেফ মজা করে পোস্ট করা। কিন্তু তা বলে ভাববেন না পাখিদের জিভ হেলাফেলা করার মত বস্তু। হিতোপদেশের সেই শেয়াল আর সারসের গল্প মনে আছে? সারসকে থালায় করে ঝোল খেতে দিয়ে প্র্যাকটিকাল জোক করেছিল শেয়াল। সারসের পক্ষে থালা থেকে ঝোল খাওয়া এট্টু কঠিন হলেও অন্য কিছু পাখির ক্ষেত্রে কিন্তু তা খাটেনা। তারা থাকলে শেয়ালকেই বোকা বনতে হত সেদিন।

সারস (ফোটো – কাজল দাশগুপ্ত) বনাম রেনবো লোরিকিট (ছবি সূত্র – উইকিপিডিয়া)

পাখিদের ঠোঁটের আড়ালে জিভের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেকেই অবগত না। যাঁরা পাখি সম্পর্কে সামান্য খোঁজ-খবর রাখেন তাঁরা সকলেই জানেন, কিন্তু আমার অনেক বন্ধুকেই দেখেছি এই ব্যাপারটা ঠিক হজম করতে পারেনি। আসলে পাখিরা সকলের সামনে জিভ বার করেনা সেরকম বেশি। তাই একটা কুকুর জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে এই দৃশ্যটা যেমন বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে, একটা পাখি জিভ বার করে থালা থেকে তরল চেটেপুটে খাচ্চে বললে সে তুলনায় অনেকটা অ্যাবসার্ড লাগে।

তা বলে এমন নয় যে পাখিদের জিভের ব্যবহার কম। বিভিন্ন পাখির জিভ বিভিন্ন রকমের হয়, আর সেই জিভ ব্যবহার করে তারা নানারকম কাজ করে থাকে। প্রধান ব্যবহার স্বভাবতই খাওয়া দাওয়া সংক্রান্ত। পোকামাকড় খুঁটে খাবার সুবিধের জন্য, জলের মধ্যে থেকে শিকার ছেঁকে নেবার জন্য, খাবার গ্রিপ করার জন্য অথবা জোগাড় করা খাবার বাচ্চাকে এগিয়ে দেবার জন্য... এরকম বিভিন্ন প্রয়োজনে তারা ব্যবহার করে তাদের জিভ।

হামিং বার্ডদের কথা বা মৌটুসি জাতীয় পাখিদের কথাই ধরা যাক। এদের জিভ তৈরি হয় সরু সুতোর মত একটা ক্যাপিলারি নালী দিয়ে। তার সাহায্যে খুব সহজেই এরা ফুলের থেকে মধু সংগ্রহ করতে পারে। অনেকটা স্ট্র দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে সরবত পান করার মত।

রুবি থ্রোটেড হামিংবার্ড এর ক্যাপিলারী জিভ (ফোটো – হেইজ কামিনস)

যেসব পাখিরা ছোট পোকামাকড় ধরে খায় তাদের অনেকের জিভের ডগায় ধারালো ফলা লাগানো থাকে। সেই ধারালো ফলায় বিঁধিয়ে নেয় নিজের শিকার। গাছের গায়ের ফাঁকফোকর থেকে পোকা সংগ্রহ করার জন্যেও এইরকম জিভ খুব কাজের। নাটহ্যাচ জাতীয় পাখিদের জিভের ডগাটা তাই হয় কাঁটাচামচের মত। সেই কাঁটা দিয়ে ওরা দিব্যি তুলে নেয় পছন্দের খাবার।

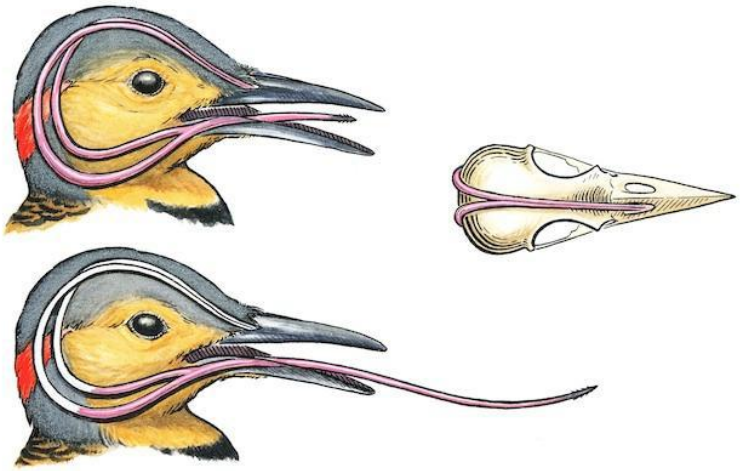

কাঠঠোকরার জিভের কেরামতি (ছবি – ডেনিস তাকাহাশি)

কাঠঠোকরার জিভ এক চরম জিনিস। এদের সুদীর্ঘ জিভ এমনিতে মুখের ভিতরে লুকিয়ে থাকে, কিন্তু একবার ধারালো ঠোঁট দিয়ে গাছের গায়ে গর্ত বানিয়ে ফেলার পর সেই লম্বা জিভ বার করে কোটরের ভিতর থেকে পোকামাকড় ধরে এরা। এদেরও জিভের ডগায় থাকে কাঁটা বা রোঁয়া। সেগুলোকে রেক (Rake) এর মত ব্যবহার করে টেনে আনে পোকাদের। নিচের কাঠঠোকরার ছবিদুটোয় দেখতে পাবেন এদের লম্বা জিভের অংশবিশেষ।

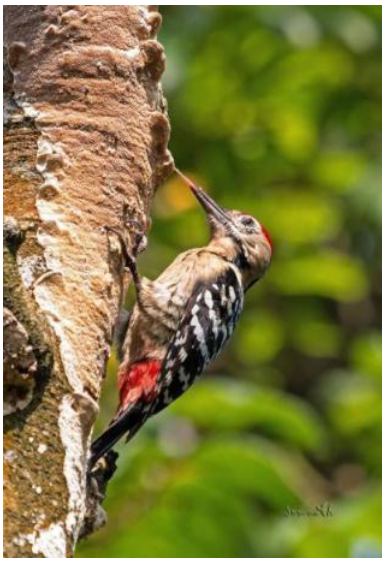

পাইলিয়েটেড উডপেকার (ফোটো – মার্ক অ্যাভেরিট) আর ফাল্ভাস-ব্রেস্টেড উডপেকার (ফোটো – সোমনাথ ঘোষ)

সাধারণত বেশিরভাগ পাখির জিভ হয় একটা মাংসল সরু ডগা ওয়ালা ফলার মত। উদাহরণ হিসেবে শালিখের একটা ছবি দেওয়া গেল। চারপাশে যেসব পাখি দেখা যায় তাদের বেশিরভাগেরই জিভ এই ধরনের। যারা বাদামজাতীয় শক্ত খাবার খায়, তাদের জিভ হয় অপেক্ষাকৃত শক্ত। আবার শিকারী পাখিদের জিভ হয় বড়, শক্ত আর খসখসে। ফুলের রেণু আর নরম ফল খাবার সুবিধের জন্য টিয়া জাতীয় পাখি লোরিকিটদের জিভের ডগাটা হয় ব্রাশের মত। জিভ দিয়ে চেটে চেটে খাওয়া বলতে যা বোঝায় সেটা পাখিদের মধ্যে এদেরকেই করতে দেখা যায়।

শালিখ (ফোটো – সুচেতনা সেন)

শঙ্খচিল (ফোটো – অভিলাশ পিল্লাই)

কিন্তু এত রকম বিচিত্র গড়নের জিভ নিয়ে এরা কি স্বাদ বুঝতে পারে? দেখা গেছে স্বাদগ্রন্থি থাকলেও তার সংখ্যা বেশিরভাগ পাখির ক্ষেত্রেই খুব কম। ফলে স্বাদের অনুভূতি খুব জোরালো নয়। কারো ক্ষেত্রে একেবারেই কম, আবার কারো ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি। নানা গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে পাখিরা মিষ্টি, নোনতা, টক এবং তেতো স্বাদ বুঝতে কমবেশি সক্ষম।

কানাডা গুজের কাঁটাওয়ালা জিভ (ফোটো – চাক হোমলার)

জলের পাখিদের জিভেও দেখা যায় নানারকম বৈচিত্র্য। কিছু কিছু হাঁসের জিভ জল থেকে ছোট ছোট শিকার ছেঁকে নেবার কাজ করে। খাবার শুদ্ধু বেশ কিছুটা জল মুখে পুরে নিয়ে এরা জিভটাকে টাকরার দিকে তুলে দেয়। ফলে জিভের পাশের দিকের সরু সরু রোঁয়ার ফাঁক দিয়ে জলটা বেরিয়ে যায়, কিন্তু খাবার রয়ে যায় বন্দী হয়ে। একেবারে প্রথম ছবিটা এরকম সময়েই তোলা। (খাদ্যপ্রেমীদের জন্য তথ্য – হাঁসের জিভ কিন্তু একটা ডেলিকেসি। কখনও খেয়ে দেখেছেন নাকি?)

বিভিন্ন মাছ খেকো জলের পাখিদের জিভের দুপাশে কাঁটা কাঁটা থাকে। এই কাঁটার সাহায্যে তারা মাছের পিচ্ছিল দেহকে সহজে গ্রিপ করতে পারে। আবার গুজ জাতীয় পাখিরা এই কাঁটাওয়ালা জিভকে জলজ লতাপাতা ছেঁড়ার কাজেও ব্যবহার করে। কারো কারো জিভের ধারের কেবল বিশেষ কিছু অংশে এই কাঁটা থাকে। আবার তেমনি পেঙ্গুইনের জিভের উপরিভাগ পুরোটাই এরকম কাঁটা দিয়ে ঢাকা।

এ তো গেল খাবার সংগ্রহের কথা। আরেকটা ব্যাপার না বললে জিভের কথা সম্পূর্ণ হয় না। আমরা কথা বলার সময় জিভ ব্যবহার করে নানা ধরনের শব্দ তৈরি করতে পারি। এই কাজটা পাখিরা বিশেষ করে না। আমাদের মতই ওদেরও শব্দটা বের হয় গলার মধ্যে থেকে। তারপরে সেই শব্দকে নানারকম রূপ দেবার জন্য ঠোঁটকে ব্যবহার করে থাকে তারা, অনেকটা শিস দেবার মত কায়দায়। কিন্তু এই কাজে জিভের ব্যবহার নেই বললেই চলে। ব্যতিক্রমও আছে। টিয়া জাতীয় পাখি, যারা বোল পাড়তে পারে, তারা মানুষের মত শব্দ করতে পারে কারণ তারা ডাকার সময় জিভকেও ব্যবহার করে। গবেষণায় দেখা গেছে টিয়ার ডাকে জিভের বড় ভূমিকা আছে (বোল না পাড়ার সময়ও)।

একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা দিয়ে শেষ করব। পাখিদের এই যে নানারকম গান গাওয়া, শিস দেবার অভ্যেস, এর কারণ জানেন কি? ঠিকই ধরেছেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীটিকে আকৃষ্ট করা। অনেকটা সেই হবু বৌ দেখতে গিয়ে "একটা গান শোনাও তো মা" টাইপের। মেয়ে পাখি এসে বলে "গান শোনাও দেখি, কেমন পারো"। আর পুরুষ পাখি নানারকম সুরেলা গান গেয়ে আকৃষ্ট করে তাকে। শুধু ভোকাল মিউজিক না, বাদ্যযন্ত্রও আছে। কাঠঠোকরাদের গাছের গায়ে ড্রাম বাজানো কখনও না শুনে থাকলে গুগল করে নিন। অথবা তার চেয়েও ভাল, এক রোদ ঝলমলে বিকেলে বেরিয়ে পড়ুন জংলি রাস্তায়। কাঠ ঠোকরার ড্রামের সঙ্গে বিভিন্ন পাখির সঙ্গীতের জলসা শুনতে পাবেন কান খোলা রাখলেই।

আমার স্কুল দিনের নীল চাইনিজ শার্ট কে

থাংকমনি

ফেব্রুয়ারী ১৮, ২০১৪

শার্ট খানা তারে ঝোলে,
পাতার বিন্যাসে।
রঙ আছে, শিরা আছে
পাখিরাও আসে;
ওইখানে জমা করে নুড়ি
ওইখানে শালিখ চুম্বন
ওইখানে কলহ ও প্রেম
সহবাস... প্রথম রমন।

দূরদর্শনে পুনঃপ্রচার -
এবার আমরা সমুদ্রজলের ঘ্রাণ নেবো কলার এর নির্বাচিত স্থানে
(প্রোষিতভর্তা পাখি, নতুন নাগর তার; জেনে গেছে মানে।)
মৌসুমি বায়ু বয়, জামাটাও ভিজবে খানিক,
প্রেম অর্শ পিত্ত কফ ছাড়া, আবহাওয়া আর্দ্র স্বাভাবিক।

ভিজে যায় পিনোকিও, উড়ে যায় প্রসারিত হাত।
কলার কামড়ে ধরে ক্লিপ, স্পর্ধা খোঁজে হত অবসাদ।
স্পষ্ট হয় শিরা উপশিরা... টান দিল সুতোর বাঁধন;
বুক খোলা মাজাকিরা হাসে... ওই শার্ট আমার যৌবন।
পিঠে লেগে দ্বেষ ঘৃণা ছুরি, তার সে কি উদ্দাম প্রয়াস
চিলের উড়ান দেবে সেও...
আর তোর নাম পাশে রেখে আমি অনুপ্রাস।

এলোপাথাড়ি ১

শাক্য মুনি

অক্টোবর ১৬, ২০১৪

চারিদিকে এমন সব উৎকট ঘটনা ঘটে চলেছে যে ইদানিং আমার সেই পুরনো মাথার ব্যামোটা আবার চাগাড় দিয়ে দিয়ে উঠতে চাইছে! বাংলায় পাব্বনের মরশুম চলছে, জনগণ নীল সাদা ও সবুজ এলিডি আলো ঝুলিয়ে দিয়েছে ব্যালকনির রেলিঙ থেকে। দুগগা পুজো শেষ এবং কালী পুজো আসবার উপক্রম হল। এদিকে এখনও ফ্রিজের আদ্দেকটা দখল নিয়ে হাসি হাসি মুখে বাক্স ভর্তি করে বসে রয়েছে নাড়ু ও মিহিদানারা। কিন্তু শুধু বসে থাকাই সার। আজকালকার ছেলেপুলেরা ফেসবুক আর হোয়াটসঅ্যাপেই বিজয়ার পেন্নাম সেরে নেয়, কোলাকুলির বদলে করে হ্যান্ডশেক! মিহিদানাদের দিকে আজকাল কেউ মুখ ফিরিয়েও চায়না। তাদের সেই সম্মান নেই সমাজে। মিহিদানারা আজ বাঙালি জীবনে ব্রাত্য!

আজ থেকে শতাধিক বৎসর পূর্বে যে বর্ধমান থেকে এই রাজকীয় মিষ্টান্নটির জন্ম ও জয়যাত্রার সূচনা সেই বর্ধমান ইদানীং এক তিক্ত কারণে সংবাদ শিরোনামে স্থান দখল করিয়াছে। আমাদিগের নিকট সংবাদ আসিতেছে যে উক্ত জিলার বিভিন্ন পল্লীতে যবন দস্যুরা সন্ত্রাসবাদী নির্মাণের কল খুলিয়াছে এবং তাহারা নারী ও শিশুদিগের সহিত অগ্নিকন্দুক লইয়া লোফালুফি খেলিতে খেলিতে অবলীলায় প্রাণ দিতেছে। তাহারা মূলত বিভিন্ন ইসলামীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মুসলমান জনসমাজে সন্ত্রাসের শিক্ষা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছে।

ইদানিং আমাদের রাজ্যের সরকার বাহাদুরের শিরঃপীড়ার প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নামক এই গোলমেলে চক্করটি! এদিকে যাদবপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ে হোককলরব, ওদিকে মানিকতলার কলেজে হোকক্যালানি, সেদিকে শিমুলিয়ার মাদ্রাসায় হোকসন্ত্রাসবাদ! এবার খচে গিয়ে যদি সরকার বাহাদুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যাপারটাকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেন তো কেউ দোষ দিতে পারবেনা! শোনা যাচ্ছে দিল্লীর আই-আই-পি-এম কে অবৈধ ঘোষণা করার পর থেকে এই মর্মে নানা মহল থেকে গ্রিন সিগনাল আসতেও শুরু করেছে। শঙ্কুস্যার নাকি অলরেডি সেই প্রস্তাবের পক্ষে সম্মতি দিয়েছেন। ভাঙড়ের আরেক ডাকসাইটে শিক্ষাবিদ 'জগমোহন' স্যারও নাকি এ ব্যাপারে তাঁর মরাল সাপোর্ট জানিয়ে রেখেছেন বলে খবর।

আবার একদিকে যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীশিক্ষার নামে বোম বাঁধা শেখানো হচ্ছে অন্যদিকে সেই নারীশিক্ষার প্রসারেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকার জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার পাচ্ছেন পাকিস্তানের ১৭ বছরের কিশোরী। কেউ কেউ এই স্বীকৃতিতে আপ্লুত হয়ে বগল বাজাচ্ছেন "মালালাই মানবতার অগ্রদূত, ইসলামের প্রথম মহিলা পয়গম্বর" বলে, আবার কোনও কোনও চক্রান্ত-তাত্ত্বিক সরু চোখে বাঁকা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছেন - "ব্লগ লেখা আর দেশ বিদেশের সভায় ভাষণ দেবার বাইরে গ্রাউন্ড লেভেলে ঠিক কি কি কাজ করেছেন মালালা বলতে পারেন?" এর উত্তরে বগলবাদকরা

চক্রান্ত-তাত্ত্বিকদের "আগে একটা তালিবানি গুলি খেয়ে হজম করে আসুন মশাই, তারপর এই ধরণের কূট প্রশ্ন ছুঁড়বেন" বলে গাল দিচ্ছেন। চক্রান্ত-তাত্ত্বিকরা তখন আরও এক কদম এগিয়ে "মালালা তো ওর বাপের মতই একজন এম-আই-সিক্সের চর, ড্রোন হামলার সুবিধার জন্য সোয়াট উপত্যকায় তালিবানি ঘাঁটির ঠিকানা বাতলে দিয়েছিলো বলে তালিবানিরা খচে গিয়ে গুলি করেছিলো" বলে হল্লা মাচাচ্ছে! কেউ কেউ তো এসব ছেড়ে নোবেল শান্তি পুরস্কারের গুরুত্ব নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করে বলছেন "একে তো ওটা 'আসলি' নোবেল নয়, তার ওপর কিসিঞ্জার আর ওবামা বিশ্বশান্তির জন্য যে পুরস্কার পায় তার মত অর্থহীন হাস্যকর পুরস্কারকে সিরিয়াসলি নেবারই দরকার নেই"।

এহেন পরিস্থিতিতে মালালা তাঁর নোবেল শান্তি পদক গ্রহনের দিনটিকে স্মরণীয় ও সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ করে রাখবার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের ওয়াজীর-এ-আজম নাওয়াজ শরীফ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নেমন্তন্ন করেছেন। যদিও ইতিমধ্যে নাওয়াজ শরীফের তরফ থেকে ওইদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হবে না বলে বার্তা দেওয়া হয়েছে। এতে করে শিক্ষিত পাকিস্তানী মহল বেশ চটে উঠেছে। তাহলে কি নাওয়াজ শরীফ দুদেশের শান্তির বাতাবরণ পুনঃস্থাপনে উৎসাহী নন? নাকি তিনি আসন্ন ভোটাভুটির মরশুমে উগ্র মৌলবাদীদের বেমক্কা খচাতে চাননা? এমনিতেই সারা পাকিস্তনা জুরে "গো নাওয়াজ গো" স্লোগানে কান পাতা দায়। ইমরান খানের একের পর এক বাউন্সার আর ইয়র্কার সামলাতে গিয়ে নাওয়াজ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের অবস্থা সঙ্গিন। ব্যর্থ রাষ্ট্রর

তকমা মুছে ফেলতে পাকিস্তানের শিক্ষিত সম্প্রদায় দাবী তুলছেন গণজাগরণের। "মার্শাল ল" এর বিরুদ্ধে গড়ে উঠছে জনমত, দুর্নীতি পরায়ণ রাষ্ট্রিক পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে শক্ত হচ্ছে গণতন্ত্রের দাবী। কিন্তু হলে কি হবে, কেউ কেউ বলেন সেনাবাহিনী ও আইএসআই এর ক্ষমতা সেদেশে রসুল আল্লাহ্‌র চেয়েও কয়েক গুণ বেশী। ফলে কাশ্মীর ইস্যুকে আবার "কোর ইস্যু" বানিয়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সেনাবাহিনীর প্রাধান্য বাড়িয়ে গদি বহাল রাখার সেই পুরনো জুলফিকারিয় ছকের আশে পাশে ঘোরাফেরা করছেন নাওয়াজ ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা।

আর এপার থেকেও আমাদের জাতীয়তাবাদী বিদেশনীতি তার উপর্যুপরি প্রত্যুত্তর দিয়ে চলেছে সমানে। ক্ষমতায় আসার তিন মাসের মধ্যেই চীন জাপান অস্ট্রেলিয়া কানাডা ও আমেরিকার মত তাবড় তাবড় দেশের সঙ্গে বেশ কয়েকটি অর্থনৈতিক ও সামরিক চুক্তিতে সই করে নরেন্দ্র দামোদর দাসের প্রত্যয় এখন গগনচুম্বী। তার ওপর আবার তাঁর সঙ্গে আছে আর-এস-এস নামক একদল ধর্মান্ধ উগ্র জাতীয়তাবাদী পাবলিকের পূর্ণ সমর্থন যারা পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পেলে আর কিছুই চায়না। এমনিতেই যেকোনো দেশের সেনাবাহিনী-টাহিনি গুলো জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই যা কিছু যুদ্ধ-বিগ্রহ করে থাকে। উপরন্তু আমাদের দেশে আমরা মুখে যতই সেকুলারিসমের বুলি আওড়াই আর সাচার কমিটি গঠন করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের সেনাবাহিনীতে মুসলিম রিক্রুটমেন্ট ৩ পারসেন্টেরও কম। ফলে মুসলমান সেনার উস্কানিমূলক গোলাবর্ষণের প্রত্যুত্তরে "হিন্দুস্তানি" সেনা খুশি মনেই রিট্যালিয়েট করবে, বলাই বাহুল্য। আর তাতে যদি স্বয়ং সরকার বাহাদুরের পূর্ণ সম্মতি থাকে তাহলে তো কথাই নেই।

এ প্রসঙ্গে যে ছোট্ট অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি সবচেয়ে বেশী মনোযোগ আদায় করে তা হল প্রায় এক দশক পর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারী বিবৃতিতে সীমান্তে পাকিস্তানী হামলার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সরাসরি "শত্রু" শব্দটি ব্যাবহার করলেন। সেই ১৯৯৯ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ীর জমানায় যে দ্বিপাক্ষিক সদ্ভাবের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিলো, মনমোহন সিংহও যে পথকেই একমাত্র সঠিক পথ হিসাবে বুঝেছিলেন ও দ্বিপাক্ষিক আলোচনার রাস্তায় ও বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে দুদেশের সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজেছিলেন, তা বুঝি এই উগ্র-জাতীয়তাবাদী ধর্মীয় লুম্পেনদের হাতে পরে কেঁচে গণ্ডূষ হবার যোগাড়।

"Today, when bullets are being fired on the border, it is the "enemy" that is screaming. Our jawans have responded to the aggression with courage. ~Narendra Modi"

আর মোদী সাহেবের এই "শত্রু" শব্দের ব্যাবহার নিয়ে পাকিস্তানেও বিস্তর শোরগোল বেঁধেছে, এবং নাওয়াজ শরীফকে যথারীতি সবাই মিলে গাল দিচ্ছে কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে এতদিন নরম অবস্থান গ্রহণের জন্য। তবে এখানেও চক্রান্ত-তাত্ত্বিকের অভাব নেই যারা মনে করেন যে কারগিল যুদ্ধ নিয়ে নাওয়াজের মনে মনে নাকি একটা গোপন পাপবোধ রয়েছে যা তাঁকে ভারতের কাছে ছুতোয়-নাতায় সাবমিশানে বাধ্য করে। তবে নিন্দুকেরা তো এও বলেন যে নাওয়াজ শরীফ ও তাঁর ছেলের ভারতের সঙ্গে যে ব্যক্তিগত ব্যাবসায়িক সম্পর্ক ও লেনদেন রয়েছে তাতে কোনও প্রকারেই যাতে চিড় না ধরে সে জন্য নওয়াজ এতদিন মুখ বুজে ছিলেন এবং নেমন্তন্ন পাওয়া মাত্র দৌড়ে মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন। বস্তুত নাওয়াজ শরীফ ও নরেন্দ্র মোদী দুজনেই জাত ব্যবসায়ী। একজন নিজেই নিজের গুজ্জু ব্যবসায়ী সত্তাকে ফলাও করে বলে বেড়াতে ভালোবাসেন, অন্যদিকে আরেকজন পাকিস্তানের অন্যতম বৃহত্তম একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান "দি শেরিফ গ্রুপ" এর বর্তমান মালিক। কিন্তু এত এত ব্যবসায়িক বুদ্ধি নিয়েও এঁরা দুজনে কেন এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি করতে পারছেন না যে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করার চেয়ে শান্তিতে থাকলে দুদেশের অর্থনীতির পক্ষেই তা লাভজনক হবে! একজন নিজের গদি বাঁচানোর লক্ষ্যে আর আরেকজন 'রিজিওনাল সুপার পাওয়ার' সুলভ ইগোর বশবর্তী হয়ে দেশবাসীকে যে ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিতে চলেছেন তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল সীমান্তের দুপারের আমার আপনার মত সাধারণ মানুষকেই ভুগতে হবে। এই আমাদের ভবিতব্য!

ফিরে আসা

পাগলা দাশু

অক্টোবর ১৮, ২০১৪

(একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

মিনিট পঁচিশ আগেই সেজমামা ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিল যে হাসপাতালের কাজ মিটে গেছে। শনিবারের বিকেল বলে অনেকেরই ভয় ছিল হয়তো আজ কাউকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ভাগ্যের জোরেই হোক, কি মামার প্রশাসনিক মহলে বিস্তর চেনাজানার সুবাদেই হোক, ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে পোস্টমর্টেম করে মৃতদেহ রিলিজ করে দিয়েছে হাসপাতাল থেকে। ফোনে কথা শেষ করে ছোটমামা খবরটা জানাতে মাসিদের পাড়ার সুকান্ত বলে একটু সবজান্তা টাইপের ছেলেটা সেটাই বলেছিল, "লাকি-লি আজই হয়ে গেল সবকিছু। এখন বডি নিয়ে এলেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে।"

শুনে বেশ অদ্ভুত লেগেছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পরই যত নিকট আত্মীয়ই হোক না কেন, বাবা-মা-দাদা-বোন যেই হোক, সব সম্পর্ক মুছে দিয়ে নিজগুণে তারা 'বডি' হয়ে ওঠে। 'ছেলেটাকে কখন শ্মশানে নিয়ে যাবে' না বলে সবাই জিগ্যেস করে 'বডিটা কখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে'। কোনও কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী আবার একধাপ এগিয়ে বলেন, 'এইবেলা বেরিয়ে গেলে ভালো, জলদি মিটে যাবে ওদিকে'।

অবশ্যই! একজন যখন স্বার্থপরের মতন মারা যেতে পেরেছে, তার সবকিছু যত তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেওয়া যায় ততই তো ভালো। কিন্তু 'বডি'টার পোস্টমর্টেম আজ বিকেলেই হয়ে যাওয়াটা কতটা 'লাকি' সেটা তখন ঠিক বুঝতে পারিনি।

ইতিমধ্যে এপাশে ওপাশে চলা টুকরো-টাকরা আলোচনা আর মন্তব্য শুনে এতক্ষণে ছবিটা অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে। চাকুরীজীবী মানুষেরা কেউই রোববারের সকালটা শ্মশানে কাটাতে চাইবেন না। রোববারের সকাল মানে ধীরেসুস্থে আটটার দিকে ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে বাজারের থলি হাতে বেরনো। এই ভরা ইলিশের মরসুমে একটু তাড়াতাড়ি না পৌঁছলে ছেলের পছন্দের পেটে ডিমওয়ালা ইলিশের পিসগুলো পাওয়া যাবে না। সেখানে দিনটা যদি পাড়ার এক স্বল্পভাষী, অন্তর্মুখী, আত্মঘাতী ছেলের মৃতদেহ দাহ করতে চলে যায়, তাহলে পুরো সপ্তাহটাই হয়তো খারাপ যাবে। তাই আজই এইসব ঝামেলা মিটে যাওয়া ভালো।

আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না এরা কেন তাও ঘটা করে সমবেদনা জানাতে ছুটে আসে। কেউই এদের কখনও ডাকে না। অথচ বাসি ভাত ছড়ালে যেরকম একরাশ কাকের ভিড় হয়, ঠিক সেইভাবে পাড়ার কোনও বাড়ি থেকে মড়াকান্না ভেসে এলেই এরাও নিমেষে হাজির হয়ে যায়। আর অচিরেই শুরু হয়ে যায় বিনি পয়সার জ্ঞান বিতরণ।

চুপচাপ এককোণে বসে সকলকে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। দেখছিলাম মাসি, মা, মামি-রা, মৌ সবাই কিভাবে গলা মিলিয়ে কেঁদে চলেছে। মাসতুতো ভাইটাও ভেজা চোখে বসে মাসিকে সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কান্নাকাটি আমার কোনোকালেই খুব একটা আসে না। মনে হয় কেঁদে তো আর যে চলে গেছে তাকে ফেরত আনা যায় না। ওদের দেখে বোঝার চেষ্টা করছিলাম আজ আকাশের বদলে আমি মারা গেলে এরা একইরকম ভাবে কাঁদত কিনা। নাকি শুকনো মুখে সবাই শুধু বলত, 'কি যে হয়েছিল কে জানে! কিছুই বুঝতে দিল না আগে থেকে...'

এইসব সাতপাঁচ ভাবনার মধ্যেই বাইরে গাড়ির আওয়াজ পেলাম আর সেই শুভাকাঙ্ক্ষী সুকান্তর দল নিমেষে অত্যুদ্সাহে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'এই তো চলে এসেছে'। যেটা উহ্য রইল সেটা হলো 'যাক বাবা, এইবার পুড়িয়ে এলেই কাজ শেষ'। বেচারা আকাশ। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ার সময় বোধহয় ভাবতেও পারেনি মরে গিয়েও কারো কারো কাছে বোঝাই থেকে যাবে।

বাবা, কাকা, অন্য মামাতো-মাসতুতো দাদারা একে একে এগিয়ে গেল। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। এখন আবার একপ্রস্থ কান্নাকাটি হবে বুঝতে পারছি। তারপর আস্তে আস্তে ফুল চন্দনে আকাশকে সাজিয়ে সবাই পা বাড়াবে শ্মশানের দিকে। শেষ চিহ্নটুকুও মুছে দিতে। যতক্ষণ না সবাই রওনা দিচ্ছে আমার খুব একটা কিছু করার নেই। এই কান্নাকাটি শুনে আরো বিরক্তি চলে আসে, সবটাই কেমন যেন মেকি মনে হয়। কেউই তো কারো জন্য অপরিহার্য হয় না। সেই বড়কাকু যখন বিয়ের চারমাস পরে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল, কাকিমার কান্না দেখে মনে হয়েছিল সহমরণে যেতেও রাজি। তার এক বছর পর কালঅশৌচ চুকতে না চুকতেই তো দুই পরিবারের সম্মতিক্রমে আবার বিয়েও করে ফেলল। বা সেই সৌম্যর বাবার যখন হার্ট অ্যাটাক হল। সৌম্য তার পরের দুদিন কিছু খায়নি। আর শ্রাদ্ধের তিনদিন পর নিজে নিয়ে গেছিল আমাদের বিরিয়ানি খাওয়াতে। এমনকি পরদিকে ওকে দেখে তো আমার এরকম মনে হয়েছে যে বাবার মারা যাওয়াতে চাকরি-পেনশন-ইন্সিওরেন্স এসব থেকে যা টাকা পেয়েছে ও বোধহয় খুশিই হয়েছে তাতে। তাই এইসব কান্নাকাটি দেখে নিজের লোকেদের ওপর বিরক্তি জন্মানোর চেয়ে একটু বাইরে গিয়ে ফুসফুসে অত্যাচার চালানো ভালো। দু মাস হল সিগারেট টানা শুরু করেছি। বেশ সুন্দর সময় কেটে যায়।

খুব সাবধানে সবার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। কিন্তু বিধি বাম। মুখোমুখি পড়ে গেলাম সুমিবৌদির। আমার এক মামাতো দাদার বৌ। কোনো কারণে আমার খোঁজখবর রাখতে বেশ ভালোবাসে। অবশ্য অনেকেই আজকাল মাঝে মাঝে আমার খবর নেয়। মনে হয় একলা নিশ্চিন্তে জীবন কাটাই, সেটা কেউ খুব একটা পছন্দ করে না। তার ওপর আমার পেটপাতলা মায়ের কল্যাণে অনেকেই দু-তিন মাস আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটার কথা জানে। বলা বাহুল্য, তারপর থেকে কেউ কথা বলতে এলেই আমার রীতিমত অস্বস্তি হয়। তবু সামাজিকতা বলে একটা জিনিস হয়। তাই সুমিবৌদিকে দেখেও না দেখার ভান করে কেটে পড়তে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, "কখন এলে?"

"অনেকক্ষণ হয়েছে রে। খবরটা শুনেই তো চলে এলাম। তুই কখন এসেছিস? খেয়াল করিনি তো।" আমার সৌভাগ্য বলতে হবে। খেয়াল করলে এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হত না।

"আমি এই আধ ঘন্টা হলো এসেছি। ওই খবরটা যখন আসে, তখন তো বাবা অফিসে। তো বাবা ফিরল, তারপরই আমরা এলাম। যা রাস্তার হাল, এক ঘন্টার রাস্তা প্রায় দু ঘন্টা লেগে গেল।"

খানিকটা স্বভাববিরুদ্ধ ভাবেই একরাশ কথা বলে ফেললাম, এই আশায় যে এইবার টুক করে কেটে পড়তে পারব। তাই বৌদিকে আর কিছু না বলার সুযোগ দিয়ে বললাম, "আচ্ছা তুমি ভেতরে যাও, আমি একটু হেঁটে আসি।"

প্রত্যাশিত ভাবেই পরের প্রশ্নটা এল, "কোথায় যাবি?"

"এই বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না। আর বেরোতে বেরোতে আরো এক ঘন্টা বোধহয় লেগেই যাবে। তাই ভাবলাম একটু মোড় থেকে ঘুরে আসি।"

"চল আমিও যাব। আমারও এখানে এই এত কান্নাকাটি ভালো লাগছে না।"

প্রবল আপত্তি জানাতে গেলাম ঠিকই কিন্তু সুবিধে হলো না। বরাবরই দেখেছি আমার ভাগ্য আমাকে চিরকাল ধোঁকা দিয়ে এসেছে। তবে একটাই ভালো ব্যাপার হলো বৌদির সামনে ধোঁওয়া টানতে সমস্যা নেই। নিজেই বলল, "তুই স্মোক করা শুরু করেছিস জানি। এখন সে জন্যই যাচ্ছিস তাও বুঝেছি। সেটা নিয়ে ভাবিস না। বাধা দেব না।"

দু'জনে হাঁটা লাগালাম মোড়ের দোকানটার দিকে। আমার কাছে সিগারেট থাকে না। যখন ইচ্ছে হয় কিনে টানি।

"কি সাংঘাতিক ব্যাপার না!" বলল বৌদি। কি আর উত্তর দেব, চুপ করে হাঁটতে থাকলাম পাশাপাশি। সত্যি কথা বলতে, আমি আকাশকে খুব একটা দোষ দিইনি। মানসিক অশান্তি, সব মুহূর্তে জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা আর বাঁচার কোনো কারণ না থাকলে এটাই বোধহয় একমাত্র পন্থা। আর ছেলেটা বহুদিন ধরেই তো মানসিক রোগের শিকার। হয়তো আসলে বেঁচে গেল।

বৌদি আবার বলে উঠল, "মাসির কথাটা ভেবে কষ্ট হয়। কিভাবে কাটাবে যে এখন বাড়িতে!"

এইবার না বলে পারলাম না, "হুঁ, প্রথমদিকে নিশ্চয়ই খুব খারাপ থাকবে। তবে মানুষ তো অভ্যাসের দাস, আস্তে আস্তে সবই সয়ে যাবে।"

"তুই কি পাগল হয়েছিস! ওই দৃশ্য কোনোদিন মাসির চোখের সামনে থেকে মুছবে না। নিজের ছেলেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়তে দেখা কেউ কখনো ভুলতে পারে রে?"

দোকান থেকে সিগারেটটা কিনে ধরিয়ে একটা টান দিয়ে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “মানে?” আমি একেবারেই জানতাম না মাসির উপস্থিতিতে ঘটেছে ঘটনাটা। সেটা টের পেয়ে সুমিবৌদি ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল দুপুরের ঘটনাটা।

বেলা তখন দেড়টা হবে। মাসি রান্না করে খেতে ডাকে আকাশকে। খাওয়ার আগে ওষুধ খেতে হয় ছেলেটাকে, অনেক কটা। কিন্তু গতকাল থেকে নাকি একেবারেই ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। বলে নাকি, “আমি তো ঠিক হয়ে গেছি। কেন অসুস্থ বানাচ্ছ আমাকে?” তবু আজ দুপুরে মাসি জোর করে ওষুধ খাওয়ার জন্য। ব্যস, এক কথা-দু কোথায় শুরু হয় প্রচন্ড ঝগড়া। দুর্বল মাসিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় আকাশ। অসহায় মাসি জানালা দিয়ে দেখতে পায় যে ঘরে পড়ে থাকা দড়িটা নিয়ে ঝুলে পড়ল বাইশ বছরের ছেলেটা। প্রাণপণ চিৎকার করা সত্বেও পাড়া-প্রতিবেশী কেউ শুনতে পায়নি। কেউ এগিয়ে আসেনি ওই বিপদে। চোখের সামনে মাসি দেখে তার আদরের ভিতু অসুস্থ ছেলেটার দেহটা নিথর হয়ে গেল।

শুনে একটু শিউরে উঠলাম। সত্যিই ভয়াবহ ঘটনা। কিভাবে জানি না, জীবনে প্রথমবার মনে হলো, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তি বোধহয় আত্মজর মৃতদেহ চোখের সামনে দেখা। এটাও বুঝলাম সন্তানের মৃত্যু কেউই কোনোদিন ভুলতে পারে না, মাসিরও হয়তো বাকি জীবনটা এই দিনটার স্মৃতি নিয়েই কেটে যাবে।

পরিবেশটা একটু হালকা করতে বৌদি বলল, “ছাড় এসব, এখন আর এসব নিয়ে ভাবলে শুধু মনখারাপই হবে। তুই বল। কবে ফিরছিস আবার ও দেশে?” প্রশ্নটা এক লহমায় মনে করিয়ে দিল আমার আগামীকাল বিকেলেই ফ্লাইট। আবার ফিরে যেতে হবে সেই বিদেশ বিভুঁই-এ। ভেতরের বিরক্তি, হতাশা লুকোতে পারলাম না। শুকনো মুখে উত্তর দিলাম, “কাল বিকেলে বাগডোগরা থেকে ফ্লাইট।”

বৌদির নজর এড়ায়নি আমার চোখের হতাশ দৃষ্টিটা। সান্তনা দেওয়ার সুরে বলল, “চিন্তা করিস না। এই তো আর কটা দিন। দিব্যি কেটে যাবে দেখিস।”

সেই তো। আর কটা দিনই বটে! ‘মাত্র’ চার বছর আর। যাকগে, এদ্দিনে এসব কথায় হেসে ঘাড় নাড়তে শিখে গেছি। এখনো তাইই করলাম। বেকার কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ হয় না। তাই এই শুকনো হাসিই অনেক ভালো। কে যেন একটা বলেছিল না, পুরো জীবনটাই একটা প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চ। আজকাল প্রতি পদে সেটা মনে হয়।

সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। খেয়াল হতে আবার একটা টান দিয়ে পায়ের তলায় ফেলে পিষে দিলাম। এতক্ষণ চুপচাপ দেখছিল সুমিবৌদি। এবার বলল, “তুই চলে আসতে পারিস না এখানে?”

“মানে? কোথায় চলে আসব?” জিজ্ঞেস করলাম।

"ও দেশে আর পড়ে না থেকে এখানে। বলছি না এই শহরে বাড়িতে থাক। কিন্তু কলকাতা কি ব্যাঙ্গালোর কোথাও নিশ্চয়ই ভালো কিছু করতে পারবি।"

রাগ-দুঃখ-হতাশা একসাথে হলে কিরকম একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। আমারও সেটাই হলো। আজ অবধি জীবনে কোনো কিছু থেকে পিছু হটিনি। গত কয়েক মাস হলো বারবার ঘুরিয়েফিরিয়ে সবাই এটাই বলছে। তবে যতই খারাপ থাকি না কেন, ফেরত আমি আসব না এটা ঠিক করেই নিয়েছি। এক নিমেষে বললাম, "কিসব ফালতু কথা! আমি একদম খারাপ নেই ওখানে। অহেতুক ছেড়ে এখানে আসতে যাব কেন?"

"গাধা!" বকে উঠল বৌদি, "তোরা চিরকাল নিজের কথাই ভেবে যা! তোর জন্য ফিরে আসতে বলিনি। পিসির জন্য বলেছি।" পিসি মানে আমার মা। অবাক হয়ে জানতে চাইলাম কেন মায়ের জন্য আসতে বলছে।

"গত কয়েক মাস পিসি ঠিক করে ঘুমোতে পারেনি রে। আমরা যখনই তোদের বাড়িতে যেতাম শুধু কাঁদত। আর ঠাকুমাও প্রচণ্ড দুঃখ করত। মাঝে মাঝেই বলে উঠত, আর বোধহয় তোর সাথে দেখা হবে না। ছেলেমেয়েকে নিয়ে মানুষের কতটা চিন্তা হয় এখন বুঝবি না। আরো একটু বড় হ।" একটু থেমে বলল, "কিন্তু সিরিয়াসলি একবার ভেবে দেখিস, যদি সম্ভব হয় ফিরে আসিস। তোর মা-বাবা-ঠাকুমা অনেক ভালো থাকবে রে..."

বৌদি আরো অনেক কিছু বলত হয়তো। আর শুনতে ইচ্ছে করলো না। থামিয়ে দিয়ে বললাম, "চল ওখানে। ওরা বেরোবে বোধহয়।"

দু'জনে রওনা দিলাম মাসির বাড়ির দিকে। দূর থেকেই দেখতে পেলাম বাইরেই বাবা আর মা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে বাবা বলল, "কোথায় ছিলিস? বলে যাবি তো! আর বারবার ফোন করছি। সেটাও ধরিস না।"

মায়ের দিকে তাকালাম। এতক্ষণ কান্নার জন্য চোখ লাল হয়ে আছে। তবু চোখে একটা অনুক্ত চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। একটা অপরাধবোধ হলো। সত্যিই কখনো বুঝিনি এদের জীবন পুরোটাই আমাকে ঘিরে। আর বেশি না ভেবে বললাম, "বাবা, আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। এখানে আর থেকে কি হবে? ব্যাগটা বরং গুছিয়ে ফেলি গিয়ে। আমি বাসে চলে যাচ্ছি। তোমরা গাড়ি নিয়ে এস পরে।" বলে আর দাঁড়ালাম না। হতবাক বাবা-মাকে পেছনে রেখে পা চালালাম বাস-স্ট্যান্ডের দিকে।

পরের দেড় ঘন্টা মাথার ভেতর একরাশ চিন্তা, অনেক ঘটনা আর বৌদির কথাগুলো সমানে ঘুরপাক খেতে লাগলো। বড্ড স্বার্থপর আমরা সবাই। কখনো ভেবে দেখিনি যে আমি খারাপ থাকলে অন্য দু-তিনটে লোকের দিনও খারাপ যেতে পারে। কেমন যেন ঘোরের মধ্যে বাড়ি পৌঁছলাম। সোজা গিয়ে ঢুকলাম নিজের ঘরে।

ব্যাগের চেনটা খুলে কৌটোটা বের করে তাকিয়ে দেখলাম। চার ঘন্টা আগেও এই একইভাবে বসে ছিলাম। তখনই ফোনে খবরটা পেয়েছিলাম, 'আকাশ গলায় দড়ি দিয়েছে'। কৌটোটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে ছাদে উঠলাম। পরশুই

কিনেছি এটা। আগেরবার বারোটায় কাজ না দেওয়ায় এবার পঞ্চাশটা ট্যাবলেট-ওয়ালা এটা কিনেছিলাম। আকাশের খবরটা না এলে এখন আর একটাও পড়ে থাকত না। হয়তো আমিও আর থাকতাম না।

ছাদের রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দু মিনিট ভাবলাম। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সজোরে ছুঁড়ে দিলাম কৌটোটা। বাড়ির পেছনের মাঠের দিকে। অন্ধকারে। এক অজানা উদ্দেশ্যে। যাতে আর ফিরে না আসতে পারে ওটা।

পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে মাকে ফোন করলাম। "কি রে, পৌঁছে গেছিস?" পরিচিত গলাটা শুনে অনেকদিন পর মনটা আনন্দে ভরে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বললাম, "আমি ফিরে আসব।" হতবাক মা কি বলবে না বুঝে চুপ করে রইল। শুধু শুনতে পেলাম একটা দীর্ঘশ্বাস। ফোনটা হাতে নিয়ে স্ক্রিনে মায়ের ছবিটার দিকে চেয়ে নিজের মনে আবার বলে উঠলাম, "আমি ফিরে এসেছি মা।"

একটি চমৎকার ভ্রমণ কাহিনী

হস্তিমূর্খ

এপ্রিল ৫, ২০১৪

রাজামশাই একদিন নাসীরুদ্দিনকে ডেকে বললেন, 'বনে গিয়ে ভাল্লুক মেরে আনো।' ভাল্লুক শিকার চাট্টিখানি কথা নয়, নাসীরুদ্দিন ভয়ে তটস্থ, তবু রাজার আদেশ অমান্য করে কী করে? অগত্যা তাকে যেতেই হল। বন থেকে ফেরার পর একজন তাকে জিগ্যেস করল, 'কেমন হল শিকার, মোল্লা সাহেব?'

'চমৎকার', বললে নাসীরুদ্দিন।

'ক'টা ভাল্লুক মারলেন?'

'একটিও না।'

'বটে? ক'টাকে ধাওয়া করলেন?

'একটিও না।'

'সে কী! ক'টা দেখলেন?'

'একটিও না।'

'তাহলে চমৎকারটা হল কী করে?'

'ভাল্লুক শিকার করতে গিয়ে সে-জানোয়ারের দেখা না পাওয়ার চেয়ে চমৎকার আর কী হতে পারে?'

[*মোল্লা নাসীরুদ্দিনের গল্প – সত্যজিৎ রায়, সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত সেরা সন্দেশ ১৩৬৮-১৩৮৭, প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৮৮, চতুর্থ মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৯৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত*]

তীর্থস্থানে মানুষ আর প্রকৃতির কোলে নৈঃশব্দ্য, এই কাম্য। ফলে মাঝে মধ্যে পাণ্ডব-বর্জিত এলাকায় উইকএন্ড কাটানো আমার কাছে কোনও নতুন কিছু নয়। এমনকি আমার এইরকম বেশ কিছু গন্তব্য পরবর্তী সময়ে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এমন ঘটনাও ঘটেছে। আর এই সব জায়গা খুঁজে বের করার

পেছনে আমার অনুপ্রেরণা মুলত দুটি। এক – ওই সেই 'বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ ঘুরে' ইত্যাদি আর দ্বিতীয় – যথাসম্ভব কম রেস্ত খসিয়ে ঘুরে বেড়ানো। নানা ধরনের ম্যাগাজিনে এই জাতীয় কস্ট সেভিং বেড়ানোর জায়গার সুলুক সন্ধান করে সাফল্য পাওয়ার পরে এই ব্যাপারে রীতিমত কনফিডেন্ট আমি আবার একটা নতুন জায়গা খুঁজে পেলাম। নাম – বাঁকিপুট। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র উপকূলে নিরিবিলি নিশ্চিন্তে এবং অবশ্যই নির্জনে কয়েকটা দিন কাটানোর জন্যে, প্রাথমিক ভাবে সময় ঠিক করা হল গত ২০১৩ সালের দুর্গাপুজার একাদশীর সকাল থেকে লক্ষ্মীপূজার আগের দিন বিকেল পর্যন্ত।

এই ভ্রমণটা অন্য একদিক থেকেও আমার কাছে অভিনব ছিল। বাবা-মা'র সাথে, বন্ধুদের সাথে, বউয়ের সাথে, প্যাকেজ ট্যুরে অনেক রকম সঙ্গী এবং সঙ্গিনীর সাথে মায় বিলকুল একা একা ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা থাকলেও শ্বশুরবাড়ির কারও সাথে কখনও বেড়াতে যাইনি। এবারে সেই অভাব মেটানোর তাগিদে আমার শ্বশুরমশাই, শ্বশ্রূমাতা, শ্যালিকা এবং ভায়রা ভাইকে আমাদের তিনজনের দলে অন্তর্ভুক্ত করা হল। প্রথমেই থাকার একটা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হল কারণ একটা বৈ দুটো হোটেল নেই এবং আমার মতো মানসিকতার লোকজনও নেহাত বাড়ন্ত নয়। কাঙ্ক্ষিত সময়ে বুকিং পাওয়া গেল। এরপর অকুস্থলে পৌঁছনোর বন্দোবস্ত করার পর্ব। সঙ্গে শিশুপুত্র রয়েছে অতএব যাত্রাকাল যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখা দরকার। অতএব ট্রেন নির্বাচিত হল। দিঘাগামী যে কোনও ট্রেনে কাঁথি পৌঁছতে পারলেই হোটেল থেকে বাহন পাঠিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে অবশ্য তার জন্য কড়ি গুনে দিতে হবে। আমার দুইদিন টিকিট কাটতে যাওয়ার কোনও বাসনা ছিল না, ফলে ফেরার দিনের টিকিট দেওয়া যেদিন শুরু হল সেদিন টিকিট কাটতে গিয়ে আমার চক্ষু চড়কগাছ। যাওয়ার টিকিট ওয়েটিং দু'শোর ওপরে, তবে ফেরার টিকিট কনফার্ম। দু'দিকের টিকিটই কেটে নিলাম। বেরিয়ে এসে প্রথমে ফোন করলাম আমার এক বন্ধুকে যে সরকারি বাসের টিকিট ব্যবস্থা করে দিতে পারে। পরের দিন বাসের টিকিট হাতে পেলাম।

যেতে দিন কয়েক দেরি। দেখতে দেখতে ট্রেনে যাওয়ার টিকিট কনফার্ম হল। আমি কিছু গুনাগার দিয়ে বাসের টিকিটটা ক্যান্সেল করে দিলাম। পুজো এল। সপ্তমীর দিন আমার শ্যালিকা এবং ভায়রা ভাই দু'জনেই অফিস ম্যানেজ না করতে পেরে রণে ভঙ্গ দিল। হোটেলের রুম এক্সট্রা। হাত কামড়ানো ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না, কারণ ওটার টাকা ফেরত হবে না। কিন্তু পিকচার যে আভি ভি বাকি হ্যায় তা বুঝলাম দশমীর দিন সকালে। বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপ সঙ্গে আরও কি কি কে জানে, মুষলধারে বৃষ্টি, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, গুরুজনদের সতর্কবাণী সব মিলিয়ে আমাকে টলিয়ে দিল। বাঁকিপুটে ফোন করলাম। জানা গেল সফর বাতিল করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কফিনে শেষ পেরেক। তড়িঘড়ি ট্রেনের টিকিট ক্যান্সেল, যথারীতি পুনরায় গুণাগার। হোটেল জানালো বুকিং রিশিডিউল করা যাবে, অসংখ্য ধন্যবাদের সঙ্গে এও জানিয়ে দিলাম যে কিছুদিনের ভেতরেই পরিবর্তিত সূচি জানাচ্ছি।

এবার ঠিক হল খ্রিস্টমাসের ছুটি। দল থেকে যে দুজন আগেই বাদ হয়েছিল তারা পুনরায় দলভুক্ত হতে আর রাজি হল না। বাকি চারজনের জন্য নতুন ব্যবস্থাপনা। একদিন বাড়িয়ে নিলাম। টাকা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল। এবারে আর ট্রেনের টিকিট নিয়ে কোনও দুর্ঘটনা ঘটল না, যথাযথ পেয়ে গেলাম।

যাওয়ার আগে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়ালো। দুই দলত্যাগীর ভেতরে একজন দেশত্যাগী হল, অন্য আরেকজন আবার দলভুক্ত হল। নির্ধারিত দিনে কাঁথি স্টেশনে গাড়ি এসে আমাদের বাঁকিপুট পৌঁছে দিল। হোটেলে উষ্ণ অভ্যর্থনা, পৌঁছনোর সাথে সাথেই চা সঙ্গে কিছু স্ন্যাক্স চলে এল, স্নান করতে গরম জল লাগবে কিনা সব জেনে নিল। এছাড়া আমরাও জেনে নিলাম খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা আরও নানা হ্যানত্যান। মোটামুটি বেলা সাড়ে দশটা-এগারোটা। এবারে মূল বিষয়, যা দেখতে আসা। সেই সমুদ্রের দিকে নজর ফেরাতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। আদিগন্ত শুধু কাদামাখা বালি। সেই বালির ওপরেই কয়েকটা বড় বড় নৌকো পার্ক করা। আর মাঝে মাঝে এক-একটা ট্র্যাক্টর ওখানে যাচ্ছে এবং ফিরে আসছে। চেষ্টা করলাম নৌকোগুলির কাছাকাছি পৌঁছতে কিন্তু ওই বালি ডিঙিয়ে সে অসাধ্য সাধন আর হয়ে উঠল না। বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম সমুদ্রটা কোথায়।

- ওই তো।

- কই তো?

- ওওইই তো...

বহু কসরতের পর চোখে পড়ল একটা হালকা রূপালি রেখা। মনে হচ্ছে যেন ওখানে জল রয়েছে।

- আচ্ছা এদিকে জল আসবে না?

- এই সাড়ে বারোটার দিক করে এসে পড়বে।

সাড়ে বারোটা বাজল। একটা, দেড়টাও বাজল। জল যে এই রকম লেটে চলতে পারে তা প্রথম জানলাম। বাধ্য হয়ে রুমেই স্নান সেরে খাওয়াদাওয়া করে নিলাম। শেষ অবধি বেলা সাড়ে তিনটে–চারটে নাগাদ তিনি এলেন। গোড়ালি ডোবানো গেল। একটা আশা ছিল অন্তত এতটা জল নির্ঘাৎ হয় যার ফলে ওই নৌকোগুলি আসা যাওয়া করতে পারে। যাইহোক আমরা ওইটুকুই দর্শন পেলাম। বিকেল হল। চা এল। একটু পরে প্রকৃতির নিয়মে সন্ধ্যা নামল। গোটা হোটেলে পাঁচটি পূর্ণবয়স্ক মানুষ এবং একটি মাত্র নাবালক। স্ন্যাক্স এল। খেতে খেতে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল। যেহেতু সমুদ্র দেখতে এবং তাতে স্নান করতেই আসা, এবং এখানে তার আর কোনও সম্ভাবনা নেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে পরেরদিন একবার মন্দারমনি ঘুরে আসা যেতে পারে। অতএব আবার গাড়ি এবং পরেরদিন মন্দারমনি। খারাপ লাগল না। খারাপ লাগল না বলার কারণ যে এই জায়গাটিকেও জনমানবহীন দেখার অভিজ্ঞতা আমি আগেই অর্জন করেছিলাম।

মন্দারমনি থেকে ফিরে সন্ধ্যেবেলায় সূর্য ডুবে যাওয়ার বেশ খানিক পরে আমি এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম যাতে সাময়িক হলেও সমুদ্র না পাওয়ার বেদনা ভুলতে পারলাম। সূর্য পুরোপুরি ডুবে যেতেই নিষেধের সব বেড়া ভেঙে আমি সোজা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ঘোর অন্ধকার, পাশের মানুষটাকেও প্রায় চোখে পড়ে

না। আমার চোখ গেল আকাশের দিকে। এ কি! এ তো মনে হচ্ছে তারার ভারে ভেঙে পরার উপক্রম। সবাইকে বাইরে ডেকে নিয়ে এলাম। বললাম – পুরো টাকাটা জলে যায়নি। বাইরে এসে একবার দেখো। সেই অন্ধকার (এর আগে আমি এর চেয়েও বেশি অন্ধকার দেখেছি, সে গল্প পরে কোনোদিন হবে) কিন্তু রাতের প্রকৃতির এই রূপ আমি আগে কখনও দেখিনি। আওয়াজ পাচ্ছি দূরে সমুদ্রে পার্ক করা নৌকাগুলি এক এক করে ছেড়ে যাচ্ছে, অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, সাথে এই অন্ধকার। এই বিষয়টা শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সামনে মাথা কাটা যাওয়ার অবস্থা থেকে একেবারে শেষ মুহূর্তে কিছুটা হলেও আমার মান রক্ষা করল।

কিন্তু খুঁতখুঁতানি রয়েই গেল। বাঁকিপুটের আশেপাশে কিছু দেখার জায়গা আছে এটা ঘটনা, কিন্তু মেন কোর্সের যদি এই হাল হয় তবে সাইড ডিসের ওপর থেকে ভরসা এমনিই কমে যায়। তবু তৃতীয় দিনে আমরা সেইসব দর্শনীয় স্থান দেখতে বের হলাম। প্রথম গন্তব্য কপালকুণ্ডলার মন্দির। হতাশ। পরের গন্তব্য একটি লাইটহাউস। ওপরে উঠে যে কিছু দেখা যাবে না জানাই ছিল, এবং তাই। শেষ গন্তব্য ফিস হার্বার। এই জায়গাটা নিরাশ করল না। ভাল লাগল। কিন্তু এসবের পেছনে যতই কম খরচ করা হোক না কেন সেটাই বেশি বলে মনে হয়।

এই হতাশা আসতে পারে ধরে নিয়েই আমি নিজেকে একটু চাঙ্গা করার উদ্দেশ্য নিয়ে সকালে বেরিয়ে পড়েছিলাম সি বিচ ধরে হাঁটব এই উদ্দেশ্যে। দেখলাম জায়গায় জায়গায় সি বিচ লাল হয়ে রয়েছে। প্রথমটা বুঝতে পারলাম না। এগিয়ে যেতেই দেখলাম লাল রং গুলো কাছে গেলেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অগুন্তি লাল কাঁকড়াতে ভরে আছে জায়গাটা। কম্পন টের পেলেই গর্তে গিয়ে ঢুকছে, আর কমে এলেই আবার বেরিয়ে আসছে। এর আগে এইগুলো চোখে পড়েনি কারণ এদের রোদ পোহাবার সময়ে আমাদের এই জায়গাটায় আসার দরকার হয়নি। দেখলাম বালির ওপরেই মাঝে মাঝে পড়ে রয়েছে মানুষের শেষ যাত্রার আয়োজনের অবশেষ। আরও এগিয়ে গেলাম। আবার জ্ঞানলাভ। এবারে যা নজরে এল তাতে আমাকে বাকরুদ্ধ হতেই হল। সমুদ্র জুড়ে গরু চরছে। মোষকে দেখেছি গলা জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে। সময় সময় কুকুরকেও দেখেছি সাগরে নামতে কিন্তু গরু!!!! নাহ ব্যাপারটা সরেজমিনে দেখার জন্যে গরুমুখী হলাম। আসতে আসতে চোখের সামনে দেখতে পেলাম পরিচিত নীল রঙের বদলে পায়ের তলায় সবুজের সমারোহ। বিস্তীর্ণ বালিয়ারি জুড়ে ঘাস উঠেছে। আবার সোজা এগোতে এগোতে এতক্ষণে একটা কাজের জিনিস চোখে পড়ল। যে জিনিসটা আমি খুঁজে পেলাম সেটা হল শুঁটকি মাছের আড়ত। এই সব জায়গায় আড়তদারের সাথে ঠিকঠাক কথা বলতে পারলে তুলনাহীন সস্তা দামে মাছ কেনা যায়। আমি কিনলাম। পঞ্চাশ টাকা কিলো। তাও পাল্লায় মাপা নয়, হাতের আন্দাজে। এই বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা বলে কোনওভাবেই কোনও শখের খুচরো ক্রেতা ঠকবে না বরং লাভবান হবে। দামের দিক থেকে শুধু নয়, ওজনেও। সোজা নিয়ে গিয়ে হোটেলের কিচেনে গিয়ে বললাম ভাল করে প্যাক করে দিতে যাতে ট্রেনে যেন গন্ধ টের না পাওয়া যায়। সব ক্ষেত্রেই আমার এই অনুরোধ রক্ষিত হয়েছে, এখানেও হল। সন্ধ্যেবেলা আবার কাটল সেই অগুন্তি তারা দেখে।

সব কিছুরই ভাল-মন্দ দুই দিক থাকে। এখানেও ছিল। কিছু বলেছি। তবু যেটা না বললে অবিচার হয় তা হল খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত। অসাধারণ। ব্রেকফাস্টে লুচি তরকারি মিষ্টি দিয়ে শুরু হত, লাঞ্চে ভাতের সাথে স্যালাড,

ভাজা মুগ কিংবা মুসুর ডাল, নিরামিশ তরকারি, মাছ অথবা ডিমের তরকারি, সন্ধ্যে বেলায় বিভিন্ন পকোড়া সঙ্গে মুড়ি আর ডিনারে মাংসের ঝোল সাথে রুটি বা ভাত যা পছন্দ। আর চা? যতবার ভাল লাগে। সারাদিনটাই চলত মিল সিস্টেমে। সচরাচর বেড়াতে বেরিয়ে আমি ঘরোয়া খাবারের খোঁজে হন্যে হয়ে উঠি না কিন্তু পেলে বেশ ভালই লাগে।

যাই হোক, শুরুতে ফিরি একবার। সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে আকাশ দেখে এবং সস্তায় শুঁটকি মাছ কিনে মোহিত হতে হওয়ার পরেও যদি এই ভ্রমণ চমৎকার না হয় তাহলে ওই শব্দটাকেই অভিধান থেকেই তুলে দেওয়া উচিৎ!

রচনা যখন রম্য হল

শঙ্খ

ডিসেম্বর ১৬, ২০১৩

নদীর পাড়ে ফেউ ডেকেছে। বাঘ বাবাজি এলেন বলে। এসে বেশি কসরত করতে হবে না। তাঁর বিখ্যাত হালুম্বরাগিনীর গোটা দুই স্যাম্পল শোনালেই হল। নিমেষে সব ফরসা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঘেরও তো একটা মুড, অ-মুডের ব্যাপার আছে! “আয় আয়” বলে ডাকলুম আর ওমনি বাঘ বগল বাজিয়ে এসে ‘উপস্থিত’ বলে উবু হয়ে বসবে, সেটা আশা করা বাড়াবাড়ি।

সিধু গয়লা হাট থেকে জোড়া গরু কিনে এনেছে। তাদের আবার নাকি নাম গঙ্গা-যমুনা। দুধ যখন দেয় তখন যমুনা তো ডাহা ফেল, গঙ্গার জল হুগলীর পাড়ে এসে ড্রেনের আর নালার সুধার সাথে মিশে কিছু বেশি হলেও হতে পারে। ব্যোমকে যাবার কিছু নেই, লাইনটা আবার পড়ুন। আমি বলছি যে গরু দুটো এত বেশি নাকি দুধ দেয় যে গঙ্গা যমুনাতেও এত জল নেই।

অঙ্কুর চক্কোত্তি স্ত্রীকে ম্যারেজ আনিভারসারি উপলক্ষে মটরদানা সাইজের পেন্ডেন্ট গিফট করেছেন। সেই পেন্ডেন্টে নাকি আবার হীরা বসানো আছে। মার্কিন না খনিজ, তা জানা নেই। কিন্তু হীরে বসানো আছে প্ল্যাটিনামের গদিতে। পেন্ডেন্টের সাথে একটা টেলিস্কোপ কি মাইক্রোস্কোপ জাতীয় কিছু গিফট করাও দরকার ছিল, চক্কোত্তি মশাই বোধহয় তাড়াহুড়োতে ভুলে গেছেন। সবার মুখে ‘বাহ বাহ’। অন্তত চক্কোত্তির বিবাহিত কলিগদের স্ত্রীদের মুখে। পুরুষেরা অবশ্য মনে মনে ‘হায় হায়’ বলে প্রমাদ গুনছেন। অবিবাহিত কলিগেরা বিনিপয়সায় তামাসা দেখছে। ওই ‘ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে’ কেস আর কি।

অ্যাহন মোরাল ডা কি দাঁড়াইল কন দেহি?

ফেউ ডেকেছে নদীর পাড়ে। সিধু গয়লা একজোড়া গরু কিনেছে। আর চক্কোত্তি সাহেব স্ত্রীকে দামি উপহার দিয়েছে। তিন লাইনের গপ্পো। কিন্তু তিন লাইনে গপ্পো শেষ করে দিলে পূজাসংখ্যাও বেরোবে না, মাসিক কিস্তিতে ম্যাগাজিনেও ছাপা হবে না। লেখকের চলবে কি করে?

কাজেই ফ্যানাও। স্টেটমেন্ট দাও, তারপর নিজের, অন্যের কল্পনাকে অতিরঞ্জিত করে বা সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে খচাখচ কাগজ ভরিয়ে তোলো। এক সংলাপ একবার এর মুখে, একবার ওর মুখে, একবার তার মুখে, খবর দেওয়ার ছলে বসিয়ে বসিয়ে পাঁচশ বার বলে জলের মতো পরিস্কার করে বুঝিয়ে দাও। মাঝে মাঝে

ঘটনা আসতেই পারে। বদ-ওব্বেসের মতো ঘটনাগুলো কেমন যেন নিজে থেকেই ঘটে যায়। কিন্তু ওই, এক লাইনে যেন কিছুতেই শেষ না হয়।

সংসার সুখী হয় রমনীর গুণে। রচনা রম্য হয় পাঠকের মনে। মাঝে মাঝে হাস্যরস জরুরী। নইলে পাঠক আকৃষ্ট হয় না। কাজেই, ফেসবুক, ইন্টারনেট, হোয়াটসঅ্যাপ যেখানে যা খুচরো চুটকি পাও (স্বামী-স্ত্রী মার্কা হলে ভাল, তবে কোনও একদিকে বায়াসড হলে চলবে না, তাতে কোনো এক জাতের পাঠক ছিটকে যাওয়ার সম্ভাবনা), একটু রাম শ্যাম করে মাখন লাগিয়ে গপ্পের থীম অনুযায়ী চালিয়ে দাও। হইহই করে লেখা উতরে যাবে।

এই ফর্মুলার আবিষ্কর্তা আমি নই। পৃথিবীর প্রথম রম্য রচনার ফর্মুলা আবিষ্কার করেন নিউজ চ্যানেল আর কাগজের মালিকেরা। আমি তো নেহাতই ছাত্র, ডিপ্লোমা করার জন্য অ্যাপ্লাই করছি।

অপাঙতেয়

হযবরল

এপ্রিল ২০, ২০১৪

যেখানে কোনো দিক থেকেই সূর্যের আলো পৌঁছয় না, শহরের উন্নয়নমুখী প্রান্তে সেরকম এক বসতবাড়ির নাম sunny view apartment! তৈরী হওয়ার আগেই লাখ লাখ টাকায়ে বিকিয়েছিল এক একটি ফ্ল্যাট। দালাল বাহিনী তখন এই বলে ক্লায়েন্টদের ছোট্ট ছোট্ট খুপড়িগুলো গছিয়েছিল যে সারা দিনে কোনো না কোনো সময় আপনার সাধের ফ্ল্যাটে সূর্যের আলো ঠিক পৌছবে। বেডরুমে বা লিভিং রুমে না হলেও নিদেনপক্ষে কিচেন কিম্বা বাথরুমে তো বটেই। ওই এক চিলতে রোদ্দুরের আশায় অনীকও দুম করে একটা দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাট কিনে বসলো sunny view apartment-এ। থ্রি বিএইচকে ওই ফ্ল্যাটের ডাউন পেমেন্টটার জন্য অনীক অনেক কষ্টে তাদের শহরতলির পুরোনো দু কামরার পৈতৃক বাড়িটা বিক্রি করানোয় মা'কে রাজি করিয়েছিল। অনীকের বিধবা মা, মীরা দেবীর যদিও শেষ বয়সটা শহর থেকে দূরে থেকে স্বামীর ভিটেতেই কাটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এখান থেকে ছেলে ও বউয়ের কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতের অসুবিধা, গাড়ির তেল ও ড্রাইভার-এর খরচ, চিকিৎসার অসুবিধা ও একমাত্র নাতির কলেজের পর রাত করে টিউশন থেকে ক্লান্ত হয়ে ফেরা – এসব কথা ভেবেই তিনি ছেলের প্রস্তাবে শেষমেষ রাজি হয়ে যান। অনীকের ঘাড়ে অন্যান্য খরচের ভার থাকার দরুন বেশিরভাগ লোনটা অনীকের স্ত্রী মিতাই নিয়েছিল। শুরুতে ঘরগুলোতে এক চিলতে রোদ্দুর এদিক সেদিক থেকে ফাঁক গলে এসে পড়ত বটে কিন্তু পরের দিকে আশেপাশে আরো বড় বড় সব মল ও অফিস স্পেস তৈরী হওয়াতে সেটুকুও কিরকম যেন কপ্পুরের মতন আলতো ভাবে উবে গেল।

লাগোয়া বাথরুম সহ সব থেকে বড় মাস্টার বেডরুমটা অনীক ও মিতার, আপেক্ষিক ভাবে আধুনিক আসবাবে সজ্জিত হলো। মাঝারিটি অনীকের পুত্র বুম্বার, যেটার সাথে আবার একটা ছোটো ব্যালকনি আছে। নানাবিধ পোস্টার ও বই-এ ভরা সেই ঘরটি যেন তার ব্যক্তিগত মুক্তাঞ্চল! তার কাছের বন্ধুবান্ধব ছাড়া বাকিদের সেখানে 'নো এন্ট্রি'। স্বাভাবিক ভাবেই তিনটি বেডরুমের সব থেকে ছোটটিতে ঠাই হলো মীরা দেবীর। এক কোণে customized ঠাকুরের সিংহাসন আর একটা সিঙ্গেল খাটটা বাদ দিলে বাকি জায়গাটা ট্রাঙ্ক, প্যাকিং বাক্স, পুরোনো খবর কাগজ, নাতির বইখাতা দিয়ে অগোছালো ভাবে ঠাসা। প্রথম প্রথম তবু মীরা দেবী বিকেলবেলা ছাদে গিয়ে কাপড় তুলে আনতেন, সন্ধেবেলা ধুপধুনো দিয়ে বাইরের ঘরে বসতেন, চা খেতেন, আত্মীয়স্বজনদের ফোন করতেন। টিভি-তে সিরিয়াল দেখা পছন্দ না করলেও খবরটা নিয়মিত শুনতেন। কিন্তু হাঁটুর ব্যথাটা এখানে আসার মাস ছয়েকের মধ্যে এতটাই বেড়ে যায় যে ডাক্তার পারতপক্ষে বিছানা ছেড়ে উঠতে নিষেধ করেন। অনীক ও মিতা অফিস বেরিয়ে গেলে সারাদিন দেখাশোনার করার জন্য একটি মেয়েকে রাখা হলো। সে-ই মীরা দেবীকে স্নান খাওয়া কিম্বা ঠাকুরকে জল বাতাসা দিতে সাহায্য করে। ছানির জন্য চোখের অবস্থা অনেকদিন ধরেই খারাপ তাই

সেরকম ভাবে পড়াশোনাও করতে পারেন না। আর সত্যি বলতে কেন জানি আজকালকার লেখার ধরনও তাঁর খুব একটা পছন্দ হয় না। মাঝে মাঝে পরিচারিকা মেয়েটির সাথে এটা সেটা নিয়ে কথা বলেন, তবে সেও আর কতক্ষণ? মেয়েটি সুযোগ পেলেই টিভি খুলে বসে যায় বা মোবাইল ফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাতে অবশ্য মীরা দেবী রাগ করেন না, তাঁরই এই বয়সে আটকে থেকে এক ঘেয়ে লাগে, এই বাচ্চা মেয়েটির তো দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা! অসূর্যম্পশ্যা এই কারাবাসে তার রোজকার দিননামচা বলতে এই! কয়েক মাস আরো কাটলো এভাবে। কিন্তু চোখ আর হাঁটুর অবস্থা ক্রমশ আরো খারাপের দিকে গেল। পরপর ছানি ও হাঁটুর অপারেশন হওয়ার পরে তাঁর গন্ডি অবশেষে ওই ছোট্ট ঘরের খাটটা অব্দি সীমিত হয়ে গেলো। দিনে পরিচারিকার হাত ধরে এক বার বাথরুম, স্নান, আধা শুয়ে ঠাকুরের উদ্দ্যেশ্যে কোনরকমে দুটো মন্ত্র বলা ও চামচে গোনা ডাল ভাতের স্বল্পাহার। রাতে ছেলে বা বৌ এর নিয়মিত অসুধ খাওয়া নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও সবশেষে রাতে দুটি দুধ খই! অবশ্য নাতি এসে মাঝে মাঝে মজার মজার সব গল্প করে। যখন মোবাইল ফোনে নানা রকম ছবি কিম্বা ভিডিও দেখায়, তখন বেশ লাগে মীরা দেবীর। পরীক্ষার পর বুম্বার ছুটি ছিল কয়েকদিন। বন্ধুবান্ধবরা আসতো গান বাজিয়ে হই হুল্লোড় করতো ও ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে মীরা দেবীর সাথে কিছুক্ষণ গল্প করে যেত। কোনদিন হয়ত বুম্বার ক্লাসমেট মোনালি আদিখ্যেতা করে তাকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেয়ে বলল "ঠাম্মি , ইউ আর সো gorgeous, কি নরম গাল তোমার!" আবার কোনদিন হয়ত পাবলো গিটার বাজিয়ে 'যদি তোর সাথে কেউ না আসে' শুনিয়ে গেলো। তবে যে ঘটনাটা তাঁর জীবনে নতুন করে আবার এক চিলতে রোদ্দুর ও বাতাস নিয়ে এলো তার জন্য বুম্বার ফটোগ্রাফার বন্ধু আর্জবই দায়ী। সে একটা ম্যাগাজিনে urban old faces নামে একটা ফীচারের কাজ পায় ও জিনিসে ঠাসা ঘরে, খাটে বসা বুম্বার ঠাম্মির ছবি দিয়ে কভার করবে ঠিক করে। মীরা দেবীর খাটের পাশের জানলাটা শুরুর থেকেই বন্ধ ছিল। জানলার ধার ঘেসে transistor, ওষুধ পত্র, থার্মোমিটার, মুড়ির কৌটো ইত্যাদি রাখা থাকত। আর্জব শুট করতে এসে সেই সব জিনিস বিছানায়ে নানা অ্যাঙ্গেলে ছড়িয়ে দিল। ন্যাচারাল আলোর জন্য জানলা খুলতেই হবে তাই বুম্বার সাথে হাত লাগিয়ে সেটা খুলতে গিয়ে খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করতে করতে আর্জব বলল, "কিরে তুই খালি ল্যাপটপেই windows খুলিস নাকি? এই উইণ্ডোটা তো জম্মে খোলা হয়নি দেখছি!" বিভিন্ন মুডের ফটো উঠলো, ঠাম্মির সাথে আড্ডা হলো, চা মুড়িমাখা খাওয়া হলো। সব কিছু আগের মতন গোছগাছ করে রাখা হলো শুধু জানলাটা খোলাই রেখে দিলেন মীরা দেবী।

সকালে উঠে জানলার পর্দা সরাতেই উনি দেখলেন ঠিক উল্টো দিকে ফ্ল্যাটটার ব্যালকনি দেখা যাচ্ছে । তাতে এক বৃদ্ধ ইজিচেয়ারে বসে কাগজ পড়ছেন ও একটি ছোট্ট ফুটফুটে শিশু তার চারপাশে খেলে বেড়াচ্ছে। খাওয়াবার উদ্দেশ্যে একজন মহিলা হাতে বাটি নিয়ে মেয়েটির পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশ লাগলো মীরা দেবীর, ঠিক যেন বয়সের ভারে স্থবির হয়ে যাওয়া পৃথিবীর চারদিকে ছটফটে চাঁদ ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তিনি নিজে অন্য এক গ্রহ থেকে তা ঝাপসা ভাবে দেখতে পাচ্ছেন। হোক না ঝাপসা, কাউকে না জানিয়েই মীরা দেবী দিনের পর দিন ওই বারান্দার দিকে দেখতে লাগলেন। নেশার মত নিয়মিত দেখেন আর কল্পনা করেন – ভদ্রলোকের বুঝি স্ত্রী গত হয়েছেন! আচ্ছা ওনারও কি arthritis আছে? ওই শিশু কি ভদ্রলোকের নাতি না নাতনি? কোনো দিন বকা খেয়ে শিশুটি কেঁদে উঠলে ভারী মন খারাপ হয় মীরা দেবীর। আবার দাদুর সাথে যখন সে খেলে তখন মীরা দেবীর মন

আনন্দে ভরে যায়, মনে হয় ইসস আরো কয়েকটা দিন আগে জানলাটা খুললেই হত। চরম জীবনবিমুখী অবস্থায় বাঁচার রসদ আমরা ঠিক আশেপাশের থেকে জুটিয়ে নি। মীরা দেবী এখন সুযোগ পেলেই তার পরিচারিকাকেও 'বৃদ্ধ ও শিশুর' হালনাগাদী গল্প বলতে শুরু করেন। কিছুটা দৃষ্টি ও সিংহভাগ কল্পনার ওপর নির্ভর করেই সেই গল্পগুলোতে নতুন করে প্রাণ খুঁজে পান মীরা দেবী। অফুরন্ত জীবনের রসদ আমরা জুটিয়ে নিলেও তার মেয়াদ তো অফুরন্ত হয় না! তাই একদিন সকালে জানলা খুলে তিনি দেখলেন যে বারান্দায় লোকজন ভর্তি, সবাই নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। একটু মাথা তুলে নিচে রাস্তার দিকে তাকাতেই মর্চুয়ারী ভ্যানের কাঁচের ভেতরে রজনীগন্ধায় ঢাকা বৃদ্ধের অস্পষ্ট দেহখানি দেখা গেলো। মীরা দেবী দেখলেন শিশুটি কার একটা কোলে ঘোরাফেরা করছে অথচ হয়তো বুঝতেই পারছেনা যে বারান্দায় আর কেউ কাল থেকে তার সাথে খেলবে না। পরিচারিকা মেয়েটিকে ডেকে জানলা বন্ধ করে দিতে বললেন তিনি, যেন সেটা কোনদিন খোলাই হয়নি!

জীবন কিছু নিছক মায়ার রকমারি প্রতিফলন যা ধীরে ধীরে আমাদের অভ্যেস হয়ে দাড়ায়। মীরা দেবীও সেই অভ্যেসবশতই জানলাটা মাস খানেক বাদে আবার খোলালেন। পর্দা সরাতে ফাঁকা ইজিচেয়ার ও দড়িতে টাঙানো গামছা ছাড়া আর কিছু দেখা গেলনা। একবার বাচ্চাটাকে দেখলেও মন ভালো হতো। পরিচারিকা তার মনের কথা বুঝতে পেরে বলল "সে বাচ্চাটাকে কি করে দেখবে? আমি আসার সময় দেখলাম সে ইস্কুল গাড়ি চেপে চলে যাচ্ছে... জানলাটা বন্ধ করে দি?" চোখ বন্ধ করে মীরা দেবী হাত নেড়ে মানা করে দিলেন। হয়ত খুব শীঘ্রই কোনো ভিনদেশী গাড়ি এসে তাঁকেও এই জানলা দিয়ে বের করে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে!

পকেটমারের পাল্লায়

অতনু

জানুয়ারী ৩, ২০১৪

পকেটমারদের যে আমি খুব পেয়ার করি এমনটা নয়। কিন্তু ব্যাপার হল ইস্কুলের মাস্টারমশাই থেকে হবু অর্ধাঙ্গিনী সবারই মত আমি নাকি মারাত্মক রকমের অন্যমনস্ক আর ভুলো। তারা খুব ভুল কিছু বলে এমন দাবী আবার আমি জোরগলায় করতে পারিনা। ফলতঃ পকেটমাররা যে আমাকে বেজায় পছন্দ করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আর ট্রেনে বাসে নিত্য যাতায়াত করলে, তাদের সঙ্গে মোলাকাৎ না করে উপায় কি! প্রথম তাদের পাল্লায় পড়ি বাইপাসের ওপর ভূতল পরিবহনের ন্যানোবাসে। সেই প্রথম বাড়ি ছেড়ে হোস্টেলে থাকতে এসেছি। দাদা একটা নোকিয়া ১১০০ ফোন কিনে দিয়েছিল, সঙ্গে একটা ক্লিপফিতে। “এটা দিয়ে মোবাইলটাকে জামার সঙ্গে আটকে রাখলে আর চিন্তা নেই।” চিন্তা যে পকেটমারদেরও নেই তা বুঝলাম যখন দেখলাম বুকপকেট থেকে ফোনবাবাজি ফিতেশুদ্ধু নিরুদ্দেশ হয়েছেন। এপর্যন্ত আমি যা খুইয়েছি তার মধ্যে আছে দুটো মোবাইল, দুটো মানিব্যাগ, একটা পেনড্রাইভ, আর হ্যাঁ, একটা ল্যাপটপ। শেষোক্তটাকে অবশ্য পকেটমারি বলা যায়না। কিন্তু কি যে বলা যায় তা আজও রহস্য। ওটার কথায় পরে আসছি। তবে এটা ঠিক যে এখন আমি অনেক সতর্ক, বাসে যত ভিড়ই থাকুক না কেন, রডটা ধরি একহাত দিয়েই, আর একটা হাত রাখি পকেটের কাছে, যেখানে মোবাইল, মানিব্যাগ ইত্যাদি থাকে। বলতে নেই, বছরদুয়েকের মধ্যে পকেটমাররা আমার কাছে নিরাশই হয়েছে।

মোবাইল প্যান্টের পকেটে রাখতে শুরু করি অবশ্য প্রথম ফোনচুরির পর থেকেই। তবে তাতেও যে সবসময় পকেটমারদের টেক্কা দেওয়া যাবে এমন নয়। আমার দ্বিতীয় মোবাইলটা তো গেছিল প্যান্টের পকেট থেকেই। এল-২৩৮ বাসটা দৈত্যকুলে প্রহ্লাদবিশেষ, মানে প্রাইভেট বাস হয়েও জনগণের দাবিতে যেখানে সেখানে দাঁড়ায়না, ফলে ভিড়ও হয় তেমনি আর কে না জানে ভিড় মানেই পকেটমারদের পোয়াবারো। এমন কি ওরা কাজের সুবিধার্থে ইচ্ছাকৃতভাবে ভিড় তৈরী করে এমন একটা কথাও শোনা যায়। তাই পকেটমারদের দাপটের জন্যও এল-২৩৮ এর খ্যাতি আছে। সেদিন কোনরকমে পা-দানি থেকে উঠে দরজায় দাঁড়িয়েছি, এমন সময় সিটের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একজন টাকমাথা বেঁটেখাটো নিরীহ ভদ্রলোক বললেন, “আপনি এখানে দাঁড়িয়ে যান, আমি নেমে যাই।” তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে গেলাম আর তিনি ভিড়ের জন্যই হয়ত বা অনেকক্ষণ ধরে আমার গা ঘেঁষে বেরোলেন। উল্টোডাঙা আসতেই বাস হালকা, আমার পকেটও। আমার বন্ধু মৈনাকেরও একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। উল্টোডাঙায় পকেটে হাত দিয়ে হাহাকার করে উঠতে কন্ডাকটার রাস্তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, “আগে বলবেন তো, ঐ দেখুন চলে যাচ্ছে ...” তখন আর কে কাকে দেখে! মৈনাক তো হাঁ, “আপনি জানতেন বাসে পকেটমার আছে?” কন্ডাক্টারের উত্তর, “জলে নেমে কি কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে দাদা!” কন্ডাক্টাররা সাধারণত

পকেটমারদের চেনে, এবং তাদের দেখলে নানারকম ইঙ্গিত দিয়ে যাত্রীদের সাবধান করার চেষ্টা করে থাকে, কিন্তু কখনোই তাদের ধরিয়ে দেয় না।

বুঝতেই পারছেন আমি দেখে শেখার চেয়ে ঠেকে শেখাতেই বেশী আগ্রহী। তাই মানিব্যাগটাও রাখতাম প্যান্টের পেছনের পকেটে, যতদিন না ট্রেনে এক পকেটমার বাবাজি আমায় উচিৎ শিক্ষা দিলেন। তিনি যে কখন তাঁর কাজ করেছেন টের পাইনি, হুঁশ ফিরল যখন সামনে থেকে চিৎকার শুনলাম, "এখানে কার মানিব্যাগ? অতনু কুমার কার নাম?" বাবাজি ভদ্রলোক, টাকাপয়সা বের করে নিয়ে মাদুলি আর এটিএম কার্ডসমেত মানিব্যাগটা ট্রেনের দরজার মুখেই রেখে গেছিলেন। আরেকবার মানিব্যাগ খুইয়েও উদ্ধার করেছিলাম। সেটা ছিল চুঁচুড়া-শ্রীরামপুর রুটের ২নং বাসে। বসেছিলাম একবারে পিছনে। বিহারি মহিলাদের ক্যাচোড় ম্যাচোড় ঠেলে কোনরকমে বের হয়ে নামতে যাব, তখুনি খেয়াল করলাম পকেটে মানিব্যাগ নেই। সঙ্গে সঙ্গে ইউ টার্ন হয়ে বীরদর্পে পিছনদিকে এগিয়ে গেলাম, "আমার পার্স কই? পার্স কোথায় গেল?" একজন ভেটকি মাছের মত মুখ করে বলল, "এই তো তলায় পড়ে আছে"। তার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে মানিব্যাগ উদ্ধার করে বাস থেকে নামলাম।

কলেজে পড়ার সময় অভিযান পত্রিকায় এক পকেটমারকে নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলাম। তখন অবশ্য ডেইলি প্যাসেঞ্জার ছিলাম না, তাই তাদের সঙ্গে সরারসরি মোলাকাৎ হয়নি। জানিনা সেই অতিক্ষুদ্র লিটল ম্যাগাজিনটা কোনো আসল পকেটমারের চোখে পড়েছিল কি না আর তার জন্যেই আমার ওপর এত ভালবাসা কি না!

শেষ গপ্পোটা অবশ্যই ল্যাপটপের। সেদিন একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। ৮টা ৪৭এর বর্ধমান লোকালে ফিরছি। বসার জায়গা পাইনি তাই ল্যাপটপের ব্যাগটা বাঙ্কারে তুলে দিলাম। কয়েকটা স্টেশন পার হল, গাড়ী ফাঁকা হল আর বাঙ্কারের দিকে তাকিয়ে দেখি পাখি ফুড়ুৎ। ঐ ব্যাগে ল্যাপটপ ছাড়াও ছিল এটিএম সমেত পার্স, পেনড্রাইভ, পেন, খাতা আর ছাতা। ব্যান্ডেল জিআরপিতে গিয়ে নালিশ করতে ওসি বললেন, "এত কিছু হারালেন আর মোবাইলটা রেখে দিলেন! মোবাইলটা হারালে বরং আমাদের ট্র্যাক করতে সুবিধে হত।" কেন যে মোবাইলটা চোরের হাতে তুলে দিলাম না সে নিয়ে আফশোস করতে করতেই দু দিন বাদে উত্তরটা পেয়ে গেলাম। আগের পেনড্রাইভটা হারানোর পর এটার খাপের ওপর আমার ফোন নাম্বারটা লিখে রেখেছিলাম। তার সূত্র ধরেই হারানো মাণিকের খোঁজ পেলাম। বর্ধমান থেকে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক জানালেন তাঁর প্রতিবেশী একটি ছেলে ট্রেনে ব্যাগটা "কুড়িয়ে পেয়েছিল"। ব্যাগে যা টাকা ছিল তাই দিয়ে স্টেশনে বসে মিষ্টি খাওয়ার পর সেটাকে বাড়িতে নিয়ে আসে, কিন্তু ব্যাগের ভেতরে বোম থাকতে পারে সন্দেহে বাড়ির লোক ওটাকে ঘরে ঢোকাতে দেয়নি। শেষে বোমাতঙ্ক দূর হলে ব্যাগ রহস্য ভেদ করা হয়। তারা নাকি মালটা বেচে দেওয়ারই তাল করছিল, ঐ পাঞ্জাবী ভদ্রলোকই বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করিয়েছেন। এরপর বর্ধমান গিয়ে ল্যাপটপ উদ্ধার তো নেহাতই সময়ের ব্যাপার। অভিরূপ আর অনির্বাণ বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে রইল, আমি চোরমহল্লায় ঘেরাও হয়ে পড়লে উদ্ধার করার জন্য। আর কোন বিপত্তি হয়নি অবশ্য। খালি পিন্টুর (যে ল্যাপটপটা পেয়েছিল) মা যখন বলল, "আপনার বিবি তো বহুৎ খুবসুরৎ", এমন চমকে উঠলাম যে হাতের কাপ থেকে খানিকটা চা চলকে পড়ল! আমার বিবি আছে আমি নিজেই জানিনা, তো এরা

কোত্থেকে জানল! "বিয়ের ছবি দেখলাম তো!", হাঁফ ছাড়লাম "ওহ তাই বলুন, ওটা আমার এক বান্ধবীর বিয়ের ছবি।"

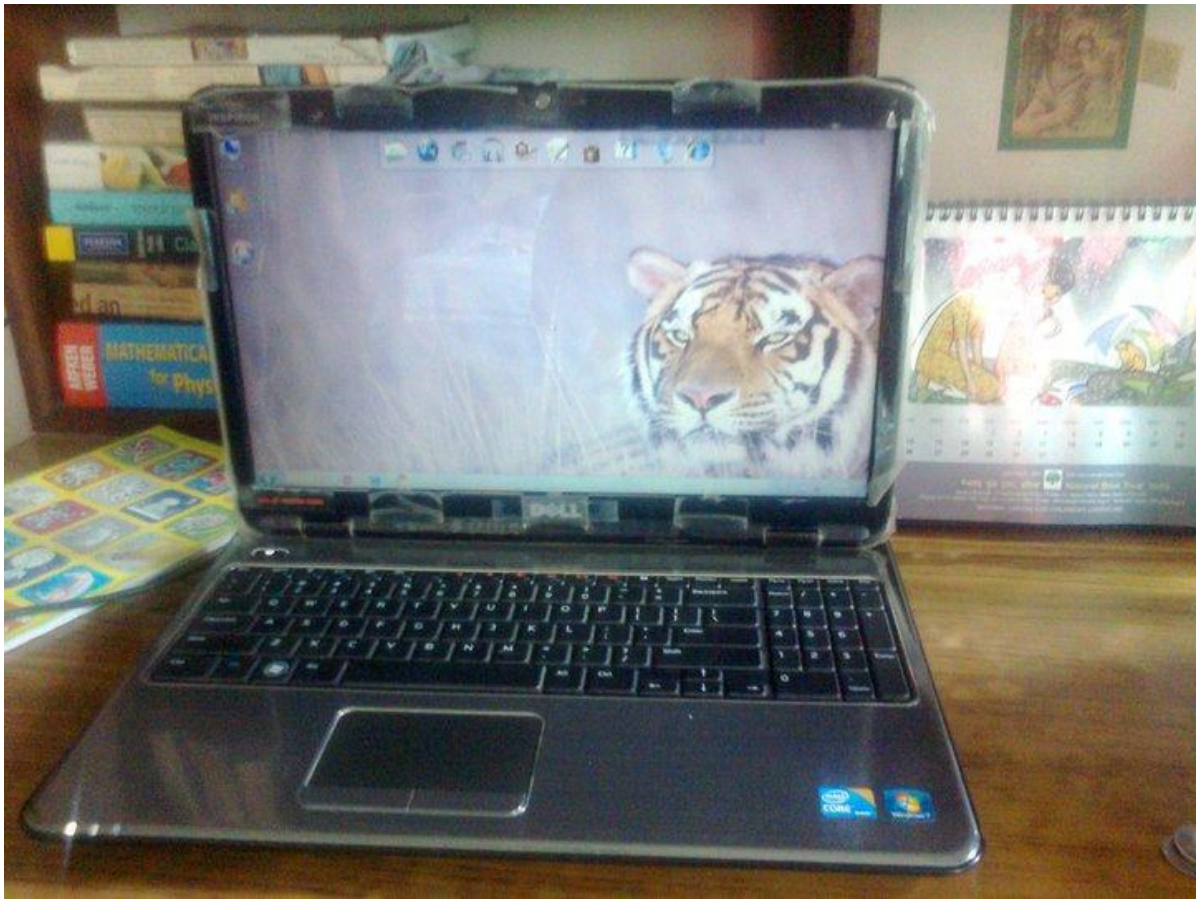

গপ্পোটা এখানেই শেষ নয়। বাড়ি ফিরে ল্যাপটপ চালু করতেই চমকে চ! আমার আগের ওয়ালপেপারটার জায়গায় চমৎকার একটা বাঘের ছবি। উইন্ডোস এক্সপ্লোরারটা খুলতে তো ভিরমি খাবার জোগাড়। এসে গেছে দুটো হিন্দি সিনেমা, "দিল্লী বেল্লী" আর "মার্ডার ২" আর বেশ কয়েকটা গেম!

ছুটকথা

নবকলম

এপ্রিল ১, ২০১৪

(১)

অজন্তা, প্রথমে আমার সহপাঠিনী ছিল;
পরে বাঘ – সিংহ পুষে জনপ্রিয় সার্কাস হল ।
তখনো দেখতে যেতাম,
দেখতে পেতাম ও, তবে দূর থেকে ।

(২)

অবনী বাড়ি আছ নাকি? নেই নাকি ...
অবনী?
বৌদি, আছেন নাকি?
বৌদি! কতদিন – কত অপেক্ষার পরে দেখা হল।
আচ্ছা অবনী নেই তো?
যাক আমি-আপনি, আপনি এবং আমি
এই-ই ভালো।

(৩)

তুমি কাছে রয়ে গেলে সন্তানের
নাম হবে 'মধ্যিখান',
আর দূরে যাও যদি
তবে 'ব্যবধান'।
এখনো বিশ্বাস, সে জন্ম নেবেই।

(৪)

ফক্সের খুব কাছাকাছি এসে
কানে কানে বলে ভিক্সেন -
রাতে ধরা শুধু হাঁস ও মুরগী;
আমারে ধরা কি শিখসেন?

নিরুপায় মুখে বলে চলে ফক্স -
"সাধে ছোটা হাঁস পিছে?
তুমি আমি হলে বুঝিতে গিন্নি
- পেটে খেলে সয় নীচে!"

(৫)

রোহিণী কে নিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেস রওনা হতেই
রোহিণী নক্ষত্র হল,
এবং তুমি থেকে আপনি।
যে আমি নক্ষত্র ছিলাম এতদিন,
পৃথিবী হলাম এক নিমেষে।
বিস্ময়, দূরত্ব, মুগ্ধতা -
একে একে দীর্ঘজীবী হলো।

আধা গপ্পো, ফাঁদা গপ্পো

স্পন্দন চকোত্তি

জুন ২৮, ২০১৪

এই তো সেদিন একটু বেলার দিকে ডিমের ঝোল দিয়ে মেখে দুটো ভাত নাকে-মুখে গুঁজে দিয়ে বাসে উঠে পড়েছিলাম । এবারে ক'দিন যা পেল্লাই গরম পড়েছিল তাতে বাঁধা মাইনের দশটা–পাঁচটার চাকরিতে বেরোবার কথাতেই কোমরের নীচের অংশ অবশ হয়ে আসে [মাপ করবেন, স্লাইট ভুল বলেছি – এ ঘোর কলিকালে ভর দুপুরেও পুরুষপুঙ্গবের 'হাতের পাঁচ' দুর্মূল্য 'অঙ্কুশ'টি চির অক্লান্তই। উক্তির সপক্ষে প্রমাণ চাইছেন যখন বলি – এই দেখুন অতীতে 'হাতি' (মতান্তরে বিপুলাকায় হস্তিনী) ডমিনেটেড উত্তরপ্রদেশে তো আজকাল দিন-দহারে সাদরে লালিত বলিষ্ঠ 'অঙ্কুশ'ই খোঁচাচ্ছে, আর এই 'নিউ ওয়েভের' যুগে শ্যাম বেনেগল সাহেব মাথা চাপড়ে অল্প হলেও চোখের জল ফেলছেন নীরবে। সে যাই হোক, ওই মানে 'ওটা' বাদ দিয়ে বাকী অংশের জন্য 'অবশ' কথাটি খাটে।]; আর আমার তো লোকের ম্যানুস্ক্রিপটের প্রুফ রিড করে পেট চালানোর ঠেক–গোঁজ ব্যবস্থা মাত্র। এসব ছেঁদো অভিযোগ করে তো আর লাভ নেই! বাঁচতে গেলে উঠতে যখন হবেই, উঠে পড়লাম বাসে। উঠেই চলে গেলাম লাস্ট সিটের দিকে।

সযত্নে পেছন বাঁচিয়ে চলতে চাওয়া মোমের দেশের 'মোমের পুতুল' মডার্ন বাঙালি ভদ্দরসমাজ বেটার অপশন পেলে বাসের লাস্ট সিটে এমনিতেই বড় একটা বসে না (বিশেষজ্ঞরা যদিও বলে থাকেন যে মোম ব্যবহার করে ফেললে আর ততোটা কষ্ট হয় না); আর এই জীবনরস চুষে নেওয়া বেয়াড়া দুপুরে তো আরওই নয়। অতএব ফাঁকা ইনটেরিয়রে জুত করে জাঁকিয়ে বসলাম। সিট আর পেটের মাঝখানে সেট করে দিলাম – কয়েকতাড়া কাগজ, খান-দুয়েক 'কালি ফুরোলে ছুঁড়ে ফেলুন' পেন, জলের বোতল আর ছাতা দিয়ে ঠাঁসা এবং সেলাই দ্বারা পুনরুজ্জীবিত বেগুনী রঙের পেটমোটা ব্যাগটাকে। এই ব্যাগটা আমার বড় কাছের এক পুরনো বন্ধু, ভীষণ লাকি'ও বটে। পণ্ডিতেরা বলে থাকেন – 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'। আমি মজা করে বলি, আমার ক্ষেত্রে – 'বেগুনী ব্যাগেতে লক্ষ্মী'। ফেটেফুটে যাওয়া ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে যতবারই কাজে বেরিয়েছি, কোনও না কোনও ভাবে ঠিক কাজ উদ্ধার হয়ে গেছে। ছোট–সেজো–মেজো ডিল হবার পর হিন্দী সিনেমার মতো ব্যাগ ভর্তি করে টাকা না আসুক, পেট ভরানোর মতো টাকা জুটেই গেছে। আমার ফুটো কপালকে ঝড়ঝাপটা থেকে গার্ড করতে গিয়ে ব্যাগটার এখানে-সেখানে খোসটা উঠেছে, সেলাই ফেঁসেছে; তবুও পুরনো বন্ধুর কাঁধে ধাক্কা মেরে অবজ্ঞাভরে দূরে ঠেলতে পারিনি, অনেকটা কৃতজ্ঞতাবশেই।

এ হেন যাত্রা শুরু হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ছন্দোবদ্ধ, পিরিয়ডিক ঝাঁকুনিতে চোখ ভারী হয়ে এসে শেষে খানিকক্ষণের জন্য চোখ লেগে গেল।

পেটে ডিম-ভাত অর্থাৎ পেটগরম, আর বাইরে এমনি গরম। তার উপরে 'ঋতু পরিবর্তন'-এর বাড়তি গরম - সবরকম মশলাই মজুত ছিল। গরমে-গরমে ঠোকাঠুকিতে তৃণসম (চাপলেস, কোনও পার্টির নাম মিসপ্রিন্ট হয়নি) বাঙালি এই আমি নিঃশব্দে টেক অফ করে পৌঁছে গেলাম এক আজব দুনিয়ায়। এ দুনিয়ায় এসে দেখলাম আমি আর লরঝরে বাসে বসে নেই, চড়ে বসেছি 'ল্যাটেরাইট মাটি' রঙের টগবগে, তেজী একটি ঘোড়ার পিঠে।

কি বল্লেন? অক্সিমোরোন হয়ে গেলো? লাল রঙ আর গতি, তেজ এসব এখন আর কমবো প্যাকে পাওয়া যাচ্ছে না?

আরে দূর মশাই! একবার মশকরা করে উত্তরপ্রদেশের নাম নিলাম বলে লেখাটা পলিটিক্যাল ভেবে বসলেন নাকি? এই গপ্পের মেন বডিটা নিছকই পেটগরম হয়ে দেখা স্বপ্ন। অচেনা লোককে বিশ্বাস না হলে বিস্কুট খেতে হবে না, কিন্তু একবার টাইটেল টা দেখুন। একদম রিল্যাক্স করুন মশাই, রিল্যাক্স!

আচ্ছা, বাংলা ব্যাকরণ মনে আছে তো একটু-আধটু? আলবাত আছে। আমারই মনে আছে যতোটা পড়েছি তার বেশ খানিকটা, আপনাদের তো থাকবেই। সুন্দর সুন্দর এককথায় প্রকাশ গুলো মাঝে মাঝেই মনে পড়ে যায়। দেখুন তো 'কোকনদ' শব্দটা চেনাচেনা ঠেকছে কিনা? সেরকম আন-কমন তো নয় ! চটজলদি একটা ক্লু চাই নাকি ?

ইন্দিবর, পুণ্ডরীক... এবারে মনে পড়লো? যাক ঠিকই ধরেছেন – লাল পদ্ম। মানে লালরঙ ও পদ্মফুলের নৈসর্গিক ও ন্যাচারাল মেলবন্ধন। প্রকৃতি মায়ের কি অপার লীলা! ক্ষুদ্রবুদ্ধির মানুষ তো শিশুমাত্র, সৃষ্টিযজ্ঞের গভীর রহস্যের কতোটাই বা আর বোঝে!

হঠাৎ পেড়ে ফেলা এই প্রসঙ্গটা কিন্তু মোটেই ফাউ না, ফালতুও নয়। ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাবার পথে পাশের একটা দীঘিতে দেখলাম লাল পদ্ম তিকতিক করছে। দীঘির পাশেই দেখলাম একটা নীল চোখের ফরসা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি দেখলাম পদ্মের ঝাঁকের ওপরেই নিবদ্ধ। আগ বাড়িয়েই বললাম - 'অতো কি ভাবছ ভায়া? সবকটাই তো দারুণ ভালো, কাছেপিঠে যা আছে তার থেকেই তুলে নাও একটা'। সিরিয়াস কিছু একটা নিয়ে চিন্তায় মগ্ন ছেলেটির থেকে জবাব এলো – 'গুনছি এখন। একশো আট খানা আছে কিনা দেখে নিচ্ছি। হারভেসট তো করবো পরে'।

কৌতূহল হল, তাই জিজ্ঞেস করেই ফেললাম – 'তুমি কি ফার্মভিল খেল নাকি? হারভেসট সম্মন্ধে দেখছি বেশ ভালো জ্ঞান তোমার । অবশ্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চাষার ব্যাটা হতেই পারো, কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমার ওই ব্লু-আই নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাবে, এই আর কি!'

ছেলেটা হঠাৎ চমকে গিয়ে বলল – 'এতো ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে প্রশ্ন করছেন, আপনি কোন চ্যানেল থেকে আসছেন সত্যি করে বলুন তো? আপনি আসলে কে? প্রতিপক্ষ নন তো?'

আমি বললাম – 'ভয় পেয়ো না ভাই, দেখচো না লাল ঘোড়ায় চেপে এসেছি! তাই কল্কি নই, ফ্যানটম নই, যমুনাপ্রসাদও না। আমি শত্রুঘ্ন ওরফে ধর্মেন্দ্র ওরফে বিনোদ খন্না। অ্যালায়েন্সেই আছি। আর আমার বড় লোক বন্ধুরা রিলায়েন্সে আছে।'

দ্বিধা নিয়ে ছেলেটি বললে – 'ফেসভ্যালুতে ঠিক নিতে পারছিনা। ভেরি ভেরি সরি। যদি কিছু বিশ্বাসযোগ্য প্রুফ দেখাতে পারতেন...'

পরিস্থিতি সহজ করার লক্ষ্যে বললাম – 'একটা কথা বলবো ভাই, মূল্যবৃদ্ধির বাজারে ঘোড়ার খোরাক জুগিয়ে নিজের আড়াই কেজি ওজনের হাত দুখানাকে আর মেনটেন করে উঠতে পারিনি। দলাই-মলাই না পেয়ে শুকিয়ে গেছে। তবে এতো কিছুর পরেও একশো প্লাস একশো মোট দুশো টাকার লাক্স কোজি গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া পরা আছে। চাইলে শার্টের বোতাম-ফোতাম খুলতে পারি। ওতে হলে হল, আর না হলে...'

সে বললে – 'না না। কি যে বলেন! খোদ জিনিস মেনশন করে দিয়েছেন, ওতেই হবে। কিছু খুলতে-টুলতে হবে না। সাফারিং–টাফারিং যতো ঢাকা–চাপা থাকে ততো ভালো। ওসব বাইরে বেরিয়ে এলে আমি আবার কান্না চাপতে পারি না।'

ছেলেটা আচমকা বেশ কনটেমপ্লেটিভ ও সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছে দেখে গলার স্বর কে স্বাভাবিকের চাইতে একটু বেশি মোলায়েম করে বললাম – 'তোমার অবস্থাটা বুঝতে পারছি ভাই, কিন্তু তা বলে এরকম সরাসরি এস্কেপিজম? তোমার মাংসপেশিও তো শুকোবে একদিন। সেদিন সিম্প্যাথি কিনতে হাড় দেখাতে গিয়ে দুহাতে বুক না চেরো, বেয়ার তো হতেই হবে নাকি?'

নাক ফুলিয়ে উত্তর দিল ছেলেটা – 'সে বেয়ার হতে হয় যদি, হবো। কিন্তু মিলিয়ে নেবেন, কৌটো বাজিয়ে হাত পাতবো না। হাল–হকিকতকেই পণ্য করবো, বন্য ভাবে বিক্রি করবো। আমার প্রোগ্রামে কোনও অডিও নেই, শুধধু ভিজুয়াল। ফাসাড নয়, ফেস উইল বিকাম দ্য কোমোডিটি, বোনস বিনিথ দ্য ফ্লেশ উইল বিকাম দ্য কোমোডিটি। ওয়ান টাইম এক্সচেঞ্জ, নো রিটার্ন, অপশনাল (বা অকেশনাল) রিগ্রেট (সেটাও আবার ডিপেনডেন্ট অন দ্য সেন্স অফ অকেশন)! ছড়ান–ছেটানো হাড়-গোড় দেখে ডানা গুটিয়ে ভাগ্যাকাশে চক্কর মারতে থাকা শকুন নেমে আসবে। ওরাই কাস্টমার! আর ডিল-এ এগ্রি না করলে সেই ওরাই আবার ভিকটিম! হা হা হা! কেমন? আইডিয়াটা কেমন?'

বিষণ্ণ মুখে জবাব দিলাম – 'ভয়ঙ্কর! আপনার স্পিরিট একজন ডাই–হার্ড ফ্রিডম ফাইটারের মতোই বোল্ড। কিন্তু টেম্পেরামেন্ট এক্কেবারে জানোয়ারের মতো, সেভেজ! গ্লাটনিক ইন্সটিঙ্কট আপনার!'

ছেলেটি চোখে বিদ্রূপ এনে বলল - 'ওটা আপনার ভারশন! আমার ভারশনটা 'আর-ছাপ ওয়ালা', অথেনটিক। এটা শুনে নিন, ধ্যানধারণা শুধরে নিন। আমি আসলে একটা পয়লা নম্বরের বোকা এস্কেপিস্ট, স্টুপিডিটিতে বালিঝড়ের সময়কার উটপাখির মতোই! চুইং গাম-এ আটকে যাওয়া জুতোর সোল নিয়েও দিনরাত আওড়ে চলেছি লিবারেটেড

সোল এর গল্প। ওটাই হোপ, ওটাই প্রবোধ, আবার ওটাই কনসোলেশন! আর অন্যদিকে কলসপত্রী গাছের মতোই ক্রুয়েল, সিউডোপ্যাসিভ সারভাইভার!'

এসব লজিক–থিওরি–অ্যাডভারটাইজমেনট শুনে-টুনে বোঁ বোঁ করে মাথাটা ঘুরে উঠল, গা গুলিয়ে উঠল। অস্বস্তিটা একটু সামলে উঠে দেখলাম সেই 'কোল্ড–ব্লাডেড' নীলাক্ষ ততোক্ষণে ভ্যানিশ! ছোট্ট একটা আক্ষেপ থেকেই গেল। জানা হল না সে প্রকৃত 'ব্লু- ব্লাডেড' ছিল কিনা। কন্টাক্ট লেন্সের যুগ বলে কথা; সহজে ভরসা হয় না জানেন!

এতক্ষণ ধরে কথাবার্তা হচ্ছিল বলে নীলাক্ষের প্রতি ভদ্রতা দেখাতেই একসময় ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে গিয়েছিলাম। আবার ঘোড়সওয়ার হয়ে এগিয়ে গেলাম খানিকটা।

***

আস্তে–ধীরে চলতে চলতেই দুএকটা মনিহারি দোকান, একটা দশকর্মা ভাণ্ডার, দু–চারটে সবজি আর ফলের ঠেলাগাড়ি, একটা রেশন দোকানকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ কানে এলো এক জাঁদরেল মধ্যবয়স্কার তীক্ষ্ণ চিৎকার, পাশেরই জুতোর দোকান থেকে – 'এই সুব্রত! চোপ! আর একটাও কথা বলবে না আমার মুখে মুখে! স্যারিডন কোম্পানির হাওয়াই চটি দেবে বলেছিলে, আজ অবধি কথা রাখোনি! ব্যবসা গুটিয়ে দোবো তোমার! করেকম্মে খাওয়া জন্মের মতো ঘুচিয়ে দোবো!'

এই তীব্র বাক্যস্রোতকে বহু কষ্টে ম্যানেজ করে কোনমতে বলতে পারলেন মাথার আদ্দেক চুল উঠে যাওয়া দোকানদার – 'দিদি স্যারিডন তো ওষুধের নাম! সে তো মেডিকেল স্টোরে পাবেন। আমার এখানে বাটা–প্যারাগন–খাদিম...'

ফুঁসে উঠলেন 'দিদি' – 'বেয়াদব কোথাকার! ইচ্ছে করে তুই খাদিম এর নাম তুললি! ভাবিস কি কিছুই বুঝি না? কি বলতে চাস তুই? পুলিশ ইনঅ্যাকটিভ? দেখবি? ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় বারো ঘণ্টা মশা'র ক্যাবারে-তে বেকার বসিয়ে রাখলে ভাল্লাগবে?'

দোকানি এবারে বিরক্ত হয়ে বলল –'দিদিভাই বড় চেঁচান আপনি, পুরো কথাটা না শুনেই! মেনে নিলাম সব দোষ আমার, আমায় কোতোল করলেই কলির সব পাপ ধুয়ে যাবে, সব মানলাম। বৌ–বাচ্চা না থাকলে আপনার এসি লাগানো চেম্বারে গিয়ে একদিন চা–মিষ্টি-কচুরি আর কুল-কুল হাওয়া খেয়ে তারপর গর্দানটা দিয়েই ফিরতাম। কিন্তু কি করি বলুন? সংসার বড় বালাই। এতো পিছটান, এত্ত দায়দায়িত্ব। তাপ্পর আবার বারাসাতে থাকি। জোয়ান বউটাকে রেখে শান্তিতে মরতেও পারবো না! যাক গে, এবারে বলুন কোন ব্র্যান্ডের হাওয়াই চটি নেবেন। আমার এখানে লোকাল আর বাইরের মাল মিলিয়ে মোট পাঁচ রকম চটি পাবেন। এই ধরুন দুশো পৌঁয়তিরিশ–তিরিশ রেঞ্জে স্টারটিং আছে!'

একগাল হাসি নিয়ে ঢলে পড়ে বল্লেন 'দিদি' – 'দে না রে একটা চয়েস মতো! ওই ডহরবাবু কে যেটা দিয়েছিলিস সেটা কতো পড়েছিল রে? ওটা থাকলে ওটাই দে।'

দিদির পেয়ারের দোকানি বলল – 'সেতো রোজই কতো বাবু কতো রকম জুতো নিয়ে যায়, সব কি আর ডিটেলে মনে থাকে গো দিদি! তবে যা-ই নেবেন আপনাকে কমসম করেই দেবো! ভাবতে হবে না।'

এবারে দিদির আবদার –'এই শোন না, আমাকে যে দামে দিবি, তার চেয়ে কম দাম লিখে একটা বিল করিস কিন্তু। বুঝিসই তো। একটা ইমেজ প্রোজেক্ট করতে হয়, তারপরে আবার সেটা প্রোটেক্টও করতে হয়। দিন কে দিন ঝক্কি বাড়ছে বই কমছে না! আর তাছাড়া দেখিসই তো, তোদের দিদি পুজো-ভাইফোঁটায় তোদের থেকে কিছুই চায়টায় না। এটুকু গিফট তো চেয়েচিন্তে নিতেই পারে, বল?'

'নিরুপায় ভাই' আর কিই বা বলে, একরকম সোহাগের সাথেই সম্মতি জানাল – 'দিদি গো! আমি তো মাত্র জুতো বেচেই খাই, তাই তোমায় কি করে বলি যে যখন যা লাগবে নিয়ে যেও। তবে তোমার, দাদাবাবুর আর অন্য দাদাদের জুতো–চটি যখন যা লাগবে নিয়ে যেও। নিজে না আসতে পারলে লোক পাঠিও। শুধু দোকানে এসে শুরুতেই মনে করে 'দিদির লোক' বলতে বোলো। ওতেই আমি যা বোঝার বুঝে যাবো।'

এতক্ষণ চুপ করে ঘোড়ার পিঠে বসে 'রঙ্গমঞ্চ' থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে কথোপকথনের আঁচ নিচ্ছিলাম। দাপুটে দিদি জুতোর দোকান থেকে বেরিয়ে আসতেই ঘোড়াকে খুটখুট করে হাঁটিয়ে দিদির কাছে পৌঁছাবার লক্ষ্যে এগিয়ে গেলাম। এর পরবর্তী মাত্র কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে আমার আপাত-নিরীহ বাহনের কারণে এমন একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেলো, যে আমি বেশ খানিকটা লজ্জা ও বিড়ম্বনার সম্মুখীন হলাম।

দিদির কাছে পৌঁছাতেই আমার লাল ঘোড়াটি তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনি করে সামনের দু–পা তুলে হাওয়ায় লাথি ছুঁড়ে বসলো। এ যে কি তীব্র অসম্মান অবোধ চতুষ্পদ আর তার কি বোঝে!

সাত তাড়াতাড়ি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমেই বার তিন-চারেক বেশ জোরে পিঠ থাবড়ে দিলাম তার। লাল ঘোড়া প্রথমে লাল চোখ দেখাল, ঘড়ঘড় করে জোরে নিঃশ্বাস ফেললো, তারপর কোনওরকমে শাসন মেনে নিল।

আমি দিদির কাছে তখন জোড় হাতে ক্ষমা চাইছি। লজ্জায় আমার কান লাল, মুখ লাল, মাথা কাটা যাচ্ছে। লার্জ হার্টেড দিদি নিজগুনে ক্ষমাঘেন্না করে দিয়ে, খানিকটা অভয় দিয়ে, খানিক প্রশ্রয় দিয়ে বল্লেন – 'ওরে এটার এতো রাগ কেন? পশুখাদ্য নিয়ে যারা বদমায়েশি করেছিল, তাদের তো আমার লোক টেনেহিঁচড়ে গারদে পোরার বন্দোবস্ত করেছে। এবার থেকে ওর বা তোর - কারোরই রেশন লুঠ হবে না। দুবেলা দুমুঠো শস্যের আর অভাব থাকবেনা। তোরা মাওবাদী না হয়ে যাতে খাওবাদী হয়ে বেঁচেবর্তে থাকিস তাই জন্যেই তো দিনরাত করছি লড়ছি আর জিতছিও। বোঝাস ওকে। আহা রে! মায়ের জীব, দুধ ছাড়া ইস্তক পিঠে অন্য জীবের বোঝা টেনেই মরল। মাঝে মাঝে ওকেও তো পিঠে নিতে পারিস রে!'

বুঝলাম দিদি মায়ের নাম নিয়ে ভাবের ঘোরে চলে যাচ্ছেন , তাই তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম – 'হ্যাঁ দিদি! নিই তো! খামার বাড়িতে একান্তে যখন থাকি, তখন নিই। জিজ্ঞেস করে দেখুন!'

দিদি আমার বাহনের দিকে তাকাতেই আবার ফুঁসে উঠলো ঘোড়াটা। তিরিক্ষে মেজাজ দেখে দু পা পিছিয়ে গিয়ে বল্লেন দিদি – 'এটা এতো ঠ্যাঁটা, ঢিট প্রকৃতির কেন রে! এতো কিছু করেও মন পাওয়া যায়না!'

হেসে বললাম – 'দিদ , এ হল ইন্সটিংক্ট – এ চলা জানোয়ার। শুঁকে লাই ডিটেক্ট করে ফেলে। বড়র পিরিতি–প্রতিশ্রুতি এসব দিয়ে চিঁড়ে ভেজে ঠিকই, কিন্তু এ আবার ছোট্ট বয়স থেকেই চিঁড়ে-টিরে খায় না!'

দিদি সতর্কতার সুরে বললেন – 'না না। ব্যাপারটা সিরিয়াসলি দ্যাখ একটু। আজকের ক্ষোভ-বিক্ষোভ কালকে আস্তাবলে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জন্ম দেবে।'

আমি বললাম – 'চিন্তা কোরো না দিদি। এটা ঘোড়া, মানুষ না! সামান্য মৌলিক অধিকার গুলো পেলেই খুশি থাকে। বাইক–বন্দুক নে , সিন্ডিকেটের ব্যবসাও নেই, পুকুর বুজিয়ে প্রমোটারিও করে না।'

যেতে যেতে বলে গেল দিদি – 'যা ভালো বুঝিস কর বাবা! খেয়ে পরে বাঁচ। আর যাই কর এলাকাটাকে অশান্ত করিস না। আর শোন, অনেককাল হল তোরা কয়েকজন লাল ঘোড়া পুষছিস, দেখে-শুনে মেনে নিলাম। কিন্তু গেরুয়া ঘোড়া আনছে এ অঞ্চলে কয়েকজন। বলছে নাকি লাল-গেরুয়ার ক্রস ব্রিডিং–এ দমদার জিনিস পয়দা হবে। রেসে নাকি অনেকদূর ছুটতে পারবে তারা। সব বাজে কথা। আমি কিন্তু এসব বরদাস্ত করবো না। ব্লাডে মিক্সিং জাতীয় ফিক্সিং যেন না দেখি।'

দিদিকে আশ্বস্ত করলাম – 'তুমি একদম দুশ্চিন্তা কোরো না। এখনি সেসবের কোনও চান্স নেই। যখন হবে তখন দেখা যাবেখন। পৃথিবী বদলাবে। আমি-তুমিও বদলাবো। আমাদের ভিউপয়েন্ট, স্ট্যান্ডপয়েন্ট এসবও পালটে যাবে।'

শেষ কথাটা বলতে বলতেই দিদির সাথে আমার দূরত্ব অনেকটা বেড়ে গেসলো। দিদি দিদির পথে গেলেন। আমিও ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে চললাম, যেপথে যেমন চলছিলাম।

***

একটু এগোতে এবার দেখলাম একটা ভাঙাচোরা পুরনো বাড়ির দাওয়ায় বসে তিন পক্ককেশ বৃদ্ধ কিছু একটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে সিরিয়াস আলোচনায় মত্ত। এতোটাই ইনভল্ভড যে আমাদের খেয়ালই করলেন না। ওদের খুব কাছে পৌঁছানোর পরে হঠাৎই আমার বাহন জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। কিছুটা ক্লান্তি আর একঘেয়েমি, কিছুটা অ্যাটেনশন টানার প্রচেষ্টা – এসব মিলিয়ে মিশিয়েই ঘোড়াটা সময়–সুযোগ বুঝে শব্দকেন্দ্রিক নানারকম এক্সপ্রেশন দিয়ে থাকে। বড়ই সেনসিটিভ আর বুদ্ধিমান প্রাণীটা।

বিচিত্র এই 'ঘোড়ামি'তেই বোধহয় হুঁশ ফিরল তিন বৃদ্ধের। প্রায় একসঙ্গেই বললেন ওঁরা – 'তুমি এখানে? এখন? এলেই যখন আগে এলেনা কেন? জানতেও পারলেনা যে এরমধ্যে অনেক কিছুই ঘটে গেছে একতরফা, যার অনেক কিছুই অন্যরকমও হতে পারতো!'

আমি খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে বললাম – 'মানে? আমি তো সবসময়ই এখানেই আছি, এখানেই থাকি! কোথা থেকে আসার কথা বলছেন?'

নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন ওঁরা, তারপর ওদের মধ্যে থেকে একজন ভুরু কুঁচকে খানিক উদাসীন ভাবে বললেন– 'তাহলে কি সবটুকু আমাদেরই ভুল? আমরা কি তোমার থেকে, তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম? এখানে তুমিও ছিলে, আমরাও ছিলাম, অথচ আমরা দেখেও দেখিনি যে তুমি আছো! দৃষ্টিটা অকালে এতোখানি খাটো হয়ে যাবার তো কথা ছিল না!'

আমি সান্ত্বনার দেবার বৃথা চেষ্টায় বললাম - 'দেখুন সবাই নিজের নিজের মতো ছিল। নিজের জায়গাতেই ছিল। এই তো ভাল। এতে দোষের কি আছে? আমার এক মাস্টারমশাই বলতেন – পৃথিবীতে সবাই নিজেকে ঠিকমতো দেখভাল করলে কারোকে দেখার জন্যে আলাদা করে আর লোকের দরকার পড়ে না। উপযাচক হয়ে অকারণে অন্যের উপকার-উদ্ধারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়া থেকেই পৃথিবীর বুকে যতো ঝামেলার সূত্রপাত। উনি কতোটা ঠিক বা কতোটা ভুল সেসব বিচার করার মতো বিদ্যেবুদ্ধি আমার নেই, তবে ওনার দেখানো পথে চলে ঝঞ্ঝাট কমেছে বই বাড়েনি একটুও। উনি গাইড করেছেন মাত্র। ফর্মুলাটা মেনে চলা বা না চলা - পুরোটাই ছিল আমার স্বাধীনতা। আমার চয়েসটাও ছিল একরকম লার্নিংই।'

ভ্রূ কুঁচকে বললেন এক বৃদ্ধ – 'এটা কি সেলফিশ আইসোলেশনের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ নয়? প্রকারান্তরে মানবসম্পদের পোলারাইজেশনকে কি এটা আশকারা দেয় না?'

এবারে বললাম আমি –'আর অন্যের জীবনে অকারণে নাকগলানো ব্যাপারটা কি এক অর্থে উৎপাতের প্রবক্তা নয়? সুবিধাবাদের করিডোর উন্মুক্ত করার পিছনেও কি এর প্রচ্ছন্ন ভূমিকা নেই?'

আরেক বৃদ্ধ বললেন – 'কিন্তু অনেকেই তো ঠিক ভুলের বিচার টা সঠিকভাবে করে উঠতে পারেননা। তাঁদেরকে পথ না দেখালে তো মোটের ওপর সমাজেরই ক্ষতি।'

আমি বললাম – 'মানুষ জন্ম নেওয়া প্রতিটি বাচ্চার জীবনেই হাতেখড়ি হল এক অন্যতম মহৎ অনুষ্ঠান। কেন জানেন? ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাকে প্রকাশ করার একটা শক্তপোক্ত মাধ্যমের সঙ্গে বাচ্চার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। কিন্তু কোনও গুরুজন যদি সারাজীবন ধরে এক সুস্থ সবল শিশুর হয়ে, শিশুর দরকারে-অদরকারে লিখে চলেন, তাকে নিজস্ব ক্ষমতার অনুশীলন করতে না দিয়ে, সেটাকে কি আর মহৎ সেবা বলা যায়? সে তো প্রকারান্তরে 'নসবন্দির'-ই সমান।'

এক বৃদ্ধের জবাব- 'একেবারে ভুল কথা। নসবন্দি কোনও দিনই আমাদের এজেণ্ডা ছিল না। ওসব ডিক্টেটরদের প্রোপ্যাগান্ডা ছিল সময়ে সময়ে। আমাদেরকে জড়িয়ে চটুল ও জনপ্রিয় এসব গালগপ্পের কোনও মানেই নেই। আমাদের বরাবরের ভাবনা ছিল মানুষের জন্য, মানুষের স্বার্থে, মানুষের কণ্ঠস্বর হব।'

বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষকে অপমান বা আক্রমণ করার অন্যায় দায়িত্ব নিতে না চেয়েও বলতে বাধ্য হলাম – 'ভয়েস হতে চেয়ে শেষ পর্যন্ত পেরেছেন কি? কি হতে চেয়ে কি হয়েছেন তা নিয়ে একান্তে ভেবেছেন কোনোদিনও? প্রেশারে পড়লে মানুষ কে ঢাল করেছেন, ফ্যামিলির অন্দরমহলে ঢুকে এক ভাইকে 'কুমীর' আর অপর ভাইকে 'খাল' করেছেন। সুবিধামত প্লে-ব্যাক আর্টিস্ট হয়ে পড়েছেন আপনারা। সিচুয়েশনকে এক্সপ্লয়েট করে অন্যের লিপে নিজের আখেরের গান গেয়েছেন। নিজেরা মাস্টারমাইন্ড হয়ে পর্দা খুঁজেছেন লুকোবেন বলে। কিছু মুখকে মুখোশ করেছিলেন আপনারা, আসল মুখ গুলিকে প্রোটেকশন দিতে। একদিন সেই মুখোশ গুলো আপনাদের মুখ হতে চাইল। আসল মুখ আর নকল মুখে বেজায় ঝগড়া লাগলো। আসল মুখ চিৎকার করে বেরিয়ে এসে বলতে চাইল সব সত্যি কথা। কিন্তু পারলো না। সে মুখের গ্রহণযোগ্যতা তখন কোথায়? কে চেনে তাকে? তার চেয়ে নোন ডেভিলের রেকগনিশন অনেক বেশি। কাজেই ফাসাড ফেস হয়ে গেল, ন্যাচারালি ফেস ফ্যাসাদে পড়লো এবং অবধারিত ভাবেই সময়ের সাথে সাথে ফেজড আউট হয়ে গেল।'

তিন বৃদ্ধের আর্তনাদ শোনা গেল – 'তাহলে আমরা কি কিছুই করিনি বলতে চাও? অনেক কে অনেক কিছু দিয়েছি, অনেকেই অনেক কিছু পেয়েছে, নিয়েছে।'

আমি বললাম - 'সবাই তো নেয় নি। এই যেমন আমি নিই নি। যারা কিছু নেয়নি তাঁদের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা অর্জনের কোনও রাস্তা ছিল আপনাদের কাছে? আপনাদের সুবিধার্থে আমিই বলে দিই – না, ছিল না।'

এক বৃদ্ধ অনুযোগের সুরে বললেন – 'এর জন্যে তো কোনোদিন দোষারোপও করো নি তুমি, নীরবে দূরে সরে গেছ, কিছু না বলে।'

এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কোনও উত্তর না দিলেও চলতো হয়তো, তাও বললাম – 'সরব হবার কোনও কারণ বা দায় ছিল না হয়তো। কার কাছে গিয়ে কিই বা বলতাম!'

এরপরেই এক বৃদ্ধের মুর্খামি আমাকে প্রায় স্তম্ভিত করে দিল। তিনি বললেন – 'তুমি না হয় আত্মমর্যাদার সমুদ্র কিন্তু সবাই তো তা নয়। অনেক জব্বর কুমীর পুষেছি আগে। তারাও সানন্দে আমাদের পরিখাতেই থাকতে চেয়েছিল। জোরাজুরি করা হয়নি। সুদিনে তাজা মাছ-মাংস-রক্ত ছিটিয়ে ওদের ডেকেছি, দুর্দিনে বাসি–পচা খোরাকের টোপ দিয়েই ডাকবো। ডেকে কৈফিয়ত চাইব সব কটার থেকে। নিমকহারামির শোধ তুলবই তুলবো।'

আমি হেসে বললাম – 'একটা কুমীরও আর ফিরবেনা। ওরা সবাই তাজা মাছের বিকল্প উৎস খুঁজে পেয়েছে, বা বলা ভালো খুঁজে নিয়েছে।'

নিষ্ঠুর হাসির সঙ্গে উত্তর এলো – 'খুঁজে খুঁজে সেসব জায়গামতো জলে বিষ দিই যদি? বাঁচতে পারবে ওরা এভাবে পালিয়ে? কৈফিয়ত না পাই, নিমকহারামদের লাশ গুলো তো পাবো! তাই না?'

আমার ঘোড়া মানুষের ভাষা জানে না, জানবার কথাও না। কথোপকথন শুনুক বা না শুনুক, সারমর্ম কিছু বুঝুক বা না বুঝুক – এতক্ষণ সে শান্ত হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। ঘাড় নাড়ছিল, কান নাড়ছিল, নিজের গা চেটে সাফ করছিলো। কিন্তু বৃদ্ধের এই কথা শেষ হতে না হতেই আচমকা উন্মত্ত ভাবে লাফিয়ে উঠলো সে। ছিটকে পড়ে গেলাম পিঠ থেকে। উঠে দাঁড়িয়ে নিরস্ত করতে যাবো, এমন সময়ে আমার ডান কাঁধে প্রচণ্ড জোরে জোড়া পায়ের লাথি কসাল ঘোড়াটা। সুপার–হেভি সেই লাথির চোটে আমার কাঁধ তখন প্রায় খুলে যাবার জোগাড়। আমি একপাশে কাঁধ চেপে বসে পড়তেই দেখলাম ক্ষিপ্ত ঘোড়াটা প্রবল আক্রোশে শক্ত ক্ষুরের আঘাতে মাথা ফাটিয়ে হত্যা করছে ওই তিন বৃদ্ধকে। চোখে তার তখন ভয়ঙ্কর আগ্রাসন, শরীরী ভাষা প্রবল আক্রমণাত্মক। এক বৃদ্ধের মাথা ফেটে ঘিলু রাস্তায় ছড়িয়ে পড়তে দেখে গা গুলিয়ে উঠলো আমার, চোখ বন্ধ করেও সব তছনছ হয়ে যেতে দেখলাম চোখের সামনে। মায়াজগত ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

হুঁশ ফিরে আস্তে দেখলাম বাসের লাস্ট সিটে জানালার ধারে বসে আমি আর আমার ডান কাঁধে প্রবল ব্যথা। সামনের সিটের এক সহযাত্রী জানালেন বাসটি চলার পথে ভাঙাচোরা রাস্তায় একটি গর্তে পড়ে লাফিয়ে ওঠার ফলে প্রবল জারকিং হয়। ঘুমন্ত আমি তাতেই সম্ভবত বেজায় চোট পেয়েছিলাম । কাঁধে হাত বোলাতে গিয়েই মনে পরে গেল একটু আগেই খাওয়া ঘোড়ার লাথির কথা। কাঁধ ঝাকিয়ে দেখে নিলাম সত্যি-ই ডিসলোকেটেড হয়ে আছে কিনা।

এক অদ্ভুত অপ্রস্তুত ও অস্বস্তিঘন মানসিক অবস্থার মধ্যে গুম হয়ে বসে আছি, এমন সময়ে কনডাক্টর বাবু এসে জোরে হাঁক পাড়লেন – 'দাদা, সেই ওঠার পর থেকে তো পড়ে পড়ে ঘুমোলেন। এবার ভাড়াটা দিন! মানুষ-জানোয়ারে খাটছে–পিটছে, আমরা জেগে আছি; আর আপনি জোয়ান ব্যাটা ছেলে, কেলিয়ে পড়লেন! এবার জাগুন। বলছি তো আপনাকে চোখটা খুলুন, জাগুন! দুটো স্টপ পরেই শলপ। এখান থেকে ডেসটিনেশন অবধি চারপাশটা একটু দেখতে থাকুন, এটুকু রাস্তা জেগেই থাকুন!'

মিষ্টি পোলাও, ছোলার ডাল আর মাংসের ঝোল

দুর্বার্

অক্টোবর ২৯, ২০১৪

আবদার এর কোনো সীমা আছে? অঙ্কের স্যার এর আবদার, অঙ্কের স্যার এর ভাই এর আবদার, ভাই এর দাদার আবদার, দাদার বন্ধু, বন্ধুর দাদা এবং তার ভাই, সব মিলিয়ে বেশ গুচ্ছ লোকের আবদার।

যদিও কাঙ্ক্ষিত প্রশংসা আমি পাইনি, বরং টমেটো দিয়ে অখাদ্য ম্যাগি রান্না করার বদনাম আছে আমার। তবু বন্ধু কে ভাই এর সামনে একটু কলার তোলার সুযোগ করে দিলেম। আমার মনটা খুব নরম কিনা।

শুরুতেই বলে রাখি, রান্নাগুলো ভীষণ সহজ আর হয়তো আপনারা সবাই বাড়িতে নিদেনপক্ষে একবার করে করেই ফেলেছেন। তবুও আমার মা এর মন ভোলানো রবিবার এর রান্নার পাণ্ডুলিপি দিলাম নীচে – দুধভাত রাঁধুনিদের জন্যে।

মিষ্টি পোলাও (৪ জন এর জন্যে) –

চাল – ৩ কাপ বাসমতী
ঘী – ৩ চামচ
দই – ২ চামচ
নুন- আন্দাজ মতন
চিনি – ৫ চা চামচ (আমি চিনি একটু বেশি খাই, তবে এই মাপ টা মিষ্টি পোলাও এর জন্যে খুব বেশি না)
জীরে + ধনে গুঁড়ো – ১ চামচ
গোটা গরম মশলা + তেজ পাতা
কাঁচা লঙ্কা – ৩ টে মাঝখান থেকে চেরা
গাজর – ২ টো সরু সরু করে কাটা (চাইনীজ ফ্রায়েড রাইস এর মতন)
পেঁয়াজ – ১ টা বড় ছোটো কুচি করে কাটা
বীনস – ১/২ ইঞ্চি কুচি করা এক মুঠো

চাল ভাল করে ধুয়ে জীরে আর ধনে গুঁড়ো মাখিয়ে রেখে দিতে হবে ১৫ মিনিট এর জন্যে।

এবার প্রেশার কুকারে ঘী দিয়ে অল্প আঁচে গরম করতে হবে। ঘী গরম হলে আঁচ বাড়িয়ে তেজ পাতা, ছোটো এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ দিতে হবে। মশলার গন্ধ বেরোলে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একটু ভেজে পেঁয়াজ দিতে হবে। পেঁয়াজ

টা লাল করে ভাজলে ভালো হয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে মুচমুচে যাতে না হয়। আঁচ কমিয়ে রান্না করলে সবজি মুচমুচে হবে না। পেঁয়াজ সোনালি হয়ে এলে গাজর আর বীনস গুলো দিয়ে দিতে হবে। সবজি অল্প ভেজে (মিনিট ৮-১০) জল ঝরানো মশলা মাখানো চাল টা দিয়ে ঘী তে অল্প নেড়ে-চেড়ে নিতে হবে। খেয়াল রেখো যেন খুন্তি চালাতে গিয়ে চাল ভেঙে গুঁড়ো না হয়ে যায়। নুন-চিনি দিয়ে দিতে হবে এরপর, আর দিতে হবে দই ২ চামচ। এরপর আসবে সব থেকে কঠিন কাজ, জল দেওয়া। আমি সাধারণত ৩ কাপ চাল এর জন্যে ৬ কাপ জল দিয়ে থাকি প্রেশার কুকারে। কিন্তু পোলাও এর জন্যে মাপ টা ৫ ১/২ কাপ (সাড়ে পাঁচ)। জল বেশি না হওয়াই মঙ্গল, গ্যাদগ্যাদে পোলাও খেতে খুব একটা ভালো হয়না। বরং চাল একটু শক্ত থাকলে ভাপে সেদ্ধ হয়ে যায়।

একটা সিটি দিয়ে একটু অপেক্ষা করে নামিয়ে নিতে হবে। বা দুটো সিটি দিয়ে বাকি প্রেশারটা বের করে দিলেও চলবে। যেটা খুশি। আমি প্রেশার বের করে দিয়ে ঢাকনা খুলে একটু চেখে দেখি, নুন চিনির পরিমাণ। যদি নুন/চিনি কম হয়, ১/২ কাপ উষ্ণ জলে মাপ মতন চিনি/নুন মিশিয়ে পোলাও এ ঢেলে ঢাকনা বন্ধ করে রেখে দিন।

ছোলার ডাল –

ডাল – ৪ কাপ
বেকিং পাউডার – ১ চামচ
নুন/চিনি – আন্দাজ মতন
কিসমিস – এক মুঠো
কোরানো নারকেল – ১ কাপ
সাদা তেল – ৩ চামচ
পেঁয়াজ – ১ ১/২ টা কুচো করে কাটা
টমেটো – ১ টা বড় মাপের কুচোনো
লঙ্কা – ৪ তে মাঝখান থেকে চেরা
হলুদ গুঁড়ো – ১/২ চামচ
গোটা জীরে – ১ চামচ
আদা/রসুন – কুচোনো ১ চামচ করে

ডাল প্রেশার কুকারে সেদ্ধ করে নিতে হবে নুন, হলুদ আর বেকিং পাউডার দিয়ে। ডাল যেন বেশি গলে না যায়, গোটা গোটা থাকলে ভালো হয়।

এরপর কড়াই তে তেল গরম করে জীরে আর লঙ্কাগুলো দিয়ে দিতে হবে। জীরে তেলে ফুটতে শুরু করলে পেঁয়াজ দিতে হবে। পেঁয়াজ ভালো করে ভেজে নিয়ে টমেটো দিয়ে দিতে হবে। আমি রান্নার সময় পেঁয়াজ এর পর নুন আর টমেটোর পর চিনি দিয়ে থাকি। তবে নিজের ইচ্ছে মতনও দেওয়া যায়। টমেটো পেঁয়াজ একটু কশে

এলে আদা-রসুন কুচো দিয়ে ভালো করে কশতে হবে, মাঝেমাঝে অল্প জল দিয়ে। একটু বাদে মশলা থেকে তেল বেরোলে সেদ্ধ ডাল আর কিসমিস দিয়ে দিতে হবে। নামানোর আগে নারকেল কোরানো দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। ডাল অ্যাড করার পর বেশিক্ষণ রান্নার দরকার নেই, সঙ্গেসঙ্গেই নারকেল দিয়ে নামিয়ে নেওয়া যায়।

রোববার এর মাংস –

মুরগীর মাংস – ১ কেজি
পেঁয়াজ – ৩ টে বড় মাপের। দেরখানা কুচোনো , বাকি দেরখানা বাটা
টমেটো – ১ টা বড় মাপের কুচোনো
রসুন – ৫ কোয়া গোটা, ৩ কোয়া বাটা
আদাবাটা – ৩ চামচ
কাঁচা লঙ্কা – ৪ টে
ধনে গুঁড়ো – ২ বড় চামচ
নুন-চিনি – আন্দাজ মতন

মাংস টা ভালো করে ধুয়ে অল্প নুন (১ চামচ), চিনি (১/২ চামচ), আদা-রসুনবাটা মাখিয়ে রাখতে হবে (আদা বাটা দেড় চামচ, রসুন বাটা ৩ কোয়া)।

কড়াইতে তেল গরম করে, কাঁচা লঙ্কা গুলো দিয়ে দিতে হবে। এরপর সাথেসাথেই পেঁয়াজ বাটা আর পেঁয়াজ কুচো তেলে দিয়ে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজ বাটা থেকে জল বেরোতে পারে, আঁচ বাড়িয়ে ভালো করে ভাজতে হবে। পেঁয়াজ সোনালি ব্রাউন হয়ে এলে মাংস দিয়ে দিতে হবে। মাংশের গা থেকে মশলা মুছে নিয়ে কড়াই তে দিলে ভালো হয়। মাংসে নুন – হলুদ দিয়ে ভাজতে হবে মিনিট ১০। মাংস ভাজা হয়ে এলে, টমেটো দিয়ে দিতে হবে। আর এক চামচ চিনি। টমেটো গলে গেলে বাকি আদাবাটা, রসুন, ধনে গুঁড়ো দিয়ে মাংস ভালো করে কশাতে হবে। কড়াইতে মশলা পুড়ে লেগে যেতে শুরু করলে ১/২ কাপ জল দিয়ে আবার কশাতে হবে। আমি এরম ভাবে ৪ বার ১/২ কাপ জল দিয়ে কশাই। কিন্তু পুরোটাই আন্দাজ মতন। এরপর এক কাপ জল দিয়ে ফুটিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। পোলাও এর সাথে খাওয়ার জন্যে বেশি ঝোল না হলেও চলবে। রুটি দিয়ে খেতে চাইলে জল একটু বেশি দিতে হবে।

উফফ, হাতে ব্যথা হয়ে গেলো!

অনামী

সত্র্যজিত

ফেব্রুয়ারী ২৬, ২০১৪

তোমার অসিচালনায় আমার শূন্য শিরস্ত্রাণ রাঙিয়ে ওঠে।
তোমার অঙ্গ সঞ্চালনায় পুলকিত হয় আমার পৌরুষ।
আমার মন কেমনের রাতে তোমার পাগল করা পাগলামি
রচনা করুক আমাদের জীবনের সংবিধান।
এভাবেই লিখো তুমি, আর গান গেও বসন্তের,
নতুন প্রজন্ম কে জানিও পুরনোর প্রণাম।
আমলকি বনে পাতা আসুক বা না আসুক,
সত্য এটাই,
তোমার পাগলামিই আমার পাথেয়।

প্রাতর্ভ্রমণ

দাদামনি

অক্টোবর ৮, ২০১৪

চিকিৎসকের উপদেশ এবং পরিবারের সদস্যদের উপরোধ এড়াতে পারিনি। অনেকটা বাধ্য হয়েই মর্নিং ওয়াক অভ্যাস করেছিলাম বেশ কয়েক বছর আগে। অসহ্য লাগত প্রথম দিকে। ভোরের দিকের ঘুম বড় মধুর, বিশেষ করে শীতকালে লেপের উষ্ণতার তো তুলনা হয় না। সেই আরাম ছেড়ে কাকভোরে হাঁটতে যাওয়ার কোনও মানে হয়? কিন্তু স্বাস্থ্যের খাতিরে যেতেই হত। অসহ্য লাগত প্রথম দিকে। তবে ধীরে ধীরে মানিয়ে নিয়েছিলাম।

তখন আমার নিবাস ছিল দক্ষিণ কলকাতা, “লেক” অর্থাৎ রবীন্দ্র সরোবর থেকে পাঁচ সাত মিনিটের হাঁটা পথে। তবে সে পথ বড় দুর্গম, বিশেষ করে ভোর বেলা। ফুটপাথে সারি সারি নিদ্রিত পথবাসী; ছোট ছোট মশারি, এক প্রান্ত বাঁধা বন্ধ দোকানের তালায়, অন্যপ্রান্ত ল্যাম্প পোস্টে বা টানা রিকশার হাতলে। এখানে সেখানে বকলস বাঁধা অভিজাত সারমেয়কুলের প্রাতঃকৃত্যের নমুনা। রোল ব্যাপারীদের রাস্তায় ফেলে যাওয়া অজস্র ডিমের খোসা। এই সব বাধা পেরিয়ে পথ চলা এক বিরক্তিকর ব্যাপার।

তবে একবার লেকে পৌঁছোতে পারলে শরীর ও মন বেশ চনমনে হয়ে ওঠে। শ’য়ে শ’য়ে লোক হাঁটছে। নারী, পুরুষ, কিশোর, কিশোরী, যুবাবৃদ্ধ সবাই। আর জায়গাটা মোটামুটি দূষণ মুক্ত, বেশ ভালই লাগে। সত্যি কথা বলতে কি, চুপ করে এক কোনায় বসে হাঁটুরেদের কাণ্ডকারখানা দেখেও বেশ সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। কেউ একা হাঁটেন – গম্ভীর মুখে, কেউ বা আবার এক একটি দলে। যারা দল বেঁধে হাঁটেন তারা আবার আড্ডা মারেন হাঁটতে হাঁটতে। নানা টপিক, নানা বিষয়বস্তু। ধরুন একটা বাঙালী দল, পাশ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল আর কানে এল কয়েকটি খুচরো সংলাপ, “হ্যাঁ ধোনি খুব ভাল করছে, কিন্তু টিমটা কিন্তু সৌরভই তৈরি করেছিল...”। আরেকটি দল, এঁরা আদতে দেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বাসিন্দা; শুনতে পাবেন, “সিমেন্টকা ভাও অচানক বহুত বাড় গয়া, ...”। নবীন প্রজন্মের কিশোর কিশোরীদের মধ্যে অনেকে দৌড়োন বা যাকে বলে জগিং করেন; পরনে ট্র্যাকস্যুট, পায়ে নাইকি বা অ্যাডিডাস, কানে ইয়ারফোন।

তবে সবাই যে হাঁটেন বা দৌড়োন তা কিন্তু নয়। অনেকে ধ্যান করেন পদ্মাসনে বসে, কেউ আবার চারিদিকের কোলাহল সম্পুর্ণ উপেক্ষা করে, উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করেন সংস্কৃত স্তোত্র; বেশ লাগে শুনতে। অনেকে বাবা রামদেবের মত চোখ বন্ধ করে সজোরে শ্বাস নেন অথবা এক নাসারন্ধ্রে নিশ্বাস নিয়ে অন্য নাসারন্ধ্র দিয়ে ছাড়েন। আবার বেশ কয়েকজন প্রবীণ-প্রবীণা আছেন, যাঁরা দল বেঁধে আসেন, ধীরে সুস্থে গল্প করতে করতে। লেকের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কয়েকটি সিমেন্টের বাঁধানো আসন আছে, তার একটিতে এসে বসেন এবং ঘন্টা

খানেক চুটিয়ে আড্ডা মারেন। তারপর আবার গল্প করতে করতে ফিরে যান। দেখে মনে হয় এঁরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু, হয়তো বা প্রতিবেশীও।

প্রথম দিন যখন লেকে ঢুকি, সমবেত কণ্ঠের এক বিরাট অট্টহাসির আওয়াজে বুক কেঁপে উঠেছিল। লেকের একটি কোনায় একটা ঘেরা জায়গায় লাফিং ক্লাবের মেম্বাররা তাঁদের দৈনন্দিন কর্মসূচী পালন করছিলেন। তাঁদের দলে প্রায় গোটা পঞ্চাশেক সদস্য, নানা বয়সের। পুরুষের সংখ্যাই বেশি, মহিলা খুব একটা চোখে পড়েনা। প্রায় ঘন্টা খানেক ধরে এঁরা পুরো শরীর কাঁপিয়ে অট্টহাসি হাসেন। পাশ দিয়ে একটা মেঠোপথ, সেখান দিয়ে সকাল বেলা কিছু গৃহ কর্মচারিনী যাওয়া আসা করেন। এঁরা ভোর বেলা রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে আসেন ট্রেনে চেপে। স্টেশনে নেমে হাঁটেন কর্মস্থলের দিকে। পরনে আধ ময়লা শাড়ী, পায়ে হাওয়াই চপ্পল, হাঁটেন খুব দ্রুত। দেরী হলে আবার গিন্নীমারা বকাবকি করবেন। লাফিং ক্লাবের পাশ দিয়ে যাবার সময় এঁরা বাবুদের কাণ্ডকারখানা দেখে হেসে কুটিপাটি হন। সমবেত কণ্ঠের সেই খিলখিলে হাসি মাঝে মাঝে বাবুদের অট্টহাসিকে ছাপিয়ে ওঠে। এক দিন লাফিংক্লাবের এক বাবু একটু বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই হাসছিস কেন রে?"

সামনে দিয়ে যাচ্ছিল একটি অপেক্ষাকৃত কম বয়সী মেয়ে, বেশ হাজির জবাব, গলা তুলে উত্তর দিল, "আমরা তো তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসতেছি বাবুরা, কিন্তু তোমরা যে বিনি কারণে হাসতিছো..."

এক ভদ্রলোক, বয়স আন্দাজ ষাটের কাছাকাছি, একা আসেন, ধীর গতিতে। পরনে অত্যাধুনিক 'শর্টস' – অনেক গুলো পকেট ওয়ালা, পায়ে বেশ দামী স্পোর্টস শু বা স্নিকার, রঙিন টি-শার্ট, মাথায় কায়দার টুপি, কিন্তু অত্যন্ত ব্যাজার মুখ, দেখে মনে হয়, জোর করে বাড়ির লোকেরা হাঁটতে পাঠিয়েছে। ভদ্রলোক কারও সঙ্গে কথা বলেন না, এবং কেউ আলাপ করার চেষ্টা করলে মুখ ঘুরিয়ে নেন। লেকের এক কোনায় বসে চুপচাপ খবরের কাগজ পড়েন; মিনিট চল্লিশেক পর আবার ধীর গতিতে বেরিয়ে যান। এক দিন ওনার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এক চায়ের দোকানে। গোলপার্কের এক কোনায় একটি পুলিস ব্যারাক আছে, পাশে স্টেট ব্যাংকের একটি শাখা। সামনের ফুটপাথে সারি সারি চায়ের স্টল। আমি হেঁটে ফেরার পথে সেখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খুরিতে চা খাই। এলাচ সহ গরম গরম সেই চা বড়ই সুঃস্বাদু। এক দিন দেখি পাশের স্টলেই সেই ব্যাজার মুখো ভদ্রলোক; আমাকে দেখেই খবরের কাগজে মুখ ঢেকে ফেললেন। আমিও পেছন ফিরে ওনার উপস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চায়ে মন দিলাম। কিছুক্ষণ পর শুনলাম ভদ্রলোক খুব নীচু গলায় বলছেন,

- "ডিম গুলো টাটকা তো?"

- "হ্যাঁ স্যার, কাল রাতেই কিনেছি, পোল্ট্রি থেকে"

- "দেখি একটা ওমলেট বানাও তো ভাল করে। ভাল তেল আছে তো?"

- "হ্যাঁ স্যার", চা ওয়ালা একটা নামী কোম্পানির বোতল দেখায়।

- "ঠিক আছে, বেশি তেল দিও না কিন্তু; আমার আবার একটু প্রেশার আছে। ও কি, একটা ডিম দিচ্ছ না কি? একটা ডিমে কি ওমলেট হয়? দুটো দাও, নুন বেশি দিও না, বল্লুম না প্রেশার আছে"

- "ঠিক আছে স্যার... আর কিছু?"

- "টোস্ট দাও দুটো, মাখন আছে?"

- "হ্যাঁ স্যার", চা ওয়ালা একটা ছোট আমুলের প্যাকেট তুলে দেখায়।

- "ঠিক আছে, সামান্য এ-এ-একটু মাখিয়ে দাও আর ওপরে তোমার সেই মোটা দানা চিনি ছিটিয়ে দিও, সামান্য, আমার আবার শুগারও আছে বুঝলে?"

ভদ্রলোককে প্রায়ই দেখি, হয় লেকের এক কোনায় বসে কাগজ পড়ছেন কিংবা ঐ চায়ের স্টলে ব্রেকফাস্ট করছেন। কোনও দিন হাঁটতে দেখিনি।

কবি

অনুপম

জুলাই ৪, ২০১৪

অতঃপর বাঘের দুধ খাওয়া টেকো মাথার সেই কবি, রঙিন ছাতা হাতে রাস্তায় নামিলেন। যদিও বৃষ্টি এক্ষণে নাই, তবু আকাশকে বিশ্বাস কি!

গন্তব্যে যাইবেন বটে, তবে কোনো ইজিবাইকই (তিন চাকা, তবে বিদ্যুতে চলে) তাঁহার পছন্দ হইতেছে না। কাহারও পিছনের সিট খালি নাই। আবার ভারী শরীর নিয়ে মূর্খ ড্রাইভারের পাশে গাদাগাদি করে বসিলে, পাছে নিজের কবিত্বকে অপমান করা হয়, তাই অগত্যা রাস্তাতেই দাঁড়াইয়া থাকিলেন।

মিনিট পাঁচেক কটিয়া গেল তবু কাঙ্খিক শকটের (পেছনের সিট খালি আছে এমন ইজিবাইক) দেখা মিলিলো না। বিরক্ত কবি টেকো মাথায় বুলাইতে লাগিলেন।

কতিপয় গজ তফাতে একপাল শহুরে ভেড়া বিশ্রাম লইতেছিল, হঠাৎই উহার মধ্য থেকে একটি অবুঝ ভেড়া শাবক কবির দিকে তেড়ে আসিলো। হতভম্ব কবি পশ্চাদ্দেশ সামলাইয়া দৌড় দিবার উপক্রম করিলেন, পিছনে ফিরিয়া দেখিলেন, ভেড়া শাবকটি তাঁহার ছাতিটা কামড়াইয়া ধরিছে।

তুচ্ছ ভেড়া দেখিয়া দৌড় দেওয়া অসম্মানজনক, কবি নিজেকে সামলাইয়া লাইলেন। ইতিমধ্যে শাবকটি তাঁহার ছাতাটি জিভ বাহির করিয়া চাটিতে লাগিলো। কবি দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ছাতা ছাড়াইয়া নিলেন। ভেড়া শাবক চলিয়া গেল।

কবি ভাবিলেন, ভেড়াটি কি তাঁহার অসহায়ত্ব বুঝিতে পারিয়াছে, তাঁহকে কটাক্ষ করিতেই কি এইরূপ আচরণ করিলো! কত বড় স্পর্ধা! আজকে গৃহে যাইয়া লই, ভেড়ার বংশ উদ্ধার করিয়া ছাড়িবো।

অতঃপর নিশিকালে গৃহে আসিয়া কবি ভেড়া শাবকদের ঘন পশমযুক্ত কদর্য চেহারা নিয়া উপহাস করিয়া একখানি নির্মম কবিতা লিখিলেন। অপমানবোধ প্রশমিত হইলো।

তবে কবি জানিলেন না, ভেড়া শাবকটি তাঁহার রঙিন ছাতাটিকে উপাদেয় খাদ্য ভাবিয়াই এইরূপ আচরণ করিয়াছিল।

বাজারবৃত্তি

হযবরল

জুন ১৮, ২০১৪

ব্রাজিল দেশে বিশ্বকাপ হওয়া মানে অনেকটা মস্কোতে ভদকা পার্টি বা পদ্মাপারে ইলিশ উৎসব হওয়ার মত। এমনিতে গরিব দেশ, তবু ফুটবল-পাগল লোকেরা বিশ্বকাপের সময় ঘরদোর বেচে অন্য দেশে ব্রজিলকে সমর্থন দিতে ছুটত। এবার কোথাও যেতে হচ্ছে না তাই তারা ভেবেছিল যে ফুটবলের জন্য সব হারিয়েছি এক কালে, তাই এবার দেশের জন্যে কিছু করি। তাদের মৌলিক দাবি ছিল যে ফুটবলের আয়োজনের সাথে সাথে রাষ্ট্র তাদের অনাহারে মরা শিশুদের জন্যে খাদ্যের ব্যবস্থাও করুক। আপামর জনগণ মোটের ওপর বোঝাতে চেয়েছিল যে সারা বিশ্ব, ফুটবল দেখতে এসে উলঙ্গ কদাকার শিশুদের চেহারা দেখে তাদের দেশ সম্বন্ধে অন্যরকম ধারণা নিয়ে ফেরত যাবে সেটা কখনই হতে দেওয়া যায় না। গাম্বাট সরকার কি বুঝলো কে জানে, দুম দাম নির্বোধ পুলিশ মিলিটারি লেলিয়ে দিলো তাদের ওপর। সারা বিশ্বের চোখ যখন নেইমারের পায়ের খেল দেখতে ব্যস্ত, নেইমারের বয়সী অনেক যুবকের মারের চোটে কপাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। এক সপ্তাহ হয়ে গেছে তাই সে রক্তও এতদিনে শুকিয়ে গেছে বোধহয়। কাল রাতে বীভৎস এক দুঃস্বপ্ন দেখলাম, ব্রাজিলের ছোট ছোট শিশুদের মুন্ডু কেটে তাদেরই গায়ের চামড়া দিয়ে সেগুলো মুড়িয়ে, রং করে, বিদেশে ফুটবল হিসেবে রপ্তানি করা হচ্ছে। আমাদের দেশের বাচ্চারা সেই সব বল গুলো দিয়ে বর্ষা ভেজা মাঠে সরাত করে স্লাইড মেরে জমিয়ে ফুটবল খেলেছে। আস্তে আস্তে চামড়ার বলের সেলাই গুলো জলে ভিজে খুলে যাচ্ছে ও বাংলার মাঠে জমা বর্ষার জল ব্রাজিলের শিশুদের রক্তের রঙে লাল হয়ে উঠছে। সাইড থেকে কিছু উল্লসিত দর্শক চিৎকার করছে, "ভুলবে না বাংলা ব্রাজিলের নাম... লালে লালে লাল সেলাম!"

ঘুম ভেঙে গেল, গলা শুকিয়ে গেছে। জল খেতে খেতে মনে হলো বিশ্বকাপ যেটাকে বলছে সেটা তো ছোটখাটো একটা সোনালী মুগুরের মত দেখতে, কাপও না টাম্বলারও না! বাজার চাইলে কি না করতে পারে! কোনদিন দেখব এক সফ্ট ড্রিংক কোম্পানি পুরো বিশ্বকাপটাই কিনে নিয়েছে ও বিশ্বকাপটা তাদের পানীয়ের বোতলের আকারে তৈরী করেছে, বিশ্বকাপ হবে বিশ্ববোতল। বিজ্ঞাপণে দেখানো হবে পুরো বিশ্ববাসীর স্বপ্ন, বোতল খুললেই হুসসসস করে ফ্যানা ছিটকে পড়ছে বিশ্বের গায়, কি exciting! সে কোম্পানি অবশ্য এখনই বিশ্বকাপের অর্ধেক কিনে নিয়েছে আর বাকিটা কিনেছে ডাকসাইটে এক ইলেকট্রনিক ও মিডিয়া কোম্পানি। আমার এক প্রতিবাদী কমরেড বন্ধু ছাত্রাবস্থায় কোকা কোলা খেতেন না, কেননা তার পার্টি তাকে বুঝিয়েছিল যে প্রত্যেকটা কোকা কোলার বোতলে ইরাকি ও আফগান শিশুদের রক্ত মিশে আছে। দশ বছর পরে সেই বন্ধুকে দেখলাম কোকা কোলার লোগো লাগানো লাল স্ট্রাইপ্ড জামা পরে ইয়া বড় বড় টেরিটোরি সামলাচ্ছে। জিগ্যেস করলাম, "কিরে তুই তাহলে শেষ মেশ ইরাকি শিশুদের রক্ত পান করছিস?" হেসে বলল, "না রে, খোজ নিলাম ওটা কোকা কোলা নয়

ওটা পেপসি। আর আমার কাজ লোককে খাওয়ানো, নিজে খাবার আর সময় কই?" অনেক দিন বাদে দেখা তাই আর কথা বাড়িয়ে পরিবেশ তিক্ত করলাম না। বরঞ্চ সে আমায় গঙ্গার জলের মত পবিত্র কোকা কোলায় তিক্ত রাম মিশিয়ে খাইয়ে নিজের প্রাচীন পাপের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করলো। বললাম না, বাজার পারে না হেন কিছু নেই!

বীরভূম জেলায় অনেকগুলো পাথর খাদান আছে। মহম্মদবাজার অঞ্চলে যখন আদিবাসী মজুররা দুপুরের টিফিন খেতে স্থানীয় বাজারের দোকান গুলোতে ভিড় করত, তখন লুচি তরকারী, পাঁউরুটি ডিম ছাড়া কিছুই পাওয়া যেত না সেখানে। সেই বাজারে হটাৎ একদিন গৌর মিষ্টান্ন ভান্ডারে মজুররা অবাক হয়ে দেখলো যে লাল লাল বাক্স করে কালো কালো বোতল নামছে আর গৌর বাবু তা গুনে গুনে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখছে। কৌতূহল সামলাতে না পেরে সুবল মুর্মু জিগ্যেস করলো, "ইঠো কিরকম বোতল গো বটে?" দোকানদার উত্তর দিল, "এটার নাম 'খোকা খোলা' বটে, ৫ টাকা দাম, বল তো খুলে দিবো, একবার তুই খেয়ে দেখ।" সুবল ১০ টাকা দিয়ে দু বোতল ঢকঢকিয়ে মেরে দিল। নাঃ বেশ খেতে, আরো খেতে হবে, আবার দু বোতল মারলো সে। শেষে বিরক্ত হয়ে বলল, "বিশঠো টাকা গেলো কিন্তু দু টাকার মহুয়াতে যা লিশা হয়, ইঠোতে সিটা হলোনি।" গোমুখ্য সাঁওতালটা বুঝতেও পারেনি যে কি ভাবে জনৈক বাজারে গিয়ে সে বিশ্ব বাজারের কবলে পড়ে গেছে। কবলে অবশ্য অনেক শিক্ষিত কেষ্ট বিষ্টুরাও পড়েছে, স্রেফ পড়ার সময়ে তারা এতটাই মত্ত ছিল যে সেরকম ভাবে পড়াটা টের পায়নি। বাঁকুড়ায় একবার এক রিকশাওয়ালার সাথে বেদম বাওয়াল, ফেরার ভাড়া ১৫ টাকা চাইছে, এসেছি ১০ টাকাতে। মাথা ঠান্ডা রেখে জিজ্ঞেস করলাম যে দুপুর হতেই ৫ টাকা ভাড়া কেন বেশি চাইছে সে? জবাব এলো "গরমে খাটনি বেশি তাই খিদে লাগবে, খাবারের জন্য ৫ টাকা বেশি"! আমি বললাম যে আমিও খাবো আর তাকেও ক্যান্টিনে ভাত খাইয়ে দেবো তবে ভাড়া দেব ১০ টাকা! কিন্তু সে তাতে একেবারেই নারাজ। অনেক পিড়াপিড়ির পরে সে বলল সে ভাত খাবে না, সে ৫ টাকা extra চায়, তা দিয়ে সে হাঁড়িয়া খাবে। তাতে তার পেটে পেট ভরবে আর লিশায়ে লিশা হবে!

বাজার এক আজব কিসিমের ব্যাপার। বাজারী হলে সবাই কিনতে চায় আর না হলে বাঁচতে গেলে সেই বাজারে গিয়েই সব্বাইকে কিছু না কিছু বেচতে হয়। হয়ত কালকে বাজার এতটাই উঁচু হবে যে বাজারের সাথে সাথে ওরাও এ মাটি ছেড়ে ওই ওপরে উঠে যাবে। তখন ওপরে ওদের মেঘের রাজ্যে পসার মেলে দিন রাত বিক্রি-বাট্টা হবে। সব থেকে উঁচু মলটার থেকেও উঁচুতে কেনা বেচা যা আমরা কেউ দেখতে পাবো না। দেখতে পেলেও চোখ বন্ধ করে থাকব পাছে নিচের বাজারে ওপরওয়ালাদের নোংরা অভিশাপ লাগে। ওপর তলার বাজারবৃত্তির বিষ্ঠা ফেলা হলে তা মাধ্যাকর্ষণের দায়ে মুখমণ্ডলের আনাচে কানাচে ছিট ছিট করে লেগে থাকবে। বোধহয় কাজের দোহাই দিয়ে পেটের দায়ে আবার বাজারবৃত্তিতে বাজারের বৃত্ত পূর্ণ হবে!

“এমন দিনে তারে বলা যায়”

মধ্যমপুরুষ

জুলাই ৩, ২০১৪

নব্বই এর নিশ্চিন্দিপুর থেকে
দুহাজারি দশাশ্বমেধের দূরত্ব
প্রায় এক অতলান্তিক।

পাতাঝরা বিষণ্ণ ম্যাপল পাইনের বনে,
দিলখুশার খোঁজে যখন দুপুর ঘনায়,
বিকেলের সাথে অলরেডি ভেস্তে গেছে অ্যাপো।

গথিক পিলারগুলিতে
প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র অগ্রাহ্য করে
সাফল্যের আফটারগ্লো
তখনও ঈষৎ ভ্রাম্যমান,
শুধু খানিক কনফিউজড।

মনখারাপের ছাইপাঁশ
এবং কবিতার সিমবায়োসিস পুষ্ট
নিধিরাম সর্দারেরা
স্বস্তির নিশ্বাস আর পকেটে ডটপেন ফেলে
অজানার সন্ধানে বেরোয়
সেই মুহূর্তে।

এমন অলৌকিক সময় -
তুমিও কলেজ স্ট্রিট হয়ো,
সর্বজয়া।

ভক্তের ভগবান – পর্ব ১ – আর ডি বর্মন

পিব্যান্ডস

আগস্ট ১৫, ২০১৪

ভারতের জনসংখ্যা একশো তেইশ কোটি। তবে আমার ধারণা সংখ্যাটা বড়জোর নব্বই কোটি হবে। কারণ বাকি তেত্রিশ কোটি মানুষ তো নন, তাঁরা ভগবান। ইংরেজিতে যাঁদের আমরা সেলেবিলিটি, থুড়ি, সেলিব্রিটি বলে থাকি।

এই সমস্ত ভগবানের অগণিত ভক্তরা ছড়িয়ে আছে আমাদের আশেপাশেই। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের ভক্তি পড়ে উপচে। তা সত্ত্বেও 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ' কথাটা কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রে কিছুতেই খাটে না।

এমনই কিছু ভক্তের অতি ভক্তির কথাই আমি জানাতে চলেছি। প্রতি সপ্তাহে একটি করে ভক্ত-ভগবানের জুটি। দুবছর আগে, যখন সবে কলম ধরেছি, সেই সময় লেখা।

মিথ্যা নয়, সম্পূর্ণ সত্য পরিবেশিত হচ্ছে। পরিবেশনার খাতিরে একটু যা রঙিন করে নেওয়া।

আপনাদেরও সন্ধানে থাকলে জানাবেন কিন্তু।

ভগবান নং ১ : আর.ডি.বর্মন
ভক্ত : সৌরেন রায় (ছদ্মনাম)

রাহুল বর্মনের ভক্ত আমরা প্রত্যেকেই। ভারতীয় ছায়াছবির গানের জনপ্রিয়তাকে এই উচ্চাতায় বোধহয় আর কোনও সুরকারই তুলতে পারেননি। কিন্তু আমার বন্ধু সৌরেনের মতো পাগল ভক্ত আমি আর একজনও দেখিনি।

রাহুল দেব বর্মনের এমন কোনও সিডি এমন কোন ক্যাসেট এবং এলপি রেকর্ড নেই যেটা কিনা তার সংগ্রহে নেই। এমনকি কেউ (যেমন আশা ভোঁসলে, গুলজার) কোনও গানে পঞ্চমদার নামোল্লেখ করলেই সেটা আমার বন্ধু কিনে নেয়। সে তার স্বল্প আয় থেকে টাকা বাঁচিয়ে নিজের বাড়িতে আরডি বর্মনের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজো করার ধান্দায় রয়েছে। আপাতত ছবি দিয়ে কাজটা চালিয়ে যাচ্ছে।

কেউ কোথাও কখনও এই প্রবাদপ্রতিম সুরকারের নাম উচ্চারণ করলেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভাল করে বোঝার চেষ্টা করে যা বলা হচ্ছে সেটা তার গুরুদেবকে এক বিন্দুও অসম্মান করে বলা হচ্ছে কি না। দুর্গাপুজোর পঞ্চমীর দিনটা তার সবচেয়ে প্রিয়। ছেলে হয়নি বলে তার খুব দুঃখ। নিজের মেয়ের ডাক নাম রেখেছে পঞ্চমী। প্রিয় মিষ্টি চমচম। দোকানে গিয়ে বলে "ভাই, চারটে পনচম দাও"।

একদিন এক রবিবার ভোরে যখন নাক ডেকে ঘুমোচ্ছি, ও ফোন করল, "এখনও ঘুমোচ্ছিস? কাঁচা ঘুম ভাঙিয়েছি, বেশ করেছি। নে, এবার ওঠ, উঠে বারান্দায় গিয়ে বসে থাক। আজ আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে পঞ্চমদাকে নিয়ে লিখেছে। পড়েই আমাকে রিপোর্ট করবি কেমন লাগল।"

আর একদিন ওর বাড়ি গিয়ে ওর সংগ্রহ হাতে নিয়ে নিয়ে দেখছিলাম। সেখান থেকে আরডি বর্মনের একটা ফাংশানের গানের সিডি বেশ পছন্দ হওয়ায় সেটা আমাকে কপি করে দিতে বললাম। এতক্ষণ ও ঠোঁটের কোণে তৃপ্তিময় একটা হাসি ঝুলিয়ে মমতা আর সতর্কতা মেশানো দৃষ্টি দিয়ে আমার হাতে তুলে নেওয়া সিডির দিকে দেখছিল। আমার কথা শুনে এবার বিরক্ত হয়ে হাত থেকে ওটা নিয়ে বলল, "তুই গিয়ে সিম্ফনি থেকে একটা কিনে নে না। আমি অযথা গুরুদেবের গায়ে ঘষা লাগাই না। তাছাড়া গুরুর গানের কি নকল হয়! আসলটা কেন্।"

চায়ের দোকানে কোনও প্যাংলা খোকাকে দেখলেই সে বলে ওঠে, "দ্যাখ, ছেলেটার কী আরডিস্যার চেহারা!"

ফোন করে যদি বলি "তুই রেডি হ, আমি যাচ্ছি" তবে ও একটু নেকিয়ে বলে "যাঃ আমি আরডি হব কী রে? আমি তো গুরুদেবের শিষ্য মাত্র"...

গতবছর জামাইষষ্ঠীর দিন তার শাশুড়ি বললেন, "মাংসটা ভাল লেগেছে? আর দিই?" ও লজ্জায় গদগদ হয়ে বলল, "আরডিকে দেবেন কি করে, মা? আমাকে দিন, তাহলেই গুরুদেবের খাওয়া হবে।"

ফেরারী সময়

চিরন্তন

অক্টোবর ৪, ২০১৪

একটা লেখার রেফারেন্স খুঁজতে গিয়ে অনেক দিন বাদে পুরানো বাঁশ কাগজের মলাট দেয়া বইটা পেয়ে গেলেন শমিত। আবছা হয়ে যাওয়া লেবেলটাতে লেখা শমিত মুখার্জি, কক্ষ - 'ক', শ্রেণী - একাদশ, রাধারমণ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, বেড়াচাঁপা। মাঝখানটা অল্প উচু হয়ে আছে, অল্প হেসে মলাটে আলতো হাত বুলিয়ে খুলতেই খয়েরী কিছু পাপড়ি আর কালো কিছুটা গুড়ো হয়ে যাওয়া দুটো পাতা। দুএকটা গুড়ো এদিক ওদিক পড়তেই শমিত বন্ধ করে দেয় বইটা সাবধানে। যথাস্থানে রেখে আবার নিজের চেয়ারে এসে বসে পড়েন। একটা চেনা গন্ধ মনে পড়ে যায়।

আজকাল তিনি তাঁর ভালোলাগার কিছু অনুভূতি, যেমন গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, স্বাদ এগুলো আর ইন্দ্রিয়ে ধরতে পারেন না। না, তাঁর ইন্দ্রিয়, মস্তিকে পৌঁছে দেবার মাধ্যম, বা মস্তিক যা এই অনভূতিকে মনের ভালো বা খারাপ লাগায় রূপান্তরিত করে দেবে সেই সব যন্ত্রগুলো ঠিকভাবেই কাজ করছে। সময় শরীরকে কিছুটা কাবু করে দিলেও এই অংশকে সেরকম ভাবে আঘাত করতে পারেনি, বরং বেশী সতেজ হচ্ছে দিনে দিনে। আসলে এই ভালো লাগার গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ বা স্বাদ এগুলো আর ঘটে না, বা ঘটলেও তাঁর ইন্দ্রিয় অবধি পৌঁছয় না। যেমন জবাকুসুম তেল মাখা চুলের গন্ধ, বৃষ্টিতে ভেজা মাটির গন্ধ, যাতে আলাগা ধানের গন্ধ লেগে থাকত, তার বদলে লেগে থাকে পোড়া পেট্রোলের গন্ধ। ঢাকের শব্দ চেনা বোল বা ভাঁজ তিথি অনুযায়ী যা বদলে যেত আর শোনা যায় না। তার বদলে তাতে লেগে থাকে চটুল বাংলা বা হিন্দি গানের বোল, তার স্বাতন্ত্র্যটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনাগুলো ঘটলে শমিত স্মৃতি থেকে তার আনুষঙ্গিক অনুভূতিগুলি মনে করে নেন, তাই তিনি গন্ধ পান না, শব্দ শোনেন না, স্পর্শ অনুভব করেন না। বরং তিনি এগুলো মনে করে নেন প্রয়োজন মতো।

বেড়াচাঁপা, বারাসাত মহকুমা শহর থেকে কুড়ি পঁচিশ মাইল দূরে গড়ে ওঠা এক আধা গ্রাম আধা শহর। কিছু গেলেই ইছামতী, ওপারে পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ। এই জনপদ মানুষের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে বা বলা যায় মানুষ গড়ে তুলেছে। আদি অনন্ত কাল থেকে মানুষ সেখানেই বাস করেছে যেখানে প্রাথমিক ভাবে অল্প আয়াসে খাদ্য পেয়ছে আর পেয়েছে নিরাপত্তা তার সম্পদের, সত্তার ,পরিজনের আর উত্তরাধিকারের। এর অভাব ঘটলে সে প্রথমে প্রতিরোধ করেছে সাধ্য দিয়ে, আর পরাস্ত হলে নতুন বাসযোগ্য ভূমি খুঁজে নিয়েছে। আস্তে আস্তে সে নিজের সত্তা কে মিলিয়ে দিয়েছে নতুন ভূমির সাথে, অভিযোজিত হয়েছে সময়ের সাথে। নিরন্তর গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যে দিয়ে সে ভূমিকে আপন করেছে বা ভূমি তাকে আত্মস্থ করেছে অনায়াসে। উত্তরাধিকার পরিচিত হয়েছে ভূমিপুত্র বলে, ভূমির ওপর নিজের অধিকার দাখিল করেছে অনায়াসে, আর স্মৃতির অতলে এক কোণে জায়গা করে নিয়েছে তার আদি ভূমি, তার উৎপত্তির উৎসমুখ।

পেনটা রেখে শমিত মনে পড়া গন্ধটাকে উপভোগ করেন কিছুক্ষণ, আর বইয়ের খাঁজে আটকে যাওয়া সময়কে খুজে নেন স্মৃতি থেকে। এই ফুল ও তল্লাটে কেবল ফোটাতে পারতেন সইদুল চাচা। সবাই বলত তাঁর হাতে নাকি জাদু আছে। যেমন তার গঠন, তেমনি তার সুবাস। সেই ফুল ছিল সবার ঈপ্সিত। কিন্তু ধর্মপ্রাণ সইদুল চাচার আমরণ পণ ছিল, তিনি কোনদিন এ ফুল মানুষের ব্যাবহারের জন্য দেননি। বলতেন মানুষের হাতে দিলে এ ফুলের মাধুর্য নষ্ট হয়ে যাবে, এ সৃষ্টি যার তাঁর সাজেই এ মানায়। তিনি নিয়মিত ফুল পাঠিয়ে দিতেন মাজারে বিনা পারিশ্রমিকে। আর দিতেন কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে নিজের হাতে। এক অদ্ভুত মানুষ ছিলেন এই চাচা। গভীর জীবনবোধ ছিল তাঁর, বাবার সাথে বসে অনায়াসে গীতা ও কোরানের তাত্ত্বিক দিক আলোচনা করতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। উভয় ধর্মগ্রন্থের মিল আর মানুষের জীবনে তার ব্যাবহারিক প্রয়োগ এই থাকতো তাঁদের আলোচনার বিষয়। শমিত বেশিরভাগই বুঝতে পারতেন না, কিন্তু শুনতে ভালো লাগত। চাচার কোলে, পরের দিকে পাশে বসে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যেতেন তাঁদের আলোচনা। এই আলোচনাই তাঁর জীবনবোধ কে গড়ে দিয়েছিল, আজও নিরন্তর তিনি সেই বোধের সাথে নিজের জীবনকে মিলিয়ে চলেছেন, জীবনের দাবি কে মাপতোল করেছেন এরই নিক্তিতে।

এই গোলাপ তিনি পেয়েছিলেন সইদুল চাচার আর এক সৃষ্টি আফরিনের কাছ থেকে। সইদুল চাচা মুক্তিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁর কাছে নারী পুরুষ কোনও ভেদ ছিল না। এ পৃথিবীর সকল মানুষ তাঁর কাছে সেই অনন্তের প্রতিচ্ছবি মাত্র, এই ছিল তার বিশ্বাস, আর তিনি তা পালন করতেন নিজের জীবন দিয়ে। সেই জন্য আফরিন আর শমিতের মধ্যে মেলামেশায় কোনও বাধা ছিল না, তারা বেড়ে উঠেছিল পাশাপাশি আর পিঠোপিঠি। আম পাড়তে সে গাছে উঠলে আফরিন ফ্রক বাড়িয়ে দিয়েছে নিচে, সে ঘুড়ি উড়িয়েছে তো আফরিন লাটাই। আশেপাশে সেরকম জনবসতি না থাকার জন্য তারা নিজেদেরকে আরও বেশি করে আপন করে নিয়েছে, নিবিড় হয়েছে, একে অন্যের ওপর নির্ভর করেছে, করেছে বিশ্বাস।

কৈশোর থেকে যৌবনে পা রাখার সন্ধিক্ষণে উত্তরণের সময় কাল বড়ই অস্থির। অল্প আঘাত বেশি করে লাগে, আবেগ হয় বল্গাহীন,কল্পনা হয় অসীম, স্বপ্ন হয় দুর্বার, ইচ্ছে থাকে স্বাধীন। যা গোপনীয় তা নিজেকে প্রকাশ করতে চায় আরও বেশি করে করতে চায় এ সময়। আর সে গোপনীয়তা যদি একদম কাছের মানুষকে নিয়ে হয় তবে তা নিজেকে অস্থির, অবুঝ করে তোলে। নিজের বিশ্বাস, বোধ, ন্যায়, অন্যায়, সমাজ, নিষেধ, যাবতীয় বিচার-বুদ্ধিকে একেবারে শিকড় ধরে উপড়ে ফেলে সেই ইচ্ছে, আর মনকে টেনে নিয়ে চলে প্রকাশের দিকে। বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

এই জনপদ, যেখানকার মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রাণপাত করে, সেখানে সারস্বত চর্চার প্রতি দরদ খুবই কম আর তার প্রয়োজনীয়তাও কিছু কম জীবিকার নিরিখে। মানুষ পুঁথিগত বিদ্যার থেকে বেশি জোর দিয়েছে লৌকিক বিদ্যায়। যে বিদ্যা তাকে অনুর্বর জমিকে উর্বর করতে শিখিয়েছে, সময়ের সাথে সাথে তার চরিত্র বদলানোর খোঁজ দিয়েছে বা বুঝে নিতে শিখিয়েছে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টির খবর। আর তার সাথে সে পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে অগ্রজদের থেকে পাওয়া কিছু কথা কাহিনী আর গল্প। এই কাহিনী বা গল্প মানুষের জীবনের গল্প যা যুগে যুগে

তাকে ধারণ করেছে, উত্তর দিতে চেয়েছে, বা পেতে চেয়েছে মানুষ কিভাবে আসে যায়, কেনই বা তার আসা, যাওয়া বা থাকা। এখানে মিলেমিশে আছে বেদ, কোরান, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, আরব্যরজনী, লালন, মন্দির, মসজিদ, মাজার। আছেন কৃষ্ণ, শিব, বুদ্ধ, লালন, কবির, তুলসীদাস, সতী মা, আউলচন্দ্র, সিরাজ শা, গৌর-নিতাই, হাড়িরাম। সহাবস্থান করছে নানা আচার পুজো, মানত, দণ্ডি, সিন্নি, উপোস, রান্না পূজা, চারিচন্দ্র ভেদ, নামগান, কীর্তন। কালের ঘূর্ণি পাক যেন সবাইকে এক জায়গায় ঘনীভূত করেছে, আবার উৎসারিত করেছে বিচিত্র ধারামুখে, যা মানুষকে শিখিয়েছে কাল কে জয় করতে, আশ্রয় দিয়েছে, অধিকার দিয়েছে।

ছাত্র হিসেবে শমিত বেশ ভালই ছিল। বাড়ির পরিবেশ বা শিক্ষা চর্চা তাকে বরাবরই অন্যদের থেকে এগিয়ে রেখেছে আর তার সাথে যোগ হয়েছিল পাঠ্য বই এর বাইরে নানা বিষয় নিয়ে আগ্রহ যা তাকে এগিয়ে দিয়েছে অন্যের থেকে। কেবল বেড়াচাঁপার গণ্ডীতে নয়, এর সুফল সে লাভ করেছে মহানগরের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে। স্কুলের পাঠ শেষ করে সে মহানগরে পাড়ি দেবে এটা পূর্বনির্ধারিত ছিল। সমস্ত আয়োজন চলছিল, আফরিন ও মায়ের সাথে হাত লাগিয়েছিল যাতে তার কোনও অসুবিধা না হয় নতুন শহরের পরিবেশে মানিয়ে নিতে। সব ঠিক হলেও শমিতের মনের ভেতরে এক অদ্ভুত অস্বস্তি কাজ করে চলেছিল। আফরিনের এই আপাত কাজ পাগলামি, তার প্রতি অদ্ভুত উদাসীনতা বা অদ্ভুত চাউনি তাকে অস্থির করে তোলে, যেন একটা অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর গড়ে তুলতে চাইছিল সে।

কিশোরী মনের আচরণ খুব অদ্ভুত। কাঁচা মন যখন কিছু গ্রহণ করে তখন তার ছাপ হয় সুদূরপ্রসারী। ধেয়ে চলে নিরন্তর এক অদ্ভুত অজানার আকর্ষণে, পূর্ণতার খোঁজে। শরীর মন এমন কি আপন সত্তাকে অনায়াসে মিশিয়ে দিতে চায় প্রিয়তমের সাথে। আপনাকে ত্যাগ করে বারেবার খুঁজে চলে নিজেকে প্রিয়তমের চোখে, তার জাগরণ নিদ্রায় মিশে থাকতে চায়, সমর্পণ করে নির্দ্বিধায়, জেগে থাকতে চায় তার মননে। বিচ্ছেদ বিরহ অভিমান অপমান লাঞ্ছনা অবহেলা তার এই সমর্পণের ইচ্ছাকে আরও বলশালী করে। তীব্র গতিবেগে সব বাধা পার করে সে এগিয়ে চলে মোহনার দিকে, আস্তে আস্তে সে বালিকা থেকে নারীত্বে অভিষিক্ত হয়।

ঠিক যাবার আগের দিনে রাতের খাবার একটু তাড়াতাড়ি শেষ করতে হয়েছিল। চারিদিকে একটা গুমোট গরম। শমিতের কিছুতেই ঘুম আসছিল না। দরজা জানলা খোলা ছিল নিয়ম মতো, কিন্ত বাতাস যেন স্থির হয়ে ছিল। অতীত আর ভবিষ্যৎ এর এই সন্ধিক্ষণে হাজারো সম্ভবনা আর হাজারো কৌতূহল ভিড় করে আসছিল। আর ভেসে উঠছিল এক নারী মুখ, যার ব্যবহার তাকে কেবল পীড়া দেয় নি, এক অদ্ভুত মানসিক টানাপড়েনে ফেলে দিয়েছিল। আজ একান্তে সে কিছু কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু সে সুযোগ সে পায়নি, সে সুযোগ তাকে ভিক্ষা দেয় নি আফরিন সারাদিনে। চিন্তা এক আবেশ তৈরি করে দিয়েছিল, সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, অবশ হয়ে গিয়েছিল। হুঁশ ফিরেছিল পায়ের আলতো শব্দে, উঠে বসেছিল, চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল এক চেনা অবয়ব। অনেক অভিমান একসাথে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল কথা হয়ে, কিন্তু তার সমস্ত চেতনা যেন রুদ্ধ করে দিয়েছিল অবয়বের হাতে ধরা লাল গোলাপ। আফরিন আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে এসেছিল, প্রতি পদক্ষেপে যেত অতিক্রম করছিলো হাজারো নিষেধ, বাধা, সমাজ, সংস্কারকে। শমিত তার হৃদয় থেকে উৎসারিত শব্দে স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েছিল দেওয়াল

ভাঙার। সে গ্রহণ করেছিল সেই লাল গোলাপকে আর তার মধ্যে দিয়ে সে হয়ে যাওয়া নারী কে। অনেকক্ষণ ধরে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে ছিল স্থির হয়ে। শব্দবিহীন এই সংলাপের মাধ্যম দিয়ে পুরুষ প্রকৃতিতে আর প্রকৃতি পুরুষে স্থাপিত হয়েছিল, একে অপরকে গ্রহণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিল।

শমিতের চোখের সামনে দিয়ে দ্রুত চলে যায় অনেকটা সময়। তার কলেজ, বন্ধু, কলকাতার রাস্তা, ছাত্র আন্দোলন, গল্প, কবিতা, বইমেলা, ছাত্র পড়ানো, আফরিনের কলকাতা আসা, দিলখুসা বা কফি হাউসের আড্ডা, দুজনে হাত ধরে গ্লোব বা মেট্রোতে সিনেমা দেখা, নিউ মার্কেট, ময়দান, বাবুঘাটের সূর্যাস্ত, গঙ্গা পেরিয়ে মঠে যাওয়া, বিদেশে পড়তে যাওয়া, আবার বিচ্ছেদ, আবার ফেরা, প্রথম চাকরী, প্রথম কেনা উপহার... আরও কত কি। ছবিগুলো ছায়া হয়ে গেলেও একে একে আসে, আবার যায়, ফিরে ফিরে আসে অনেক রূপে, অনেক ভাবে, আলাদা আলাদা প্রেক্ষিতে। সম্বিত ফেরে কলিংবেলের মৃদু আওয়াজে। গলা তুলে বলেন "সুধা একবার দেখবে নাকি কে এলো এই অবেলায়?" সুধা নাম তাঁরই দেওয়া। তিনি এই নামেই স্ত্রীকে ডাকেন। পেনটা হাতে তুলে নেন অভ্যাসে।

কিছু সময় বাদে কানে এসে লাগে নূপুরের রিনরিনে শব্দ, এ তাঁর চেনা বহু পুরনো শব্দ, বুঝতে পারেন সেটা তাঁর ঘরের দিকেই আসছে। সোজা হয়ে বসে চোখে তুলে নেন চশমাটা। সুধা একটা প্যাকেট হাতে দিয়ে বলে ছেলে পাঠিয়েছে আমার আর তোমার জন্য পুজোতে। শমিত হাত বোলান হাতে লেখা ঠিকানার ওপর যত্নে – "আফরিন মুখার্জি, প্রযত্নে : শমিত মুখার্জি, ১২/১, কলকাতা: ৭০০০১২"। কাঁধের ওপর অনুভব করেন বহু চেনা এক কাঙ্ক্ষিত স্পর্শ।

কালঘুর্নি

আমরা সবাই

আগস্ট ৪, ২০১৪

[বারোয়ারী গল্প চর্যাপদের এক অভিনব উদ্যোগ। অনেকে মিলে একটা গল্প লেখা হবে, এই ছিল প্রস্তাব। একেকজন একেকটি পরিচ্ছেদ লিখবেন, এভাবে এগিয়ে চলবে গল্প। প্রথম বারোয়ারী গল্প 'কাল-ঘুর্নি' একটি রহস্য গল্প। মজার ব্যাপার হল বারোয়ারী গল্পে লেখকদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার সুযোগ নেই। তাই একজন লেখক কিভাবে রহস্য ফাঁদলেন, তা অন্যদের কাছে রয়ে যায় অজানা। লেখকদের কাজ তাই শুধু লেখাই নয়, পূর্ববর্তী লেখকদের রহস্যের জট ছাড়ানোও। এই কঠিন কাজে তাঁরা কতটা সফল সে বিচার পাঠকরাই করবেন। 'কাল-ঘুর্নি' লিখেছেন সত্র্যজিত, হযবরল, পাগলা দাশু, তুষার সেনগুপ্ত, দুর্বার, হস্তিমূর্খ, প্রত্যয় এবং পিব্যান্ডস।]

প্রথম পরিচ্ছেদ

(সত্র্যজিত)

সকালে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। সারাদিন রোদের দেখা নেই। অবশ্য শ্রাবণ মাসের শুরুর দিকে এমনটা বিচিত্র কিছু নয়। পূর্বদিকের ঘোলাটে আকাশে কালচে ভাব ধরতে আরম্ভ করেছে সবে। রোজকার মত আজও দানীবুড়ো বসেছিল দত্ত পুকুরের ধারে। যতই ঝড়-বৃষ্টি হোক না কেন, বুড়োর খানিকক্ষণ পুকুরধারে এসে বসা চাই। শর্মিষ্ঠা একবার জানতে চেয়েছিল,

- "আচ্ছা দাদু, তুমি রোজ পুকুরের ধারে যাও?"

- "রোজ আর কই যেতে পারি দিদিভাই, হাজারটা কাজ। মায়ার বাঁধনে আটকে আছি যে।"

- "কি যে তোমার কাজ। খালি তো দুবেলা মন্দিরের ঠাকুরকে ফুল জল দাও।"

- "ও তো ফরমায়েশী পুজো। আসল পুজো ওই পুকুরধারে, বুঝলে দিদিভাই।"

- "কে জানে বাবা। ওই পুকুর ধারে যেতেই আমার ভীষণ ভয় করে। কী কালো জল। আচ্ছা দাদু, পুকুরটার বয়েস তোমার থেকেও বেশী?"

- "তা বেশী বই কি। আমার বাবার কাছে আমি ওই পুকুরের গল্প শুনেছি। তোমার ঠাকুরদার বাবা যখন এ তল্লাটের জমিদার ছিলেন, তখন উনি এই পুকুর আর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে ধর প্রায় একশ বছর আগের কথা।"

- "তুমি তো এখন চোখেও ভালো দেখতে পাও না। পুকুরধার থেকে অন্ধকারে ফিরতে অসুবিধা হয় না?"

- "কালু আছে না। ওই আমাকে রোজ নিয়ে আসে।"

- "আবার তুমি ওকে কালু বলে ডাকছ" ঝাঁঝিয়ে ওঠে শর্মিষ্ঠা, "বলেছি না কেতু বলে ডাকবে। কালু শুনলেই কেমন যেন কুকুরের নাম বলে মনে হয়!"

- "সে তোর সাথে যখন বিয়ে হবে, তুই ডাকিস।"
- "যাও তোমার খালি উল্টোপাল্টা কথা। ইশ অনেক বেলা হয়ে গেল, আমি এখন যাই।"

পুকুরের ধারে বসে সাতপাঁচ ভাবছিল বুড়ো। শর্মির বিয়ের বয়েস হয়ে এলো। সেই ছোট্ট থেকে ও আর কালকেতু বুড়োর বড় ন্যাওটা। কালকেতু দানীর নাতি। কালকেতুর যখন বছর দশেক বয়েস তখন বাস এক্সিডেন্ট হয়ে ওর মা এবং বাবা দুজনেই মারা যায়। শর্মি কেতুর থেকে বছর তিনেকের ছোট। একসাথে বড় হয়েছে ওরা। এখন ওদের চারহাত এক করে দিতে পারলে... এই পর্যন্ত ভেবেই আর এগুতে সাহস করে না দানী। সে জানে, শর্মির বাবা, অবসর প্রাপ্ত আর্মি মেজর নির্মলেন্দু দত্ত চৌধুরী কিছুতেই এ সম্পর্ক মেনে নেবেন না। দানী অনেকবার কালকেতু কে বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। তার এক কথা। বিয়ে করলে শর্মিকেই করব, নয়তো নয়। মাবাবা মরা ছেলেটার জীবনে ওই মেয়েটার ভূমিকা অনেকখানি।

- "সবই রাধামাধবের ইচ্ছা", আপন মনে বলে বুড়ো।
- "দাদু, চল অন্ধকার হয়ে গেছে। তোমার সন্ধ্যারতির সময় হলো।"
- "তুই কখন এলি বাবা, দেখতে পেলাম না তো।"
- "দিনের বেলাতেই দেখতে পাও না, এখন তো অন্ধকার প্রায়। এসো, এইদিক দিয়ে।"

দত্তপুকুর থেকে চৌধুরী বাড়ি সিকি মাইল মত রাস্তা। বাড়ির চৌহদ্দির পাশেই চৌধুরীদের কুলদেবতা রাধামাধবের মন্দির। দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার, প্রতাপ নারায়ণ অনেক খরচা করে এই মন্দির তৈরী করেছিলেন। প্রায় দোতলা সমান উচ্চতা, বাইরের চারদিকের দেয়ালে টেরাকোটার কাজ। প্রতাপ নারায়ণ বিষ্ণুপুর থেকে এক শিল্পী কে নিয়ে এসেছিলেন এই কাজ করার জন্য। মন্দিরের সামনে একটা ফুলের বাগান। তার মধ্যে দিয়ে লাল মোরাম বিছানো রাস্তা চলে গেছে মন্দিরের দরজা অবধি। ভেতরে কষ্টিপাথরে তৈরী রত্নখচিত রাধামাধবের যুগল মূর্তি। আর দুদিন পরেই ঝুলন পূর্নিমা। আজ সকালে চৌধুরীদের সিন্দুক থেকে সব গয়না নিয়ে এসে সাজানো হয়েছে মূর্তি দুটিকে। তাই মন্দির এখন বাইরের লোকেদের জন্য বন্ধ। রাস্তার পাশে পাশে কয়েকটা সিমেন্টের বেদী তৈরী করে দিয়েছেন নির্মলেন্দু। তারই একটায় দানীবুড়োকে বসালো কালকেতু।

- "আমি ভেতর বাড়ি থেকে চাবি নিয়ে আসছি। তুমি উঠে কোথাও যেওনা।"
- "আমি পুরো অন্ধ নই রে কালু।"
- "না তাও। শর্মি গোলাপের চারা লাগিয়েছে। অসাবধানে যদি মাড়িয়ে ফেলো, আমার মাথা খেয়ে ফেলবে।"

আপনমনে হাসে দানী। আস্তে আস্তে কালকেতুর পায়ের শব্দ দূরে সরে যায়। আজকাল অল্পতেই খুব ক্লান্ত লাগে দানীবুড়োর। পেছনে হেলান দিয়ে নিকষকালো আকাশে মন্দিরের চূড়া খোঁজার চেষ্টা করে সে। চৌধুরী বাড়ির অবস্থা এখন পড়তির দিকে। কতদিন টিকবে বলা মুশকিল। অবসর নেওয়ার পরে জমিদারী ঠাট-বাট বজায় রাখতে গিয়ে অর্ধেন্দু একে একে সবই প্রায় হারিয়েছেন। থাকার মধ্যে এই বাস্তুভিটে, পুকুর আর মন্দির। এও কতদিন থাকে সে কথা স্বয়ং রাধামাধবই জানেন। বাগানের গেট থেকে চুঁইয়ে আসা আবছা হলদে হ্যালোজেনের

আলোর দিকে তাকিয়ে কালকেতুর অপেক্ষা করতে থাকে দানী। আশেপাশে কোথাও একটা শঙ্খ বেজে ওঠে। আচমকা নিজের পেছনে কোনো একজনের উপস্থিতি অনুভব করে বুড়ো। ঘাড় ঘোরাতে যাবার আগেই মাথার পেছনে মোক্ষম এক আঘাত। হুমড়ি খেয়ে পাশের গোলাপের চারাগুলোর ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ল সে। "হায়, রাধামাধব", অস্ফুট কাতরোক্তি বেরিয়ে এলো বুড়োর গলা দিয়ে। আস্তে আস্তে হলদে হ্যালোজেনের আলো ফিকে হতে হতে একেবারে মুছে গেল দানীর চোখের সামনে থেকে।

***

রবিবারের সকাল। প্রাত্যহিক শরীরচর্চা সেরে গোয়েন্দা জটিলেশ্বর সেন বাড়ির বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজের পাতায় চোখ রেখেছে সবে। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত হল লালবাজারের সহকারী পুলিশ কমিশনার এবং জটিলের স্কুলের সহপাঠী সরোজ ঘোষাল।

- "আয় সরোজ। চা খাবি তো?"
- "আর চা, ওপরওয়ালাদের খপ্পরে পরে লাইফ হেল হয়ে গেল মাইরি!"
- "কৃষ্ণনগরের কেসটার কথা বলছিস?"

কথার খেই হারিয়ে ফেলে সরোজ। ভ্যাবাচাকা খেয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে হালকা হেসে জটিল বলে,

- "গত দু'দিন ধরে এই খবরটা দেখছি কাগজে। সেখানেই দেখলাম লোকাল থানা থেকে লালবাজারের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। আর তোর ওপরওয়ালা সূর্যকান্ত এবং নির্মলেন্দু দত্ত চৌধুরী আর্মিতে একই ব্যাটেলিয়নে ছিলেন, জানিস নিশ্চয়। এছাড়া আজ রবিবার, সাতসকালে দাড়িটা পর্যন্ত ঠিক করে না কামিয়ে, তোর আমার কাছে ছুটে আসার কারণ আন্দাজ করাটা খুব কঠিন কাজ কিছু নয়।"

ব্যাখ্যা শুনে একটু ধাতস্থ হল সরোজ। পকেট থেকে রুমাল বের করে অকারণে মুখটা মুছে বলল,

- "খুব মুশকিলে পড়ে গেছি ভাই। পরশু রাতে কমিশনার ডেকে আমাকে কেসটা দিয়ে বললেন দিন সাতেকের মধ্যে আসামী কে পাকড়াও করা চাই। নইলে এবার পুরুলিয়ায় আমার বদলী কেউ আটকাতে পারবে না।"
- "অত উত্তেজিত হোস না। স্পটে গেছিলিস?"
- "গতকাল রাতে ফিরেছি। জায়গাটা কৃষ্ণনগরের কাছে ঘূর্ণি বলে একটা আধা শহর। কলকাতা থেকে ঘন্টা দুয়েকের রাস্তা।"
- "পুরো ঘটনাটা প্রথম থেকে আর একবার বল।"

জবাবে সরোজ যা বলল তার সারমর্ম এই। চৌধুরীরা আগে ঘুর্নির জমিদার ছিলেন। জমিদারী প্রথা লোপ পাওয়ার পরেও বংশের চাকচিক্য বজায় রেখেছিলেন বিলক্ষণ। বর্তমানে বাড়ির কর্তা অর্ধেন্দু। বয়েস প্রায় আশির কোঠায়। লন্ডন থেকে ওকালতি পাশ করে এসে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করতেন এককালে। স্ত্রী গত হয়েছেন বছর দশেক আগে। দুই ছেলে। নির্মলেন্দু আর কৃষ্ণেন্দু। নির্মলেন্দু আর্মিতে ছিল। রিটায়ার করার পরে কলকাতায় একটা

সিকিউরিটি সংস্থার আধা অংশীদার। নির্মলেন্দুর স্ত্রীর নাম তাপসী। তিনি হাউস-ওয়াইফ। ইনাদের এক মেয়ে, শর্মিষ্ঠা। সে যাদবপুরে ইতিহাসে মাস্টার্স করছে। কৃষ্ণেন্দু পেশায় ডাক্তার। অনেক বছর ধরে দিল্লির বাসিন্দা। স্ত্রী মনিকা ইন্টেরিয়র ডিসাইনার। এঁদেরও একটি মেয়ে, ফুল্লরা। সে দিল্লির জেএনউ তে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশুনো করছে। শর্মিষ্ঠা আর ফুল্লরা প্রায় পিঠোপিঠি। চৌধুরীদের বাড়িতে এখনো বেশ জাঁকজমক করে জন্মাষ্টমী ও ঝুলন পূর্নিমা উদযাপন করা হয়। সেই সুত্রে হপ্তাখানেক আগে সবাই জমায়েত হয়েছিলেন ঘুর্নিতে। চৌধুরী বাড়ির কুলপুরোহিত ছিলেন দীননাথ চক্রবর্তী ওরফে দানীবুড়ো। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলা মাথার পেছনে প্রচন্ড আঘাতের কারণে মন্দিরের সামনে দানীর মৃত্যু হয়। পরে দেখা যায় মন্দির থেকে রাধামাধবের মূর্তিও উধাও। দুদিন পরেই জন্মাষ্টমী, তাই সেদিন সকালে বাড়ির মেয়েরা মিলে সমস্ত গয়নায় সাজিয়েছিল যুগলমূর্তি।

- "বাড়ির চাকর বাকর কেউ আছে?"
- "অক্ষয় বলে একটি ছেলে আছে। সে অর্ধেন্দুবাবুর সেক্রেটারি। বছর দশেক হল আছে। চৌধুরী বাড়ির মধ্যেই তাকে দুটো ঘর দিয়েছেন অর্ধেন্দু। বয়স ৩৫ মত। তার বৌ শ্যামলী অর্ধেন্দু বাবুর রান্নাবান্না করে। এদের ছেলে নীলাঞ্জন স্থানীয় স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ে। এছাড়া উড়িয়া মালী আছে একজন, নাম অমরনাথ। ড্রাইভার শ্যামাচরণ আর ঝি কমলি। সকলেই গত কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে চৌধুরী বাড়ির সাথে যুক্ত।"
- "কালকেতু কী করে?"
- "ওর একটা ইলেকট্রিকের দোকান আছে বাজারে। ২৬-২৭ বছর বয়েস। ওর ছোটবেলায় গাড়ি দুর্ঘটনায় মা-বাবা মারা যায়। এককালে কলকাতায় ফার্স্ট ডিভিশনে ফুটবল খেলত। হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়াতে অকালে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। শ্যামলীকে জেরা করতে গিয়ে জানলাম শর্মিষ্ঠা আর কালকেতু একে অপরকে পছন্দ করত। কিন্তু চৌধুরী বাড়ির লোকেদের এ সম্পর্কে ঘোরতর আপত্তি।"
- "সেকি, ফুল্লরা থাকতে কালকেতু শর্মিষ্ঠাকে পছন্দ করলো শেষে!" রহস্যময় হাসি জটিলের মুখে।
- "মানে?" নির্বাক বিস্ময়ে তাকায় সরোজ।
- "চন্ডীমঙ্গল মনে আছে? কালকেতু ধর্মকেতুর ছেলে। বর্ণিত আছে দেবী চন্ডীর বর পেয়ে গুজরাট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল সে। ফুল্লরা সেই কালকেতুর স্ত্রী ছিল।"
- "তার সাথে এই ঘটনার কি সম্পর্ক?"
- "কোনো সম্পর্ক নেই, আবার থাকতেও পারে। সেটা না গেলে বোঝা যাবে না। তুই গাড়ি এনেছিস নিশ্চয়। চল বেড়িয়ে পড়ি। একটার মধ্যে পৌছে যাব।"
- "তুই আমাকে বাঁচালি ভাই, কী বলে যে..."
- "তোর কাছে পোস্টমর্টেম এর কপি আর জেরার কাগজ পত্রগুলো আছে নিশ্চয়। গাড়িতে যেতে যেতে একবার দেখে নেব।"

উঠে পড়ে জটিল। মিনিট পনেরর মধ্যেই দুই বন্ধু রওনা হয়ে যায় ঘুর্নির উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
(হযবরল)

রবিবার শহরের ভেতরটা একটু ফাঁকা, তাই ওরা খুব তাড়াতাড়িই NH-৩৪ ধরে ফেলল। হাইওয়েতে পড়েই ওদের গাড়ি ছুটতে লাগলো সোজা ঘুর্নির উদ্দেশ্যে। জটিলেশ্বর অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট আর বাকি কেসের কাগজ পত্র গুলো দেখছিল। কল্যানী পেরোতেই গাড়ির গতি খানিকটা মন্থর হতেই একটু চিন্তিত হয়েই জটিলেশ্বর বলল, "হুমম, রাস্তার যা অবস্থা তাতে পৌঁছতে ঘন্টা তিনেক লেগে যাবে।" সরোজ বলল "হ্যাঁ তা লাগবে বটে, তুই চিন্তা করিস না, মাঝে ধাবা টাবা দেখে কোথাও একটা লাঞ্চ সেরে নেব খন।"

"আমি খাওয়ার চিন্তা করছি না। সাধারণত যখন ক্রাইম স্পটে পৌঁছতে দেরী হয় তখন প্রমাণ লোপাট করার সুযোগটাও অপরাধীরা বেশি করে পেয়ে যায়। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট দেখে তো মনে হচ্ছে হামলাটা পূর্ব পরিকল্পিত আর যে কোনো পরিকল্পনাই ঘটনাস্থলের আসে পাশে অনেকগুলো ক্লু তৈরী করে।"

"খুনির জুতোর ছাপ কিম্বা ছিটকে যাওয়া রক্তের দাগ বলছিস তো?"

"সেগুলো তো মৌলিক, কিন্তু ধর ওই বৃদ্ধ পুরোহিত দেখতে পেয়েছিল যে কে তাকে আঘাত করেছে ও সে হয়ত মরার আগে মাটিতে কোনরকম আঁচর কেটে তদন্তকারীদের জন্য তার খুনির উদ্দ্যেশ্যে কোনো ক্লু রেখে গেল! আর আমরা সেখানে পৌঁছবার আগেই সেখানে বৃষ্টি হলো বা খুনি সেটা খেয়াল করতে পেরে সেটা সবার নজর বাঁচিয়ে মুছে দিল। ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে কি?"

"একটু কষ্ট হচ্ছে বৈকি। কোনদিন এরকম ক্লু কেউ দেয় নি ভায়া। আর লালবাজার বা ভবানী ভবনের কোনো কেসে এরকম হয়েছে, তা শুনেছি বলেও মনে পড়ছে না। সাধে সকাল সকাল পড়িমরি করে তোর কাছে ছুটে আসি!"

"হাঃ হাঃ হাঃ। চল গাড়ি থামাতে বল, সামনে একটা ভালো ধাবা আছে, বেড়ে লস্যি করে।"

গাড়ি লাকি সিংহের 'ওয়েলকাম ধাবায়' দাঁড়ালো। রোববারের দুপুরের খাওয়া এত সাত সকালে বাঙালিরা খায় না। তাই এ ক্ষেত্রে জটিলের উপদেশ মেনে ব্রাঞ্চ-এর মতন ওরা সকলে আচার সহযোগে আলু পরোটা, পনির ভুর্জি ও লস্যি দিয়ে কোনরকমে দক্ষিন হস্তের কম্মটি সারলো। খাওয়ার শেষে সরোজকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে জটিল জিগ্যেস করলো "হ্যাঁ রে জেরাতে যা দেখা যাচ্ছে তাতে অর্ধেন্দু বাবুর পসার বেশ ভালো ছিল বলেই তো মনে হলো?"

"হ্যাঁ মানে বেশ নামকরা ব্যারিস্টার ছিলেন বলেই খবর পেয়েছি, আর তা ছাড়া এত বড় জমিদারী মেইনটেইন করতেন যখন অর্থনৈতিক একটা জোর ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।"

"জোর ছিল! মানে ইদানিং নেই সেটা বলছিস কি?"

"নাঃ সেরকম কোনো আভাস তো পাইনি। তবে বছর দুয়েক আগে নির্মলেন্দুর সাথে তার বাবার অর্থাত অর্ধেন্দুর ওর সিকিউরিটির ব্যবসা নিয়ে একবার একটা কথা কাটাকাটি হয়েছিল।"

"ওঃ, সেটা কে জানালো? জেরা গুলোতে তো এরকম কিছু দেখলাম না?"

"হ্যাঁ সেটা তোকে জানাতাম, মাথা থেকে জাস্ট বেরিয়ে গেছিল। ওটা অফিসিয়ালি রেকর্ড করা হয়নি কেননা ওটা যে জানিয়েছিল সে এই শর্তেই তা জানায়।"

"কে সে?"

"অক্ষয়, মানে ওই অর্ধেন্দু বাবুর সেক্রেটারি ছেলেটি। ও একদিন মাঝ রাতে অর্ধেন্দু বাবুর ঘর থেকে উঁচু গলায় কথা বার্তা শুনতে পেয়ে চুপি চুপি সেখানে গিয়ে আড়ালে কান পাতে। ও তাতে ও আন্দাজ করে যে টাকা পয়সা সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে বাপ বেটাতে উত্তেজিত কথা বার্তা হচ্ছে।"

"হুমম, কি শুনতে পেল সে?"

"ওর বক্তব্য হলো যে ও যখন পৌঁছয় তখন কথা বার্তা প্রায় শেষের দিকে। তবে ও এইটুকু শুনতে পায় অর্ধেন্দুবাবু তার ছেলেকে জোর গলায় বলছিলেন যে উনি নির্মলেন্দুর ব্যবসার ক্ষেত্রে আর কোনো অর্থনৈতিক সাহায্য করবেন না। মদ্যপ অবস্থায় নির্মলেন্দু তার উত্তরে শুধু অসংলগ্ন ভাবে বিড়বিড় করছিল।"

"কিরকম অসংলগ্ন কথা, সেটা কিছু বলেছে কি?"

"মানে ওই তুমি যক্ষের ধন আঁকড়ে মরবে, তোমার মুখাগ্নি করতে কে আসে দেখব ইত্যাদি।"

***

ঝিরঝির বৃষ্টি পড়া শুরু হলো। ওরা সবাই গাড়িতে উঠে বসে আবার রওনা দিল গন্তব্যের উদ্দ্যেশ্যে। জটিল জানে যে সরোজের প্রাথমিক জেরা ও ঘটনাক্রমের বিন্যাসগুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হলে সেটা এই রাস্তায় সেরে ফেলতে হবে। দীননাথ চক্রবর্তীর হত্যার সাথে চৌধুরীবাড়ির একাধিক চরিত্রের স্বার্থ কোথাও একটা জড়িয়ে আছে এবং সেটা যে সহজে বের হবার নয় তা সে ইতিমধ্যেই টের পেয়েছে। শুধু এইটুকু পরিষ্কার যে একটা জমিদারী বংশের ঠাটবাট বজায় রাখতে এ বাজারে ভালো রকম অর্থের প্রয়োজন, এবং সেই হিসেবটা আশা করা

যায় অক্ষয়ের কাছ থেকে আরো সময় নিয়ে খানিকটা আদায় করা যাবে। এখানে সবার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে পুরোপুরি না জানলে ক্রাইম আর মোটিভ মেলানো যাবেনা বিশেষ করে যখন খুনের মূল উদ্দেশ্য আপাতদৃষ্টিতে বহুমূল্য গহনা সহকারে মূর্তি চুরি। ওদিকে নির্মলেন্দু বাবুর বন্ধু যদি কোনো প্রভাবশালী পুলিশকর্তা হয় তাহলে তার সেই প্রভাব খাটানোর পেছনে হয় তার কোনো প্রচন্ড সৎ উদ্দ্যেশ্য কাজ করছে অথবা সাংঘাতিক অসৎ কোনো কারণ লুকিয়ে আছে! তার মানে নির্মলেন্দু বাবু সন্দেহের হয় এসপার না হলে ওসপার, মাঝামাঝি কিছু নয়।

“আচ্ছা কালকেতু ছেলেটিকে কিরকম দেখলি, মানে দানীবুড়োর মৃত্যুতে ওর মানসিক অবস্থা কি হবে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু জেরাতে তো ও সেরকম ভাবে কিছুই বলতে পারেনি। অথচ ঘটনার সময় ও স্পটের সব থেকে কাছে ছিল।”

“নাহ ছেলেটা এমনিতে দুম করে কোনো ক্রাইম করার মত বলে মনে হলো না। যেটুকু সময় ওর সাথে কথা বলেছি তাতে বুঝলাম যে ও নিতান্তই শোকস্তব্ধ। হয়ত এখন খানিকটা ধাতস্থ হয়েছে ও আমরা গেলে পরে আজ আরো কিছু বলতে পারে।”

“আর শর্মিষ্ঠা, সেও তো দেখছি বিশেষ কিছু বলেনি।”

“ওই মেয়েটিও বেশ ভেঙে পড়েছিল, মানে যা হয় আর কি। কান্নাকাটি করছিল ও বলছিল আমাকে কে এখন থেকে পুকুরধারে গল্প শোনাবে?”

“কৃষ্ণেন্দু বাবু জন্মাষ্টমীতে বাড়িতে এসেছিল নিশ্চই? মানে সে কি এখনও ওই বাড়িতেই আছে?”

“হ্যাঁ মানে প্রত্যেকবারের মতই পুরো চৌধুরী পরিবার জন্মাষ্টমীর সপ্তাহ খানেক আগে একত্রিত হয়েছিল। আর কৃষ্ণেন্দু বাবু এ কেসের সুরাহা না হওয়া অব্দি ফিরছেন না।”

“মানে খুনটা যখন হয়েছে অর্থাত ঝুলন পূর্ণিমার দু দিন আগে মোটামুটি সবাই ওই বাড়িতেই ছিল। হুমম ইন্টারেষ্টিং!”

“হ্যাঁ তা সবাই ছিল বটে”

“আর কৃষ্ণেন্দু বাবুর স্ত্রী-কন্যা থাকছেন না?”

“ওনার স্ত্রী আপাতত আছেন, তবে তাঁর কি একটা জরুরি কাজ ডেলিভার করার আছে, তাই তিনি খুব বেশি দিন থাকতে পারবেন বলে মনে হয় না। আর কন্যা, মানে ফুল্লরা একটা ফিল্ড ওয়ার্ক নিয়েই এখানে এসেছে। তাই ও থাকছে আরো বেশ কিছু দিন।”

রানাঘাট পেরিয়ে গেল, আর বেশিক্ষণ নেই। ঘুর্নির মাটির পুতুলের কদর এক সময় দেশে বিদেশে বহুচর্চিত ছিল। চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বড়-বউ ও হুঁকো-মুখে বুড়ো স্থান পেয়েছিল তামাম পুতুল জাদুঘরে। পরবর্তী কালে জমিদারদের অবস্থা পরে যাওয়াতে এই শিল্পীদের পেশা মার খায়। এখন কিছু অর্ডার আসে বিদেশে অবস্থিত ভারতীয়দের থেকে তবে সে ক্ষেত্রে মনীষীদের চাইতে ডোনাল্ড ডাক, সচিন তেন্ডুলকার বা সাঁই বাবাদের মূর্তির চাহিদাটাই বেশি। পড়তি জমিদারির ছায়া মূর্তির ব্যবসায় পড়েছে আর হয়ত পড়েছে সেই জমিদার পরিবারের ভেতরে গোপন কোনো দ্বন্দ্বের ওপর।

পৌনে দুটো নাগাদ হালকা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সরোজ ও জটিলেশ্বর ঘুর্নির চৌধুরীবাড়ির গেটে পৌঁছে গাড়ির হর্ন বাজাল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
(পাগলা দাশু)

"জমিদারবাড়ির গ্ল্যামারটাই অন্য লেভেলের হয়, বল", গাড়ি থেকে নেমে তিনতলা জমিদারবাড়ি, সামনের নাটমহল, পশ্চিমদিক থেকে উঁকি মারা মন্দিরের চূড়ো, বাড়ির সামনে সুন্দর করে সাজানো ফুলের বাগান সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে জটিলেশ্বর বলে উঠল। সরোজ এতক্ষণ চৌধুরীবাড়ির ড্রাইভার শ্যামাচরণের সাথে কথা বলছিল। গেটে দাঁড়িয়ে দু-চার মিনিট একনাগাড়ে হর্ন বাজানোর পর হন্তদন্ত হয়ে শ্যামাচরণই ছুটে এসে গেট খুলে দেয়। বাড়ির সবাই দুপুরের খাওয়া খেতে বসেছে, জানায় সে। সরোজ শ্যামাচরণকে বাড়ির ভেতরে খবর দিতে পাঠিয়ে জটিলের দিকে তাকিয়ে বলল, "জমিদারী যখন ছিল তখন এইসব মানা যায়। আজকের দিনে এতকিছু সামলাতে না পারলেও সব ঠাটবাট বজায় রাখতেই হবে, তার তো কোনও মানে নেই। এসবের জন্যই অভাব, টাকার লোভ আর তার থেকে একটা নিরীহ বুড়ো মানুষ খুন হল।"

- "সেটা কিন্তু আমরা এখনও ঠিক জানি না শুধু টাকার জন্য মূর্তি চুরিই মোটিভ ছিল কিনা। যাকগে, ড্রাইভার কি বলল? কোনও নতুন তথ্য?"

- "হ্যাঁ, সম্ভবত কাল সকালেই কৃষ্ণেন্দুর স্ত্রী চলে যাচ্ছেন। শ্যামাচরণকে সকাল সাতটায় গাড়ি রেডি করতে বলা হয়েছে দমদম যাওয়ার জন্য। আমি ধরে নিচ্ছি সেটা ওনার জন্যই। সেদিনই অবশ্য আমাকে বলে রেখেছিল যে এর মধ্যেই চলে যাবে। আর এদিকে অমরনাথ দেশের বাড়িতে যেতে চায়, ওর ছোট ছেলের নাকি প্রচণ্ড জ্বর। আমি খুনের কিনারা না হওয়া অবধি বাকি কাউকেই বাড়ি ছেড়ে যেতে বারণ করে গিয়েছিলাম। হয়তো আজ আমার কাছে ঝোলাঝুলি করবে।"

- "অমরনাথ মানে মালী তো? দেশের বাড়ি কোথায় যেন?"

"ওই তো ওড়িশার একটা গ্রাম", সরোজ বলে ওঠে, "যতদূর মনে পড়ছে নামটা রঘুরাজপুর। তবে আমি এখনই যেতে দিচ্ছি না। এমনিতে লোকটার বয়স ষাটের কাছাকাছি। আর দানীর সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল। তবু কিচ্ছু বলা যায় না।"

সরোজের কথা শেষ হতে না হতেই জমিদারবাড়ির একতলার দরজা দিয়ে শ্যামাচরণের সাথে আর একজনকে আসতে দেখা গেল। সরোজ মৃদুস্বরে জানালো "অক্ষয়"।

অক্ষয় সুপুরুষ না হলেও বেশ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। সেক্রেটারির কাজের পাশাপাশি সকাল-বিকেল রীতিমত শরীরচর্চা করেন বলে মনে হয়। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও দেহে একফোঁটা মেদের চিহ্ন নেই। জটিলেশ্বরকে না চিনতে পেরে একটু অবাক চোখে দেখে সরোজের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনারা আজ আসবেন আগে থেকে বলেননি তো। তাহলে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা যেত।"

"আসলে আগে থেকে ঠিক ছিল না", বলে সরোজ জটিলের দিকে ইশারা করে বলল, "ও আমার বন্ধু, এই কেসে সাহায্য করবে। ও-ই বলল আজকেই আসবে, তাই চলে এলাম।"

অক্ষয় জটিলেশ্বরের দিকে তাকিয়ে নমস্কার জানালো। প্রতি-নমস্কার করে জটিল বলল, "খাওয়াদাওয়া নিয়ে সেরকম ব্যস্ত হতে হবে না। এমনি বাড়ির সবাই আছেন তো এখন? তাহলে সবার সাথেই একবার করে কথা বলব।"

"হ্যাঁ সবাইই আছেন। তবে ছোটবৌদি কাল চলে যাবেন। জরুরি কি একটা ফোন এল কাল। আপনারা ঘরে এসে বসুন, সবাই আসলে খেতে বসেছেন। আমি গিয়ে খবর দিচ্ছি।" অক্ষয়কে দেখে মনে হল সেও খেতে বসেছিল। ড্রাইভার গিয়ে খবর দেওয়ায় তড়িঘড়ি উঠে আসতে বাধ্য হয়েছে। জটিল বলল, "ঠিক আছে, আমরা বসছি। তুমিও খাওয়া শেষ করে এস আর বাকিদেরও বল।"

অক্ষয় ওদের দুজনকে বসার ঘরে ঢুকিয়ে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরবাড়িতে চলে গেল। বসার ঘরটা বেশ সাজানো-গোছানো। একটা মেহগনি কাঠের টেবিল মাঝে রাখা। তার ওপরে সুদৃশ্য একটি নটরাজ মূর্তি। "জমিদারি ঐতিহ্য", সরোজকে দেখাল জটিল। ঘরের এক কোণে একটা বুককেসে বেশকিছু কবিতার বই রাখা। এছাড়া সমসাময়িক কিছু পত্রিকা আর অন্য কিছু বইও রয়েছে।

"কাকে দিয়ে শুরু করবি রে?" সরোজের গলায় দুশ্চিন্তা আর অধৈর্যের ছাপ স্পষ্ট। বেচারাকে দোষও দেওয়া যায় না। এখনও অবধি কোনও ক্লু নেই। ওকে একটু নিশ্চিন্ত করার জন্য জটিল বলল, "তুই একটু শান্ত হ আগে

সরোজ। যে বা যারা এর সাথে জড়িত, তারা কিছু না কিছু ভুল করবেই। আজ অবধি সবাইই করেছে। কিন্তু তুই যদি অসহিষ্ণু হয়ে পড়িস, তাহলে সেই ভুলগুলো হয়তো চোখ এড়িয়ে যাবে। মনটাকে একটু রিল্যাক্স কর।"

সরোজ শান্ত হয়ে বসলে জটিলেশ্বর ওকে বলল, "তুই শুরু করবি জেরা। প্রথমে কৃষ্ণেন্দু আর তার পরিবারকে। ওরা যেহেতু বহুদিন ধরে বাইরে, আমার মনে হয় খুব বেশি কিছু জানবে না এখানকার সম্পর্কে। মূলত জানার চেষ্টা করবি মন্দির আর মূর্তির ইতিহাস নিয়ে। তার সাথে প্রত্যেককে বলবি মূর্তির এবং গায়ের গয়নার ডিটেইলস যতটা জানে বলতে। যে এই ব্যাপারে ইনভলভড ছিল, সে নিশ্চয়ই খুব ভালো করেই জানবে। তবে তার সাথে দেখাতেও চাইবে যে কিছুই জানে না। এখানেই তোর পুলিশি ব্যাপারটা কাজে লাগাবি।"

- "আর তুই?"

- "আমি শর্মিষ্ঠা আর কালকেতুকে নিয়ে মন্দিরের দিকে যাব। ওদের সাথে আলাদা করে একা কথা বলতে চাই। তুই সাথে থাকলে শেকি ফিল করতে পারে ওরা। বুড়োর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ তো ওরা দুজনেই ছিল। একটু জমিয়ে নিতে পারলে অনেক কিছুই জানা যাবে। তবে তুই যত বেশি পারিস সময় নিস। নির্মলেন্দু, অর্ধেন্দু আর অক্ষয়ের পরিবার এদের সাথে কথা বলার সময় আমি থাকব।"

সম্মতি জানালো সরোজ। বন্ধুর ওপর অগাধ ভরসা ওর। মনটাকে আরও একটু রিল্যাক্স করার জন্য একটা সিগারেট চাইল সরোজ। ধরিয়ে দুবার টানতেই বাইরে গলাখাঁকারির আওয়াজ পাওয়া গেল। অক্ষয়ের সাথে ঘরে এসে যিনি ঢুকলেন তাকে দেখে জটিলেশ্বর সেনের বুঝতে অসুবিধে হল না ইনিই বিখ্যাত ব্যারিস্টার অর্ধেন্দুশেখর চৌধুরী। প্রায় আশি বছর বয়সেও রাশভারী চেহারা আর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সরোজ আর জটিল সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে উঠে দাঁড়ালো। গম্ভীর গলায় সরোজকে বলে উঠলেন অর্ধেন্দু, "কিছু এগোল আপনার তদন্ত?"

"কিছু সূত্র পেয়েছি, সেইজন্যই আবার আসা। কয়েকটা প্রশ্ন করব সবাইকে", যথাসম্ভব পুলিশি গাম্ভীর্য রাখার চেষ্টা করল সরোজ, "ইনি জটিলেশ্বর সেন, আমাকে সাহায্য করছেন।"

"গোয়েন্দা?" ভ্রূ কুঁচকে জটিলের দিকে তাকালেন অর্ধেন্দু।

হালকা হেসে জটিল বলল, "একবার শর্মিষ্ঠাকে ডেকে দেবেন? ওর সাথে গিয়ে একবার মন্দির চত্বরটা দেখে আসতাম।" অর্ধেন্দু অক্ষয়ের দিকে ইশারা করতে সে ভেতরে চলে গেল শর্মিষ্ঠাকে ডেকে আনতে। সরোজ বলল, "শুনলাম কৃষ্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী কালই চলে যাচ্ছেন। ওনার সাথেই প্রথম কথা বলে নিই আমি। আর যদি কিছু মনে না করেন, আমি সবার সাথে আলাদা আলাদা ভাবে কথা বলতে চাই।"

"ঠিক আছে, আপনি যা ভালো বোঝেন", ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন অর্ধেন্দু, "আপনারা বুদ্ধিমান মানুষ। নিশ্চয়ই অপরাধীকে ধরে দেবেন। খালি এটুকু খেয়াল রাখবেন, টাকার লোভ বা অভাবে মানুষ আত্মীয়স্বজন বা পরিবারের মানমর্যাদা সবই ভুলে গিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।"

অর্ধেন্দুশেখরের রাশভারী চেহারা চোখের আড়াল হতেই সরোজ বলল, "বড় ছেলেকেই সন্দেহ করছেন মনে হল।" উত্তরে জটিল সন্দেহ প্রকাশ করল, "তাই কি? আমার তো মনে হল কালকেতুর দিকে একটা আলগা সন্দেহের তীর ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন। টাকার জন্য বুড়ো দাদুকে খুন করেছে এরকম বলতে চাইলেন।"

ইতিমধ্যেই অক্ষয় আর শর্মিষ্ঠাকে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখে জটিল উঠে দাঁড়াল, "আপনারা একটু বাড়ির বাইরেটায় দাঁড়ান, আমি আসছি।" তারপর সরোজকে বলল, "ও আর একটা জিনিস বলতে ভুলে গেলাম। খোঁজ নিস তো অর্ধেন্দুর উইলের ব্যাপারে কিছু জানতে পারিস নাকি। আমি দেখি ওদিকে কিছু করতে পারি কিনা।"

বাইরে বেরিয়ে অক্ষয়কে সরোজের কাছে পাঠিয়ে শর্মিষ্ঠাকে জটিল নিজের পরিচয় দিয়ে সমবেদনা জানালো প্রথমেই। তারপর জানতে চাইল কালকেতুর খাওয়া হয়ে গেছে কিনা। "ও তো আমাদের সাথে খায় না। নিজেই রান্না করে ও আর ওর দাদু খেত", একটু দুঃখের আভাস রয়েছে শর্মিষ্ঠার গলায়। জটিল অনুমান করল চৌধুরীবাড়িতে ওদের দুজনের সম্পর্কের জন্যই এই ব্যবস্থা।

- "ও থাকে কোথায়?"

- "ওই তো মন্দিরের চৌহদ্দিতে ঢোকার আগেই দুটো ঘর বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওখানেই ওরা থাকত। এখন হয়তো ঘরেই রয়েছে।"

- "ঠিক আছে চলো, আগে দেখি ও কেমন আছে। তারপর তিনজনে একসাথে মন্দিরের দিকে যাব। ছেলেটা নিশ্চয়ই প্রচণ্ড শক পেয়েছে?"

চোখ থেকে জল বেরিয়ে এল মেয়েটার। "দাদু খুব ভালো ছিল, অনেক গল্প শোনাত আমাকে। যেই এরকম করে থাকুক না কেন, তাকে রাধামাধব কোনদিন ক্ষমা করবে না। একমাত্র দাদুই আমার কথা শুনত, বুঝতে চাইত। এখন জানি না কি হবে", একটু চুপ করে থেকে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে উঠল, "কেতুকে বাবা বোধহয় তাড়িয়েই দেবে।"

- "সে কি! কেন?" যদিও সরোজ বলেছিল যে বাড়ির সকলের আপত্তি কালকেতু-শর্মিষ্ঠার সম্পর্ক নিয়ে, তাও সবকিছু শোনার উদ্দেশ্যে বিস্ময় প্রকাশ করল জটিল।

- "বাবা একেবারে পছন্দ করে না কেতুকে, শুধু দানীবুড়োর জন্য এতদিন ওকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়নি।"

- "পছন্দ না করার কারণ কি?"

- "আমি কিছুতেই বাবার কথা বুঝতে পারি না। এদিকে মাঝে মাঝেই কেতুকে তাড়িয়ে দেবে বলে, ওদিকে যখন কলকাতায় খেলত, তখন বাবার ওই সিকিউরিটি সংস্থায় একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল। তারপর চোট পেয়ে ওর খেলা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। ফিরে এল এখানে। তখন এই দোকান খোলার জন্যও বাবাই টাকা দিয়েছিল।"

ভীষণ অবাক হয়ে জটিল বলে উঠল, "স্ট্রেঞ্জ! আচ্ছা, কালকেতুর বাবা-মা তো খুব ছোটবেলায় মারা গিয়েছিলেন, তাই না?"

- "হ্যাঁ, তবে আমি তখন খুবই ছোট। কিচ্ছু মনে নেই। কেতুকে এই নিয়ে জিগ্যেস করলে কিছুই বলতে চায় না। আমিও জোর করিনি কখনও। পরে দাদুর কাছে শুনেছি। দাদুই ছিল সেই ছোট থেকে ওর একমাত্র আশ্রয়।"

কালকেতুর জীবনে বুড়োর ভূমিকা বুঝতে অসুবিধে হল না জটিলের। "কেতু কাউকে সন্দেহ করে এর পেছনে?" জানতে চাইল জটিল।

- "ওকেই জিগ্যেস করবেন সেটা", বলল শর্মিষ্ঠা, "ওই তো বসে আছে ও"। সামনে তাকিয়ে ঘরদুটোকে দেখতে পেল জটিল। ঘরের বাইরেই বসে ছিল বিষণ্ণ কালকেতু। এগিয়ে গেল দুজনে ছেলেটার দিকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(তুষার সেনগুপ্ত)

পাশাপাশি দুটো ঘর, সামনেই লাগোয়া টানা লম্বা লাল মেঝের উঁচু বারান্দা। দেওয়ালে হেলান দিয়ে দু'হাঁটু বুকের কাছে এনে দু'হাতে জড়িয়ে থুতনিটা হাঁটুর ওপর রেখে কালকেতু নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের কদম গাছটার দিকে। দাদুর বড় প্রিয় ছিল কদম গাছটা। আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টির সাথে সাথেই যেন রাতারাতি চনমনে হয়ে উঠত গাছটা। এইতো পাঁচ-ছ' দিন আগের কথা। হলুদ কদমফুলে ঢেকে গেছে ডালপালা, কালকেতু দোকান ফেরত দু'হাত ভরা কদমফুল নিয়ে পুকুরপাড়ে শানবাঁধানো ঘাটে দাদুর পাশে বসে দাদুর ধুতির কোঁচায় ঢেলে দিল। দাদু কালকেতুর মাথায় হাত বুলিয়ে অপার স্নেহ মাখানো গলায় বলে উঠল,

- "কে? কালু এলি? তা হতভাগা এই কদমফুল এই বুড়োটাকে না দিয়ে শর্মিকে দিলেই তো পারিস!"

- "তোমার শর্মি তোমার রাধারানীর মত কদমফুলে তুষ্ট নয়গো, গোলাপে খুশি হন। চলো অনেক রাত হল, জোলো হাওয়ায় ঠাণ্ডা লাগলে হাঁপানির টানটা আবার বাড়বে..."

কথা বলতে বলতে পুকুরপাড় থেকে দাদুর হাত ধরে এগোতে এগোতেই কালকেতুর কানে এলো দাদুর স্বগতোক্তি,

- "কদমফুলই ভালো রে, কি মোলায়েম! গোলাপে বড্ড কাঁটা..."

আচমকা দমকা হাওয়ায় কয়েকটা কদমফুল মাটিতে ঝরে পড়তেই কালকেতুর দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। ভীষণ পরিচিত কণ্ঠে "কেতু" ডাকটা শুনেই চমকে তাকাল কালকেতু। শর্মি কখন এসে সামনে দাঁড়িয়েছে বুঝতেই পারেনি। শর্মির সঙ্গে আসা ভদ্রলোককে আগে কোনও দিন দেখেছে বলে মনে করতে পারলো না। শর্মিদের নিকট আত্মীয়রা মোটামুটি সবাই পরিচিত। হয়তো পুলিশের লোক। কালকেতু কি করা উচিত বুঝতে না পেরে বারান্দা থেকে নেমে ওদের মুখোমুখি হয়ে নির্লিপ্ত স্বরে বলল,

- "শর্মি? হঠাত এখানে? এই সময়? তা এনাকে তো ঠিক..."

কালকেতুকে কথা শেষ করতে না দিয়েই জটিলেশ্বর নিজের পরিচয় দিতে বলে উঠল,

- "আমি জটিলেশ্বর সেন, আপনাদের এখানে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাটা নিয়ে আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।"

- "পুলিশ নাকি গোয়েন্দা? দাদুর হত্যাকারীকে খুঁজতে এসেছেন নাকি চৌধুরীবাড়ির উধাও হয়ে যাওয়া দুর্মূল্য রাধামাধবের মূর্তি আর মূল্যবান গয়না?"

কালকেতুর স্বভাব বিরুদ্ধ কর্কশ ব্যবহারে শর্মি অবাক হয়ে জটিলেশ্বরের দিকে তাকাতেই জটিলেশ্বর আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে স্মিত হেসে মৃদু ঘাড় নাড়িয়ে কালকেতুর উদ্দেশ্যে বলে উঠল,

- "তুমি বয়েসে অনেক ছোট তাই তোমাকে তুমি করেই বলছি। আর শর্মির মতই আমিও যদি তোমায় কেতু বলে ডাকি তুমি নিশ্চয় কিছু মনে করবে না?"

কালকেতু মুখটা তুলে তাকাতেই জটিলেশ্বরের নজরে এলো ওর দুচোখের কোনে তখনও যেন জমাটবাঁধা কান্না। ভীষণ ক্লান্ত চোখে অদ্ভুত বিষণ্ণতা, ঘটনার পর থেকে ঘুমিয়েছে বলে মনে হয়না। এইরকম বিষণ্ণ পরিবেশে জটিলেশ্বর ভীষণ অসোয়াস্তি বোধ করে, পরিবেশটাকে হালকা করার জন্যেই শর্মির উদ্দেশ্যে বলে,

- "চলো, তোমরা দু'জন মিলে আমাকে একটু রাধামাধবের মন্দিরটা ঘুরিয়ে দেখাও।"

সরু সিমেন্টবাঁধানো রাস্তা, দুধারে রকমারি ফুলের গাছ। গাঁদা, টগর, চাঁপা, বিভিন্ন রঙের গোলাপ, এমনকি কালো গোলাপও রয়েছে। সামনে সামনে কালকেতু আর শর্মি, ইচ্ছাকৃতভাবে কিছুটা পেছনেই জটিলেশ্বর হাঁটছে। এতক্ষণে মনে হচ্ছে কালকেতু আস্তে আস্তে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে। কালকেতুর রুক্ষ ব্যবহারে জটিলেশ্বর কিছুই মনে

করেনি। কালকেতুর জায়গায় নিজেকে বসালে ও নিজেও বোধহয় এর থেকেও বেশী রুক্ষ ব্যবহার করত। দানীবুড়ো শুধু ওর দাদুই ছিল না, একই সাথে ওর মা-বাপও। ওদের মৃদু স্বরের কথাবার্তা জটিলেশ্বরের কানে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল মন্দিরের সামনে। মন্দিরের দরজায় একটা বড় তালা ঝুলছে, বোধহয় সরোজ আগেরদিন তদন্তে এসে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে। মন্দিরের পাশের একটা সিমেন্টের বেদি দেখিয়ে কালকেতু বলে উঠল,

- "এই বেদিতেই দাদুকে বসিয়ে সেদিন সন্ধেবেলায় বড়দাদু, মানে শর্মির দাদুর কাছে মন্দিরের চাবি আনতে গেছিলাম, আর ফিরে আসার আগেই..."

- "তুমি কি চাবি নিয়েই ফিরেছিলে?"

জটিলেশ্বরের অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নে কালকেতুকে যেন খোঁচা দিল। রুক্ষ স্বরে কালকেতুর জবাব,

- "জটিলেশ্বরবাবু! মূর্তি আর গয়না চুরি করার জন্যে আমার কিন্তু দাদুকে খুন করার দরকার হত না। দাদু এমনিতেই চোখে কম দেখত, সূর্য ডোবার পরেতো অন্ধই বলা যায়। মন্দিরের দরজার তালা বেশিরভাগ দিন আমিই লাগাতাম কখনো সখনো শর্মি আর চাবি থাকতো বড়দাদুর কাছে।"

জটিলেশ্বর বুঝতে পারে কালকেতুর কাটাঘায়ে ছেটানো নুনের পরিমাণটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। আঘাতে মলম লাগানোর জন্যে, যতটা সম্ভব মোলায়েম কণ্ঠে বলল

- "কেতু! তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের ভুল অর্থ করলে। আমি যতদূর জানি স্বর্গীয় দীননাথ চক্রবর্তীর সবথেকে কাছের মানুষ হচ্ছ তোমরা দুজন। আমার বিশ্বাস দানীবাবুর খুন হওয়ার আর গয়নাসমেত রাধামাধবের উধাও হওয়া, দুটো কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। আমি দানীবাবুর খুনিকে খুঁজে বের করতে চাই আর সে ব্যাপারে তোমরা দুজনই আমাকে সবথেকে বেশি সাহায্য করতে পারো। কেতু তুমি আমাকে বলো সেদিন তারপর কি ঘটেছিল।"

জটিলেশ্বরের একদমে বলে যাওয়া কথাগুলো যেন কালকেতুর কাছে বিশ্বাস্য লাগলো। তারপর কালকেতু বলে গেল সেদিনের ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ। অর্ধেন্দু চৌধুরীর কাছে মন্দিরের চাবি নিতে পৌঁছানোর আগেই চৌধুরীবাড়ির মালী অমরনাথ দৌড়তে দৌড়তে এসে কালকেতুকে বলেছিল দানীবাবুকে কে যেন পেছন থেকে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মাথায় মেরেছে, মাটিতে পড়ে আছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পাগলের মত ছুটে এসেছিল কালকেতু। দাদুর রক্তে লাল হয়ে গেছিলো ওর দু'হাত, ডাক্তার ডেকেও লাভ হয়নি।

রিস্টওয়াচে চোখ বোলাল জটিলেশ্বর। পৌনে পাঁচটা বাজে। সরোজের জেরাও বোধহয় অনেকদূর এগিয়ে গেছে। কালকেতুকে সমবেদনা আর বিদায় জানিয়ে শর্মিকে সঙ্গে নিয়ে পা বাড়াল চৌধুরীবাড়ির মূল ফটকের দিকে। অর্ধেন্দু, নির্মলেন্দু আর অক্ষয়ের সঙ্গে ও নিজেও কথা বলতে চায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(দুর্বার)

দু পা হেঁটে একটু থমকাল জটিলবাবু। বাড়িটার প্ল্যানটা অদ্ভুত। মন্দির থেকে বিশ হাত দূরে, বাগানের কোনায় দাঁড়িয়ে তাকালেন মূল বাড়ির দিকে। নাটমহলে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে সামনেটা। দোতলা, তিনতলার সামনে টানা বারান্দা। অনুমান করে নেওয়া যায় বারান্দার পেছনের ঘরগুলো শোওয়ার ঘর। কিন্তু মন্দির যাওয়ার জন্য নাটমহল পেরিয়ে বাগান ঘুরে মন্দির যাওয়ার রাস্তাটা একটু লম্বা। বাড়ির মেয়েরা নিশ্চয় এতটা পথ পেরিয়ে মন্দির যায় না। মন্দির এর একটা কোনা বাড়ির লাগোয়া, কিন্তু সেখানেও কেয়ারি করা ফুল এর সারি। শর্মিকে জিজ্ঞেস করতে ও বলে উঠল, বাড়ির বাঁ দিকের কোনায় আরেকটা দরজা আছে যেটা দিয়ে শুধু পুরোহিত আর বাড়ির মেয়েরা মন্দিরে যাওয়া আসা করে। দোতলার বারান্দার পেছনের ঘরটা দাদুর, মানে অর্ধেন্দুর, মন্দিরের ঠিক মুখোমুখি। মন্দিরের বিগ্রহর মুখ বাড়ির বাঁ দিকের দেওয়ালের দিকে থাকতো, যাতে বাড়ির লোকজন ঘর থেকেই ঠাকুর প্রণাম করতে পারেন। একথা সেকথায় জানা গেলো, তিনতলার বারান্দার লাগোয়া ঘরে থাকে শর্মি, দাদুর ঘরের ঠিক ওপরেই। নির্মলেন্দু আর তাপসী থাকেন বারান্দার অন্য প্রান্তের ঘরে। ফুল্লরা আর তার মা মনিকা আছেন দোতলাতেই, তাপসী ও নির্মলেন্দুর ঘরের ঠিক নীচে। এক তলার ঘরে কেউ শোয়না, ঠাকুর চাকর রান্নাঘরের মেঝেতেই বিছানা করে। হিসেব মতন বাড়ির ডানদিকের ছোট ঘর দুটো তে থাকেন অক্ষয় এবং ওনার পরিবার। পুকুরটা এখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে মন্দির এর বামদিকে, মানে আরও পশ্চিমে। বাড়ির পেছন দিকটাতে কিছু বড় গাছ লাগানো। কেতু থাকে পুকুরের লাগোয়া চালা ঘরে, মন্দির থেকে দূরত্ব কিছু না হলেও প্রায় পঁচিশ মিটার। লোহার দরজার থেকে দু পা পিছিয়ে এসে। এবং বাগানের পরিপাটি আর গাছের সারি দেখে ধরে নেওয়া যায় ওপাশ থেকে লোকজন এলে তাঁরা মোরামের রাস্তা দিয়েই মন্দির অব্দি যান, নাহলে এই জল কাদার মরসুমে পায়ের ছাপ পাওয়া দুষ্কর হত না।

সুতরাং, চোর যিনিই হোন না কেন, তিনি বাড়ির ভেতর দিক থেকে এসেছিলেন বা গা ঢাকা দিয়েছিলেন মন্দির এর পেছন দিকে, সম্ভবত। কারণ হিসেব মতন দানি বুড়ো বসেছিলেন মন্দির এর রোয়াকে, কেতু চাবি আনতে গেছিল মোরামের রাস্তা ধরে। মালী যদি কেতুকে দানি বুড়োর খবরটা দিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে মালি এবং কেতু দুজনেই আবার মোরামের রাস্তা ধরেই ফেরত আসে বুড়োর কাছে। এখানে দাঁড়িয়ে দেখলে বেসিক প্রশ্ন দুটো, এক - মালি কোথায় ছিল এবং কিভাবে দানীর খবর পেলো, কারণ কেতুর চাবি আনতে বেশিক্ষণ লাগার কথা না, এইটুকু সময়ের মধ্যে খুনি নিজের কাজ করে ফেরার। দুই - চোর এবং খুনি কি একজন? কারন এই অল্প সময়ের মধ্যে খুন এবং চুরি বাস্তবিক অসম্ভব। আবশ্যই কেতুকে সন্দেহের বাইরে রেখে। সেক্ষেত্রে অবধারিত পরের প্রশ্ন, চুরি কি তাহলে খুন এর আগেই হয়ে গেছিল?

- “কি হল, আসুন?”

শর্মি’র গলা শুনে চমকে উঠল জটিল, নাহ গোয়েন্দাগিরি করতে এসে কারোর ওপরে মায়া পড়ে গেলে মুশকিল।

- "হ্যাঁ চল, আসলে মাথার ভেতর অনেকগুলো জিনিস একসাথে ঘুরপাক খাচ্ছে তো।"

মুচকি হেসে ঘরে ঢুকল জটিল। সরোজকে দেখে আরও হাসি পেয়ে গেলো, বেচারা ঘেমে নেয়ে একশা।

- "কিরে, কতদুর কি এগুলো?"

- "ধোর। কোথায় ছিলিস এতক্ষণ। আজে বাজে প্রশ্ন করে মাথা ধরে গেলো। কিসসু বোজা গেলনি।"

- "কাকে কাকে প্রশ্ন করলি?"

- "মনিকা, মানে ফুল্লরার মা আর ফুল্লরা।"

ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে দু কাপ চা দিয়ে গেছে। জটিল উঠে গিয়ে অক্ষয় বাবুর কাছ থেকে কিছুটা সময় চেয়ে নিয়ে এসেছে, কয়েকটা জরুরি কথা সেরে নেওয়ার তাগিদে। সরোজ চায়ে চুমুক দিয়ে শুরু করলো ফুল্লরার কথা। ছোটবেলায় বেশ কিছুটা সময় এবাড়িতে কাটালেও, খুব একটা টান নেই ঘুর্নির প্রতি। প্রতি বছর একবার, কোনও কোনও বার বাবার জোরাজুরিতে দু'বার এখানে আসে। মন্দির বা মূর্তি নিয়ে আলাদা কোনও আগ্রহ নেই। কাকে সন্দেহ করো জিজ্ঞেস করাতে স্পষ্ট বলল "বাড়ি থেকে অপ্রয়োজনীয় লোকজন দের আগেই বিদেয় করলে এই ঘটনা ঘটত না"। যদিও ইঙ্গিত সরাসরি কেতু, দানী বুড়ো বা অক্ষয় কার দিকে বোঝা যায়নি।

মনিকা অপেক্ষাকৃত অনেক মার্জিত। যদিও মূর্তি বা গয়নার এই বাজারে দাম সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। একবার তো ভাসুরের পড়তি ব্যবসা আর এই বাড়িতে বসে ভোগ করার প্রতি কটাক্ষও করলেন। সেই সঙ্গে এটাও বললেন, কৃষ্ণেন্দুর পক্ষে দিল্লি ছেড়ে কোনোকালেই এখানে এসে বসবাস বা দেখাশোনা করা সম্ভব না। অতএব ওনারা আর এই ব্যাপারে বিশেষ মাথা ঘামাতে চান না। উইল এর কথা জিজ্ঞেস করতেও মহিলা একই উত্তর দেন, এই বাড়ি অর্ধেন্দু জীবিত থাকা অবস্থায় বেচবেন না, আর ওই মূর্তি বা গয়নার তো প্রশ্নই ওঠে না। এবং কৃষ্ণেন্দুর বর্তমান অবস্থা ও প্রতিপত্তির কথা জেনে নিশ্চয় বড় ভাই নির্মল এই বাড়ি বেচার মতন ভুল করবেন না, সেক্ষেত্রে এই বাড়ির ওপর তার একছত্র আধিপত্য থাকবে।

মোটকথা, নির্মল এবং কৃষ্ণের মধ্যে সম্পর্ক যাই হোক না কেন, অন্তত মনিকা বা ফুল্লরা কেউই নির্মল এবং তার আর্থিক অবস্থা কে ভাল চোখে দেখেন না। চুলে দ্রুত আঙুল চালাল জটিল। ফুল্লরা এবং মনিকার এই ব্যবহার তার ন্যায্য মনে হল, কিন্তু খুন বা চুরির মোটিভ স্পষ্ট করার মতন না।

চা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে, ভেতর থেকে তাপসীকে ডেকে দিতে বলল জটিল। সন্দেহের তালিকায় এখন বাকিরা। ঘরে ঢুকলেন একজন মধ্যবয়স্কা আটপৌরে মহিলা। বেশ ক্লান্ত মুখ, দুঃখের ছাপ স্পষ্ট। একটু জবুথবু হয়ে বসলেন সামনের চেয়ারে।

- "নমস্কার, আমাদের পরিচয় নিশ্চয় এতক্ষণে আপনি জানেন। তবুও বলি আমি জটিল এবং ও সরোজ।"

প্রতিনমস্কার সেরে গায়ের কাপড়টা আরেকটু টেনে নিলেন মহিলা। ভেজা গলায় বললেন

- "কি জানতে চান বলুন। জেঠুকে আমি এবাড়িতে আসার দিন থেকেই চিনি। কারোর সাথে কখনো বিবাদ করতে শুনিনি। পুজো নিয়েই থাকতেন। কেন এরম হল জানি না।"

একটু থেমে স্বগতোক্তির স্বরেই বললেন

- "শর্মি বড় হয়েছে, পড়াশুনো জানে। নিজের পছন্দ অপছন্দ আছে, আমি কখনো বাধা দিয়নি কিছুতে। কিন্তু সবাই হয়তো সবকিছু অত সহজে মেনে নিতে পারেনা।"

- "আপনি কি নির্মল বাবুর কথা বলছেন?"

- "ও, বাবা কেউই শেষের দিকে জেঠুকে আর সহ্য করতে পারত না। ভাবতো বুঝি আমাকে দিয়ে বলিয়ে কেতুর একটা বন্দোবস্ত করানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু জেঠু বা কেতু কেউ কখনো আমাকে কিছু বলেনি জানেন। তবে খুন, বিগ্রহ চুরি এ আমি ভাবতেও পারি না।"

- "নির্মল বাবুর ব্যবসাপত্র?"

- "ও তো রিটায়ার করার পর এক বন্ধুর সাথে একটা ব্যবসা খুলতে চেয়েছিল, কিন্তু পয়সার অভাবে সেভাবে কিছু... এখন এই একটু আধটু কলকাতায় প্রোমোটারি তে পয়সা ঢেলে...

- "অর্ধেন্দুবাবু কিছু সাহায্য করেননি?"

- "বাবা চিরকাল ভীষণ হিসেবি। এখনো বাড়ির সমস্ত খরচ ওনার হাত দিয়েই হয়। প্রোমোটারির ব্যবসাটাও বাবার পছন্দ হয়নি। চেয়েছিলেন ছেলে নিজের মতন ওকালতি করুক। তাই আর কি।"

- "খুনের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?"

- "আমি আর মনিকা দুপুর নাগাদ গয়না নিয়ে মন্দিরে যাই, গয়না বাবার আলমারিতেই থাকতো। মন্দিরের চাবিও বাবাকেই এসে ফেরত দিই আমি। মনিকা একটু ঘুমোবে বলে নিজের ঘরে যায়, আমি নীচে রান্নাঘরে এসে সন্ধ্যের জলখাবারের জোগাড় করছিলাম। কিছুক্ষণ বাদে অক্ষয় এসে আমাকে জানায়।"

একটু কেঁপে উঠলেন তাপসী।

- "আমাদের জিজ্ঞাসা শেষ, আপনি বরং অর্ধেন্দুবাবু কে ডেকে দিন একটু।"

মহিলা যেতেই সরোজ বলে উঠল,

- "অর্ধেন্দুবাবু কে জেরা করে কি বিশেষ লাভ আছে? অক্ষয়ের খুনের মোটিভ কিন্তু অনেক বেশি স্ট্রং। বা নির্মলবাবুর।"

- "অক্ষয়বাবুকে জেরা করব সব শেষে। বাইরের একজন লোক, এবং বাড়ির সমস্ত খবর আছে। চুরি করার দরকার কতটা জানা দরকার, কিন্তু খুন? খুন কেন করবে কেউ বুড়ো লোকটাকে। চোখে দেখে না, কানে শোনে না, এরম লোকের শত্রু কে?"

চামড়ার চটির আওয়াজ হল দরজায়,

- "আসতে পারি?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
(হস্তিমূর্খ)

জটিল এবং সরোজ একটু চমকেই উঠল অপ্রত্যাশিত মহিলা কণ্ঠস্বরে। তবু জটিল গলায় যথাসম্ভব গম্ভীরভাব এনে বলল – প্লিজ, প্লিজ কাম। ঘরে ঢুকলেন আনুমানিক বছর ত্রিশের এক মহিলা। সরোজই জটিলকে শ্যামলীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। "জ্যাঠাবাবু বিশ্রাম নিচ্ছেন, তাই আপনাদের বলতে বললেন উনি একটু পরে আসবেন। আর জানতে চাইলেন আপনাদের চা-জলখাবার খেয়েছেন কিনা, নাহলে আমি কিছু..."

"আপনি ব্যস্ত হবেন না, আপনিই কি অর্ধেন্দুবাবুর দেখাশোনা করেন?" – জটিল জানতে চাইল।

- "খানিকটা তাই। আমার হাজব্যান্ড মূলত বাইরের কাজকর্ম, কিছু অফিসিয়াল কাজকর্ম এগুলি দেখেন।"

- "অফিসিয়াল বলতে?"

- "কাজ কমিয়ে দিলেও জ্যাঠাবাবুর কাছে অনেকেই এখনও আসেন কনস্যালটেন্সি চাইতে, সেসব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ম্যানেজ করা, দরকারি কাগজপত্র ড্রাফট বানিয়ে ই-মেল করা এইসব।"

- "আচ্ছা শ্যামলী দেবী, এই যে বাড়িতে একটা চুরি হল, সঙ্গে একটা খুন, আপনার কি মতামত?"

সরোজ বুঝল জটিল সময় নষ্ট করতে রাজি নয়।

- "আমার আর নতুন করে কি মত থাকতে পারে বলুন? যা বলার তো ওনাকে বলেছি, এছাড়াও হাজার হোক আমরা কর্মচারী মানুষ, আর এসব অনেক বড় ব্যাপার।"

- "শর্মি মেয়েটির সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?"

প্রশ্নটি করেই জটিল লক্ষ্য করল শুধু শ্যামলীই নয়, সরোজও একটু চমকে উঠল। শ্যামলীকে চুপ করে থাকতে দেখে জটিল আবার বলল – "আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আপনি যা বলবেন তা এই তিনজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।"

"আসলে বড়দিভাই একটু অন্য টাইপের। পড়াশোনায় ভাল কিন্তু ..." – শ্যামলীর ইঙ্গিত বুঝে জটিল আবার প্রশ্ন করল – "আপনি কি করে জানলেন?"

- "আমার এক মাসতুতো ভাই কিছুদিন লেকে সিকিউরিটির ডিউটি করেছিল। ও বেশ কয়েকবার অন্য ছেলের সাথে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখেছে।"

- "প্রতিবারেই কি একই ছেলে ছিল?"

- "সেটা ঠিক বলতে পারব না, তবে ভাই যাকে দেখেছিল সে মোটামুটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে বলেই মনে হয়।"

- "আর কে জানে এ কথা?"

- "আমি ওকে একবার বলেছিলাম, ও বলল এসব ব্যাপার নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আর এই আপনাদের বললাম।"

- "হুঁ, আচ্ছা আপনার ওই ভাইটির সাথে কি একবার কথা বলা যেতে পারে?"

- "হ্যাঁ, নিশ্চয়, আমি এখুনি ফোনে ওর সাথে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।"

জটিল সামান্য কিছু সৌজন্যমূলক বাক্যবিনিময় মোবাইলটা ফিরিয়ে দিয়ে ফোন নাম্বারটা নিয়ে নিজের মোবাইলে সেভ করে নিল। আরও কিছুক্ষণ কথা চলার পরে শ্যামলী অর্ধেন্দুবাবুর ওঠার সময় হয়েছে বলে বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগেই জটিল হঠাৎ বলে উঠল – "আপনি অর্ধেন্দুবাবুকে বলে দেবেন, ওনার যদি অসুবিধে থাকে তাহলে আমরাও গিয়ে ওনার সাথে দেখা করতে পারি।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জটিল এবং সরোজের জন্যে জলখাবার নিয়ে এল কমলি। সরোজ তাকিয়ে দেখল জটিলের চোখমুখ বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। "বুঝলি সরোজ, সরেস সতেজ সরভাজা, তাও আবার খোদ কৃষ্ণনগরে বসে। জীবনটা ধন্য হয়ে গেল রে তোর সুবাদে।" সরোজ এই কথার উত্তরে নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করছে দেখে জটিল আবার মুখ খুলল – "চিন্তা করিস না, পুষিয়ে দেব। প্রায় সাড়ে ছ'টা বাজে, চল সরোজ এবার ওঠা যাক, এখানকার কাজ তো শেষ হয়ে গেল। হ্যাঁ, আরেকটা কাজ বাকি আছে। সেটা আমার দ্বারা হবে না। এই বাড়ির সবার ছবি চাই। ইনডিভিজুয়াল বা রিসেন্ট দরকার নেই। এই ধর মোটামুটি বছর খানেকের পুরনো আর গ্রুপ হলেও চলবে" – সরভাজার শেষ টুকরোটা কাঁটা চামচের আগায় লাগিয়ে মুখে তুলতে তুলতে জটিল বলল।

- "তোর কাজ শেষ?"

- "হ্যাঁ, এই তো সরভাজার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, এসে গেল, পেটে পুরে নিলাম, আর কি কাজ থাকতে পারে?"

- "কিন্তু অর্ধেন্দুবাবুকে তো..."

- "ওহ্, যাওয়ার আগে ভদ্রলোককে ওনার আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ না জানিয়ে গেলে ইল-ম্যানার্ড ভাববে বলছিস? ঠিক আছে, আজ্ঞা শিরোধার্য।"

জটিল এবং সরোজ অর্ধেন্দুবাবুর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসতেই অক্ষয় ওদের হাতে ফোটোগ্রাফের খাম দিয়ে দিল। গাড়িতে পেছনের সিটে শরীর এলিয়ে দিয়ে সরোজ জিজ্ঞেস করল

- "তুই তো সেভাবে কাউকেই ইন্টারোগেট করলি না।"

কথাটিকে পাত্তা না দিয়ে জটিল পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল – "সরোজ, চোর আর খুনির পার্থক্য বলতে পারবি?"

- "মানে? কেউ তো এখনও ধরাই পড়েনি।"

- "আরে তুই সব ব্যাপারে এত চাপে পড়ে যাস কেন? আমি জেনেরিক ডিফারেন্সের কথা বলছি।"

- "আমার দ্বারা হবে না, তুইই বল।"

- "খুব সহজ। চোর খুনি নয়, খুনি চোর নয়। একেবারে পাঁচে পাঁচ। আচ্ছা, যদ্দুর জানি বিবাহিতা তো অনেক দূর, বোধহয় অবিবাহিতা কোন বৌও নেই তোর? তাই তো?"

- "হেঁয়ালি থামিয়ে আসল কথা বল।"

- "হেঁয়ালি নয় রে, হেঁয়ালি নয়। বিয়ে করে বা না করে গোটা কয়েক পুত্রকন্যার গর্বিত জনক হওয়ার সৌভাগ্যলাভ করলে কেসটা তোর কাছে আরও একটু সুবিধেজনক হত। আর কথা নয়, সোজা নিজগৃহ। অঙ্গপ্রক্ষালনের পর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সহযোগে উৎকৃষ্ট পানীয় এবং মস্তিষ্কে ঝড়।"

- "আমি তোকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।"

- "নামিয়ে দিয়ে মানে? পুরুলিয়ায় বদলি কে হবে? তুই না আমি?"

জটিলের ইঙ্গিত বুঝে সরোজ আর কথা বাড়ালো না।

***

'চিয়ার্স' দুটি হাত উঠে গ্লাসে গ্লাসে ঠেকল।

- "জটিল তোর মদের কালেকশনের তারিফ না করে পারা যায় না!"

- "সরভাজার দাম। এনিওয়ে লেটস কাম টু দ্য পয়েন্ট। তোর কি মনে হয় বলতো?"

- "দ্যাখ আমার মনে হয় গয়না আর মূর্তিচুরি করাটাই মেইন মোটিফ।"

- "তুই ঠিকই বলেছিস, তবে মূর্তি নয় গয়না চুরিটাই ছিল মোটিফ। কিন্তু সে তো চুরি করলেই ল্যাঠা চুকে যেত। থানা-পুলিস হত, মাল পাওয়া গেলে যেত না গেলে যেত না। খুন করার দরকার পড়ল কেন?"

- "দানীবুড়ো চুরি হতে দেখেছিল বলছিস?"

- "একজ্যাক্টলি। শুধু যে দেখেছিল তাই নয়, চোরকে চিনতেও পেরেছিল। সে কারণেই তাকে মরতে হল। সরোজ, কেতুর ঘর আর দোকান ভাল করে সার্চ করা হয়েছিল?"

- "হ্যাঁ, অবভিয়াসলি।"

- "কবে করা হয়েছিল? খুন হওয়ার সাথে সাথে নাকি পরের দিন?"

- "ন্যাচারালি পরের দিন, কারণ সেদিন তো আর সময় ছিল না। জানিস তো আমাদের ফোর্সে ম্যানপাওয়ারে কি টাইপের ক্রাইসিস।"

- "উঁহু, আই ডাউট সরোজ, আই ডাউট। আসলে তোদেরই বা দোষ দিই কি করে বল? তোদের এসব নিয়েই চলতে হয়, আর আজ যদি সেরকম কোনও ক্রিমিনাল কোনও কেসে জড়িত হয়ে পড়ত, তাহলে তোরা এই ম্যানপাওয়ার নিয়েই এতটুকু ফাঁক রাখতি না, দরকার হলে ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে নিতি, কারণ ওটা তোদের অ্যাপ্রাইজাল স্ট্রং করত। আর এই পরাশ্রয়ী দুটি প্রাণী, তার মধ্যে আবার একজনের দিন ঘনিয়ে এসেছে, এই সব খুচরো ব্যাপার নিয়ে কতটা মাথা ঘামানো যায়! যাই হোক, কেতুর ঘর আর দোকানটা একটু ভাল করে সার্চ কর।"

সরোজ এই ব্যঙ্গোক্তিগুলির সাথে অত্যন্ত পরিচিত। কাজেই গায়ে না মেখে জানতে চাইল

- "তুই কি বলতে চাইছিস কেতুই ওর দাদুর খুনি?"

- "আমি কি একবারও বললাম কেতু খুনি? আমি বলেছি ওর ঘর আর দোকান সার্চ করতে।"

- "এর অন্যরকম কি মানে হয়?"

- "ধীরে বন্ধু ধীরে। পুলিসের দরকার না থাকতে পারে, আমার কিন্তু ইচ্ছে আছে মার্ডার ওয়েপনটা একবার দেখার।"

- "মানে!"

- "হ্যাঁ। এতেই অবাক হলি? জিনিসটা হাতে পেলে তো তুই ওখান থেকে একদৌড়ে কলকাতায় এসে কোনও পাঁচতারা শুঁড়িখানায় ঢুকে পড়বি আনন্দের চোটে। আর হ্যাঁ, অতিরিক্ত উৎসাহিত হয়ে যেন আবার গোটা বাড়ি সার্চ করতে যাস না, শুধু ওই একটাই ঘর..."

- "ঠিক আছে, তাই হবে"

- "আরও কতগুলো কাজ আছে। ঐ অস্ত্রটা পাওয়া গেলে কেতুকে অ্যারেস্ট করতে যেন ভুল না করে। তবে খেয়াল রাখিস খুনটা যে ওই করেছে সেটা যেন আবার ওকে দিয়ে বাই হুক অর ক্রুক কবুল না করানো হয়। ফর্মালিটি অনুযায়ী কোর্টে প্রোডিউস করে পি সি-তে নেওয়া এগুলি সব হোক, আর সেই সঙ্গে এমন একটা ভাব দেখা যেন কিনারা হয়েই গেছে। খোঁচর লাগিয়ে দে ইমিডিয়েটলি। বাড়ির লোকজন বিশেষ করে শর্মির প্রতিটি গতিবিধির খবর যেন নিয়মিত আমাকে জানানো হয়।"

- "তোর কি মনে হচ্ছে একটু খুলে বলবি?"

- "চোর বমাল সমেত চৌধুরী বাড়িতেই বহাল তবিয়তে বসবাস করছে। খালি দিন গুনছে কবে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট একটু কমে। লোকাল পি এস শুধু যে কেতুর ঘর আর দোকান ভাল করে সার্চ করেনি তাই নয়, গোটা বাড়িটার জন্যেই একই ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছে।"

- "আই জাস্ট কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইওর প্রসেস অফ ইনভেস্টিগেশন!"

- "হোয়াই?"

- "তুই বলছিস যে কেতুর ঘর থেকে মার্ডার ওয়েপনটা পাওয়া যাবে। যদিও জানি না কিসের ভিত্তিতে তোর এই কল্পনা, তবু তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই পাওয়া গেল, আবার বলছিস কেতু ইনভলভড নয়, ওকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে এসে যেন জামাই আদর করা হয়। তো ভাই সোজা করে বল না কে চুরিটা করেছে, তাকেই তুলে আনি।"

- "আরেকটা ড্রিংক নিবি? শিবকুমার শর্মার সন্তুর শুনবি? যশরাজের দ্রুত তারানা?"

- "শোন, অনেক রাত হয়েছে, সারাদিন বহুত ধকল গেছে, আর এসব ফাজলামি ভাল লাগছে না!"

- "কি করবি বল? সহ্য না করতে পারলেই তো আবার পুরুলিয়া। শোন, ওই বাড়িতে অন্তত দু'জন একটি বিশেষ সত্য গোপন করছে। আরেকজন সেই বিষয়ে যা জানে, ঠিক জানে বলা ভুল, যা বুঝতে পেরেছে তা সরাসরি না বলে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে। যাকে তাকে ধরে তুলে এনে দু'ঘা দিলেই তো যে চুরি করেছে সে কবুল করে দেবে। কিন্তু এটা কি কোনও পদ্ধতি হল? মানবিক দিক দিয়ে ভেবে দেখ তো? শান্ত হও, বন্ধু, শান্ত হও। খুনি এবং চোর দু'জনকেই তুমি সামনের শনিবারের আগেই তোমার কাস্টডিতে নিয়ে নিতে পারবে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(প্রত্যয়)

পরদিন সকাল। খবরের কাগজটা নিয়ে সবে বসেছে জটিল, এমন সময় ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরে হ্যালোর বালাই না রেখে সে বলল "হ্যাঁ, বল সরোজ..."

সরোজ ভয়ঙ্কর উত্তেজিত। কিকরে জটিল জানল সে ফোন করেছে সেটাও জিজ্ঞেস করার কথা তার মাথায় আসেনি।

- "তুই কি ম্যাজিক জানিস নাকি ভাই? কেতুর ঘর থেকে..."

- "উদ্ধার হয়েছে তবে রাধামাধবের মূর্তি?"

আরও এক দফা চমকানোর পালা সরোজের! তার গোয়েন্দা বন্ধুটির মাথা যে কোন পথে কাজ করে সেটা বোঝা দুষ্কর।

- "হ্যাঁ, আর তাতে রক্তের দাগ..." নিজেকে সামলে নিয়ে বলল সে – "কেতু কে ফাটকে পুরেছি, বিশেষ কিছু কথা বলছেনা অবশ্য, তবে দাবি করছে খুন করেনি সে। তুই আসবি?"

- "না, বরং তুইই চলে আয়। কিছু আলোচনা করতে হবে তোর সঙ্গে।"

***

আধ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে গেল সরোজ। তখনও তাকে বেশ উত্তেজিত লাগছে।

- "আগে বল তো ভাই, কিকরে বুঝলি?"

- "ওই পাথরের মূর্তিই যে মার্ডার ওয়েপন, সেটা প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল। খুব ভারী নয়, যে তোলা যাবেনা, আবার মাথায় বাড়ি মেরে খুন করার পক্ষে যথেষ্ট ভারী। সেই সঙ্গে এটা ভাব যে আমাদের হাইপোথিসিস ছিল খুনী হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে আসেনি, দানীবুড়ো তাকে দেখে ফেলায় বাধ্য হয়ে হত্যা করেছে..."

- "বা হয়তো সে ভেবেছিল দানীবুড়ো তাকে দেখেছে, কিন্তু আসলে অন্ধকারে দেখতে পায়নি। এমনিই বুড়ো চোখে কম দেখত..."

- "ভেরি মাচ পসিবল! ইন ফ্যাক্ট এটা খুব বুদ্ধিমানের মত বলেছিস। তো সে যাই হোক, খুন যদি পূর্বপরিকল্পিত না হয় তাহলে খুনী নিশ্চয়ই লোহার ডাণ্ডা জাতীয় কিছু নিয়ে ঘুরবেনা। সুতরাং..."

- "হুম, বুঝলাম। কিন্তু সেটা যে কালকেতুর ঘরে পাওয়া যাবে সেইটা কিকরে জানলি?"

- "ওটা জানতুম না। নেহাত একটা আন্দাজ। তবে ওয়াইল্ড গেস নয়। সেদিন যখন ওর সাথে দেখা করতে গেলাম, আমায় দেখেই কেমন একটা নার্ভাস হয়ে পড়ল। তোরা আগে অল্পস্বল্প সার্চ করেছিস, কিন্তু ওর ঘর সেভাবে করিসনি। তাতে ও বোধহয় হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। আমায় সেখানে দুম করে হাজির হতে দেখে কেমন ঘাবড়ে গেল। তুই হয়তো খেয়াল করিসনি, ও বারবার ওর ঘরের দিকে তাকাচ্ছিল।"

- "আই সী... কিন্তু একটা জিনিস আমার মাথায় ঢুকছেনা... টাকার লোভে দাদুকে খুন করার মত কাজ হয়তো সে করলেও করতে পারে, কিন্তু মার্ডার ওয়েপনটা গুছিয়ে ঘরে তুলে রাখবে?"

হা হা করে হেসে উঠল জটিল – "তুই বুঝি এখনও ভাবছিস কেতুই খুন করেছে?"

- "না মানে সেরকম কিছু ভাবিনি..." একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল সরোজ, "বরং আমার থিওরিটা একটু অন্য, কিন্তু ঠিক মার্ডার ওয়েপন তুলে লুকিয়ে কেন রাখবে সে?"

- "কি তোর থিওরি শুনি? হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা তথ্য লুকোচ্ছিস আমার থেকে?"

মৃদু হেসে সরোজ বলল – "রঙের টেক্কাটাই তো নামাইনি এখনও। ওই মূর্তি ছিল কেতুর ঘরের একটা বাক্সের মধ্যে খবরের কাগজ মোড়া অবস্থায়। আর সেই খবরের কাগজের মোড়কের মধ্যে ছিল আরেকটা জিনিস..."

- "কি জিনিস?" উৎসুক হয়ে ঝুঁকে পড়ল জটিল।

- "একটা শান্তিনিকেতনী চুলের কাঁটা। সেটা শর্মির মাথার কাঁটা বলে শনাক্ত করা গেছে।" যুদ্ধজয়ের হাসি সরোজের মুখে।

- "এগজ্যাক্টলি! এরকমই কিছু একটা আশা করেছিলাম! নাও এভরিথিং মেক্স সেন্স!"

- "তো আমার থিওরি হল খুনটা শর্মির কাজ। খুন করে মূর্তিটা সে ফেলে যায় ঘটনাস্থলে। আরেকটু সময় পেলে হয়তো সেটা টান মেরে পুকুরের জলে ফেলেই দিত। কিন্তু হয়তো কালকেতুর ফিরে আসার শব্দ শুনে ঘাবড়ে গিয়ে সে ওটা ফেলে পালায়। আর সেইসঙ্গে তার মাথা থেকে..."

- "বাঃ কি দারুণ কনক্লুশন! কাঁটাটা তো আগেও কখনও খুলে পড়ে থাকতে পারে তার মাথা থেকে। হয়তো সেদিন সন্ধেবেলা সে দানীবুড়োর কাছে এসেছিল। এমন হতে পারেনা?"

- "তা পারে বটে।"

- "কেতু কি বলছে? মূর্তি ওর কাছে থাকার কি ব্যখ্যা দিচ্ছে?"

- "তার বক্তব্য সে চাবি নিয়ে আসতে গিয়ে চাবিটা খুঁজে পায়না। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে তার মনের মধ্যে সন্দেহ হয় তবে কি কেউ চাবিটা চুরি করেছে? এই ভেবে দৌড়ে দাদুর কাছে ফিরে এসে দেখে এই কাণ্ড। দাদুর নাড়ি ধরে বুঝতে পারে তিনি আর ইহলোকে নেই। পাশে পড়ে রয়েছে মূর্তি আর মাথার কাঁটা। সেই দেখে

নাকি সন্দেহ হয় কেউ শর্মিকে ফাঁসাবার চেষ্টা করছে। তাই সে ওগুলো তুলে রাখে। পরে শর্মির সাথে কথা বলে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করবে এই মনে করে...”

- “দাঁড়া দাঁড়া... এর মধ্যে শর্মির সাথে ওর সেই কাঙ্ক্ষিত মোলাকাত হয়নি?”

- “না। ওখানেই ব্যাপারটা কেঁচে গেছে। খুনের পর থেকে অর্ধেন্দু এবং নির্মলেন্দুর নাকি দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে কালকেতুই খুনী। তাই তারপর থেকে কালকেতুর সঙ্গে শর্মির জনান্তিকে দেখা করা বন্ধ রেখেছেন ওঁরা। যে কবার ওদের দেখা হয়েছে, পাঁচটা লোকের সামনে। তাই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে পারেনি বোধহয়।”

- “হুম ইন্টারেস্টিং। জিগস ধাঁধার পিস গুলো খাঁজে খাঁজে মিলে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। তবু আরও দুয়েকটা ডাউট আছে। সেগুলো ক্লিয়ার করার জন্য ওবাড়ি যেতে হবে। চঃ বেরোনো যাক...”

- “দাঁড়া, আমার শেষ একটা ধন্দ পরিষ্কার কর তো দেখি। দাদুকে এত ভালবাসা সত্ত্বেও কালকেতু ওই পরিস্থিতিতে শর্মিকে একটুও সন্দেহ করল না? ভাবল তাকে অন্য কেউ ফাঁসাচ্ছে? একটু অদ্ভুত না এটা?”
হো হো করে হেসে উঠে জটিল বলল – “বন্ধু, কালই তো বলেছিলাম, প্রেম ভালোবাসার তুমি কিস্যু বোঝোনা! ভালবাসার ফাঁদে পড়ে মানুষে কত কাছের মানুষকে ত্যাগ করে কখনও দেখনি? তাছাড়া আরেকটা জিনিস তুই জানিসনা, যেটা আমি জানি।”

- “কি?”

- “শর্মি বেশ কয়েক মাসের অন্তঃসত্তা...”

- “হোয়াট? হাও দ্য হেল অন আর্থ ডু ইউ...”

- “তুই বোধহয় ভুলে গেছিস গোয়েন্দাগিরি শুরু করার আগে আমার পড়াশুনার ডিগ্রিটা ছিল ডাক্তারিতে। সেইসঙ্গে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করলে এই চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব না।”

- “ওহ গড! তার মানে সেই অন্য প্রেমিক?”
- “তিষ্ঠ বৎস! অত তাড়াহুড়ো কিসের? চ ওবাড়ি যাই। এ রহস্যের যবনিকা পড়তে আর বেশি দেরি নেই। শিগগিরই সব বুঝতে পারবি তুইও।”

জমিদারবাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে বেশ বেলা হয়ে গেল। ঢুকেই দেখা হল অক্ষয়ের সঙ্গে। জটিল তাকে বলল – “এই খুনের কিনারা আমি প্রায় করে ফেলেছি। কিন্তু দুয়েকটি জিনিস এখনও জানা দরকার। তার জন্য আমি বাড়ির সবাইকে নিয়ে বসে সবাইকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন সবাই চলে আসেন

বৈঠকখানায়। তুমি, শ্যামলী এবং কাজের লোকেরাও থাকা চাই। অত্যন্ত আর্জেন্ট, যে যাই কাজে ব্যস্ত থাকুন যেন আসেন। আমি আধ ঘন্টার বেশ সময় নেবনা।"

আধঘন্টার মধ্যে অক্ষয় এসে জানাল সবাই রেডি। ওরা দুজন হাঁটা লাগাল বৈঠকখানার দিকে। ঢোকার আগে সরোজের কানে কানে জটিল বলল – "একটা প্রশ্ন তোকেও করার আছে। যদি ভুলে যাই মনে করাস সময় মত।"

ঘরে ঢুকে ওরা দেখল সবার মুখ থমথম করছে। অর্ধেন্দু বলে উঠলেন – "আর প্রশ্নোত্তরের কি দরকার আছে? খুনী তো গ্রেফতার হয়েছে ইতিমধ্যেই।"

মৃদু হাসল জটিল – "সবাইকে একটা দুটো করে প্রশ্ন করব। আপনাকে দিয়েই শুরু করি অর্ধেন্দুবাবু। আপনি কি সত্যিই মনে করেন কালকেতু খুন করেছে? যে দাদুকে সে এত ভালবাসত, তাকে খুন করবে নিজের হাতে?"

- "আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি, টাকার লোভে মানুষ সব করতে পারে। শুধু আমি না, নির্মল আর বাকিরাও এটাই বিশ্বাস করে যে কেতুই এ কাজ করেছে।"

নির্মলের দিকে চেয়ে জটিল বলে উঠল – "সত্যি নির্মল বাবু? আমাদের তো মনে হচ্ছে কালকেতু খুব কাছের কোনও মানুষকে বাঁচাতে হত্যার অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল।"

- "না! শর্মি এমন কাজ করতেই পারেনা!" – হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন যেন তাপসী!

- "আমি এখনও সেরকম কিছু বলেছি কি?" বলল জটিল। "তবে তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কিছু এভিডেন্স পাওয়া গেছে একথা তো অস্বীকার করা যায়না। কনক্লুসিভ এভিডেন্স পাওয়ার জন্য আমাদের বাড়িটা একবার ভাল করে সার্চ করতে হবে। গতবারের সার্চে কিছু পাওয়া যায়নি অবশ্য। কিন্তু সে সার্চ খুব আলগা ভাবে করা হয়েছিল।"

- "যত খুশি সার্চ করুন। তবে তার আগে ওই কালকেতুর ঘরগুলো ভাল করে খুঁজে দেখলে হত না? গয়নাগুলো নির্ঘাত ওখানেই আছে।" বললেন কৃষ্ণেন্দু।
সরোজ বাধা দিয়ে বলল – "ও ঘর আজ আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি..."

- "তাছাড়া গয়না এবাড়ি থেকে পাচার হয়ে গেছে বলেই আমার ধারণা" – জটিল বলল।
চমকে উঠল সরোজ... "কিন্তু খুনের পরদিন থেকেই তো পুলিশি পাহারা বসেছে, কিকরে পাচার হবে?"
জটিল কেবল হাসল।

- "আমার শেষ প্রশ্ন শর্মিকে..."

- "হ্যাঁ বলুন", শর্মি কেমন যেন ভেঙে পড়েছে।

- "তোমার চুলের কাঁটা ঘটনাস্থলে গেল কি করে?"

- "আমি ঠিক জানিনা... মানে... আমার মনে হয় তার আগের রাত্রে আমি কেতুর কাছে গেছিলাম, তখন হয়তো ওর ঘরেই পড়ে গেছিল..."

- "কিন্তু কেতু তো অন্য কথা বলছে। তাহলে কি সে-ই মিথ্যে কথা বলছে? সে-ই খুনী?"

- "না! না না! ও করতেই পারেনা এ খুন! অসম্ভব!" দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল শর্মি।

- "কি চান বলুন তো আপনি? মিছিমিছি চাপ সৃষ্টি করছেন কেন আমাদের পরিবারের লোকেদের ওপর?" বেশ রেগেই বললেন নির্মল।

- "আর কিছুই চাইনা। আমার যা জানার জানা হয়ে গেছে। তবে কাল সকালে গোটা বাড়ি সার্চ করবে পুলিশ। তখন প্লিজ সহযোগিতা করবেন। আর হ্যাঁ সরোজ, আজ সন্ধ্যের পর পুলিশি প্রহরা সরিয়ে নিতে পারিস। তারপর তো আর কেউ বেরোবেন না এমনিতেই।"

- "কিন্তু আপনার তো ধারণা মাল পাচার হয়ে গেছে। তবে সার্চ করে কি বার করবেন?" নির্মলের প্রশ্ন।
স্মিত হেসে জটিল বলল – "আপনারা হয়তো ভুলে গেছেন, ঘটনার পর থেকে সেই চাবিটা কিন্তু নিরুদ্দেশ। আসি আজ। নমস্কার।"

***

বাইরে বেরোনোর পর সরোজ বলল "তুই আমায় কি জিজ্ঞেস করবি বলেছিলি,করলি না তো?"

- "হ্যাঁ। বাই দ্য ওয়ে, শর্মি কিন্তু তোর হাঁটুর বয়েসি। ওভাবে ওর প্রতি সফট কর্নার তৈরি করিস না ভাই।"

- "মানে? কি বলতে চাস তুই?"

- "কিছুই না। সুন্দরী, রূপবতী যুবতী। বেশিরভাগ ব্যাচেলর পুরুষই তাকে একটু অন্যরকম চোখে দেখবে। তবে কিনা, তদন্তের স্বার্থে তোকে আনবায়াসড থাকতে হবে। এই আর কি।"

- "বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস কিন্তু জটিল। তোকে তদন্তে সাহায্যের জন্য ডেকে এনেছি মানে এই নয় যে যা তা বলবি! তুই কি ইঙ্গিত করতে চাস? আমি শর্মির সঙ্গে নয়ছয়ে যুক্ত?"

- "আরে চিল! যা হোক, আমার আসল প্রশ্নটা ছিল অন্য। এখানে যে পুলিশী প্রহরা বসিয়েছিস, তার মধ্যে রতন নামে কেউ আছে?"

- "তুই কি করে চিনলি রতন কে?" অবাক প্রশ্ন সরোজের।

- "অর্থাৎ আছে। বেশ। তা এই রতন পুলিশে চাকরি করার আগে কি করত জানিস?"

- "যদ্দুর জানি কিছু একটা বেসরকারী সংস্থার হয়ে ডিউটি করত।"

- "হুম। এক্স্যাক্টলি কি করত ইত্যাদির একটু ডিটেইল সংগ্রহ কর আজ বিকেলের মধ্যে।"

- "সে নাহয় করলাম। কিন্তু ব্যাপার কি বল তো?"

- "ধৈর্য ধর বাছা", হেসে বলল জটিল, "চল অনেক বেলা হল, লাঞ্চটা সেরে নিই কোথাও।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ
(পিব্যান্ডস)

পরেরদিন বিকেলবেলার মধ্যে জটিলের নির্দেশে যাবতীয় খানাতল্লাশি সম্পন্ন হল। সকাল থেকে সময় যতই এগিয়েছে, আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটায় জটিলের হাসি ততই চওড়া হয়েছে, আর পুলিশ বিভাগের ব্যর্থতা স্পষ্টতর হওয়ায় সরোজের মুখ ততই শুকিয়ে আমসি পাকিয়েছে।

বিকেল সাড়ে চারটেয় জটিল ঘোষণা করে দিল সন্ধে ছ'টায় চৌধুরিবাড়ির বৈঠকখানায় অন্তিম সভা বসবে আর সেখানেই এই রহস্য-নাটকের যবনিকা পতন।

নির্দিষ্ট সময়ের মিনিট দশেক আগেই বৈঠকখানার ঘর পরিপূর্ণ। ঝি-চাকরশুদ্ধু বাড়ির সকলেই জটিলের নির্দেশে এসে উপস্থিত হয়েছে। এমনকি, মাঝখানে উঠে যেতে না হয়, তাই কমলিও কয়েকটা ফ্লাস্কে চা করে এনে টেবিলে রেখেছে। সঙ্গে রয়েছে তাপসীদেবীর হাতে গড়া মালপোয়া।

বড় পেটাঘড়িটায় সন্ধে ছ'টা বাজার রেশ কাটতে না কাটতেই সরোজকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকল জটিলেশ্বর। তাদের সঙ্গে আর একজনও। কালকেতু। কেতুর হাতকড়া খুলে দেওয়ার অনুরোধ করে তাকে সামনের একটা ফাঁকা আসনে বসতে বলে ক্লান্ত জটিল নিজেই একটা ফ্লাস্ক থেকে এক কাপ চা ঢেলে নিল। তৃপ্তির চুমুকের সঙ্গে চারিদিকটা এবং প্রত্যেকের মুখ ভাল করে নিরীক্ষণ করে নিল। পিন-পড়া নিস্তব্ধতাটাকে বেশ উপভোগ করল সে। সকলেই তার

দিকে চেয়ে বসে আছে মোমের পুতুলের মতো। সকলেই জড়সড়, শুধু শর্মিষ্ঠা তার মায়ের পাশে বসে ক্রমাগত ওড়নার খুঁট দাঁত দিয়ে কাটছে। চায়ের কাপ টেবিলে রেখে জটিল নায়কোচিত ভঙ্গিমায় তার বক্তব্য শুরু করল—

"একটু আগেই আমি আমার বাবা স্বর্গীয় মিথিলেশ্বর সেনের দূরদৃষ্টির প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালাম। একদিন যে এমন দুরতিক্রম্য জটিল কেসও সলভ করে ফেলতে পারব তা জেনেই হয়তো তিনি আমার নাম দিয়েছিলেন জটিলেশ্বর।

"যাই হোক, আর আমার গুণগান না গেয়ে জানিয়ে দিই যে গয়না, মূর্তি ও খুনের হাতিয়ার উদ্ধার হয়েছে এবং খুনিকেও নির্দিষ্ট করা গিয়েছে।

"এখানে বলে রাখি যে রহস্যোদ্ঘাটনের তাগিদে আমাকে চৌধুরীবাড়ির সংশ্লিষ্ট মানুষদের অনেক ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আপনারা সকলেই একে অন্যকে অন্তত দশ বছর ধরে জেনে-চিনে আসছেন সেহেতু আমি সকলের সামনেই ব্যক্তিগত আলোচনাগুলো করবার অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি। কারও আপত্তি থাকলে নির্দ্বিধায় জানাতে পারেন।"

মিনিটখানেক সময় নিল জটিল। কারও আপত্তি নেই দেখে আবারও শুরু করল -

"বলা বোধহয় বাহুল্য প্রথম থেকেই একটা জিনিস বুঝে গিয়েছিলাম। সেটা হল খুনি এবং চোর বহিরাগত নয়। কারণ চুরিটা মন্দিরের দরজা ভেঙে হয়নি আর খুনটাও মোটেই কাকতালীয় নয়। এও বলব যে অপরাধী এক বা একাধিক যতজনই হোক না কেন সে বা তারা প্রত্যেকেই পাকা অবরাধী নয় বলে নানারকম ভুলভ্রান্তি করে আমার কাজে প্রভুত সাহায্য করেছে।

"যেমন আমাদের মধ্যে উপস্থিত সুদর্শনতম পুরুষ কালকেতু চক্রবর্তীর কথাই ধরা যাক না," জটিল কেতুর দিকে ফিরল, "তার জবানবন্দীতে কালকেতু আমাদের জানিয়েছে যে সে তার ঠাকুরদা নিহত দীননাথ চক্রবর্তীকে সিমেন্টের বেদীতে বসিয়ে রেখে অর্ধেন্দুবাবুর কাছে মন্দিরের চাবি চাইতে যাচ্ছিল, এমন সময় পিছন থেকে বাগানের মালী অমরনাথ দৌড়ে এসে তাকে দীননাথবাবুর মৃত্যু সংবাদ দেয়। কী, তা-ই তো, কেতু?"

কেতু হ্যাঁবাচক ঘাড় নাড়ে।

"কিন্তু কেতু তুমি নিশ্চয়ই জান যে ওই সময়ের মধ্যে তোমার দাদু খুন হয়েছেন, কোনও টু-মিনিট নুডল রান্না হয়নি?"

"মানে!" কেতুর গলায় ছদ্ম রাগ।

"মানেটা বোধহয় অর্ধেন্দুবাবুর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হতে পারে। অর্ধেন্দুবাবু, কেতু বলেছে যে চাবিটা সে আনতে আপনার কাছে যায়নি। এই চাবির বিষয়ে আপনার কোনও বক্তব্য রয়েছে?"

অর্ধেন্দুবাবু সোজা হয়ে বসলেন, "আলবাৎ আছে। কেতু সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলছে। কেতু সেদিন সন্ধেয় আমার কাছে চাবি আনতে এসেছিল। সে চাবি আমি ওকে দিই।"

"ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন, অর্ধেন্দুবাবু।"

অর্ধেন্দুবাবু বললেন, "এ আর খুলে বলার কী আছে! আমার বিছানার একদিকে থাকে আমার সিন্দুক, আর একদিকে থাকে একটা কাঠের আলমারি। সেই আলমারির ড্রয়ারে থাকে মন্দিরের চাবি। ড্রয়ারটা সব সময় লক করা থাকে। এই ড্রয়ার আর সিন্দুক সহ আরও কিছু চাবির একটা গোছা সর্বদা আমার সঙ্গে থাকে। সেদিন কেতু আমার কাছে চাবি চাইতে এল আর আমি রোজকার মতো সেই চাবির গোছাটা ওর হাতে দিলাম। কেতু ড্রয়ার খুলে মন্দিরের চাবি বের করে নিয়ে আবার ড্রয়ার লক করে মূল চাবির গোছাটা আমার হাতে দিল।"

"অর্থাৎ মন্দিরের চাবি আপনি কেতুর হাতে দেখেছেন, তাই তো?" জটিল জিজ্ঞাসা করে।

"ওইভাবে তো আর লক্ষ করিনি, কোনওদিন করি না। মন্দিরের চাবি ছাড়া ড্রয়ার খুলে আর তো কিছু নেবার নেই। কেতু সেদিন অবশ্যই মন্দিরের চাবি নিয়েছিল।"

"কী কেতুবাবু, অর্ধেন্দুবাবু কি মিথ্যে কথা বলছেন, নাকি তুমি সত্যি কথা বলার শেষ একটা সুযোগ নেবে?"

কেতু মাথা নীচু করে ফেলল। তারপর বলল, "সেদিন অর্ধেন্দুদাদুর কাছে চাবি চাইতে গিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু ড্রয়ার ছিল ফাঁকা। আমি শুধু চাবিটা নিয়ে আসার অভিনয় করেছিলাম মাত্র।"

"কিন্তু কেন?"

"অর্ধেন্দুদাদু যদি আমাকেই দোষী বলে দেন সেই ভয়ে।"

"দোষী তো তুমি বটেই কেতু। এখনও তুমি মিথ্যে বলছ। বড্ড কাঁচা মিথ্যে। রাতের অন্ধকার ছাড়া ওই ড্রয়ার থেকে চাবি চুরি করা সম্ভব নয়। সকালে মনিকাদেবী ও ফুল্লরা অনেকের সামনেই রাধামাধবকে গয়না পরিয়েছেন। তারপর সেখানেই অর্ধেন্দুবাবুর হাতে চাবি দিয়েছিলেন মনিকাদেবী। সেই চাবি ড্রয়ারে রেখে ড্রয়ার লক করে বড় চাবির গোছা বরাবরের মতো নিজের কাছেই রেখেছিলেন অর্ধেন্দুবাবু। আমি দেখেছি যে তাঁর ঘরের দরজাতেও সব সময় ল্যাচ লাগানো থাকে এবং শব্দ না করে তাঁর ঘরে প্রবেশ অসাধ্য। আর, দিনের বেলায় অর্ধেন্দুবাবু ঘুমোন না। সুতরাং তুমি আবারও মিথ্যে বললে। একটা দুর্বল মিথ্যে বলে চেষ্টা করলে নিজেকে ও আরও কাউকে বাঁচাবার জন্যে। ও কী, মা? ওড়নাটা পুরোটাই খেয়ে ফেলবি নাকি রে?"

শেষ কথাটা জটিল বলেছে শর্মির দিকে দৃষ্টি রেখে। শর্মি ঝট করে তার ওড়নার খুঁট ছেড়ে দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। জটিল তাপসীর দিকে তাকাল, "আচ্ছা তাপসীদেবী, আপনার মেয়ের এই দাঁত দিয়ে ওড়না কাটার স্বভাবটা কবে থেকে?"

"কী হচ্ছেটা কী! শর্মির স্বভাবের সঙ্গে এই কেসের কী সম্পর্ক?" নির্মলেন্দু চেঁচিয়ে উঠলেন।

"আস্তে নির্মলেন্দুবাবু," জটিল হাত তুলল, "দয়া করে আমার কাজে সহায়তা করুন। ভুলে যাবেন না রাধামাধবের মূর্তির সঙ্গে শর্মির চুলে কাঁটা পাওয়া গিয়েছে।"

"ছোটবেলা থেকেই," তাপসী বললেন, "কখনও রুমাল তো কখনও ওড়না। খুব টেনশন হলে বা কারও জন্য অপেক্ষা করলে ও এটা করে।"

"ভাগ্যিস করে।" এই বলে জটিল তার বুকপকেট থেকে দু'গাছা কমলা রঙের সুতো বের করে তুলে ধরল, "জেরায় শর্মিষ্ঠা জানিয়েছে যে খুনের দিন সে সবুজ রঙের সালোয়ার কামিজ আর কমলা রঙের ওড়না পরেছিল। এই দুটো সুতো পাওয়া গিয়েছে মোরামের রাস্তার পাশে ঘাসের উপরে। সেখানেই তো শর্মি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল কালকেতুর জন্য। কী, তাই তো, শর্মি?"

"হ্যাঁ," শর্মি হাঁপাচ্ছে, "কিন্তু আমি চুরি করিনি।"

"বেশ। এবার বাকিটা তুমি বলো।"

"কেতু আমাকে বলে রেখেছিল অপেক্ষা করতে," শর্মি বলে, "কিন্তু কেন সেটা আমি বলব না।"

"বলতে হবেও না শর্মি, কারণ সেটা আমি জানি। তুমি শুধু তারপরে কী হল বলো।"

"কেতু দানীদাদুকে বসিয়ে রেখে আমাকে এসে বলল আর একটু দাঁড়াতে। ওদিকে দাদু ডাকছে, দেরি দেখলে সন্দেহ করবে। ও বাড়ির দিকে ছুটে গেল আর একটু বাদেই চলে এল হাতে চাবি নিয়ে। তারপর একটু কথাবার্তার পরে ও আমাকে চাবিটা দিয়ে বলল আমি যেন মন্দিরটা খুলে দিই আর ও বাড়ির দিকে যাবে, একটু কাজ আছে। আমি মন্দিরের দিকে এগোলাম। দানীদাদু উদাস হয়ে গান গাইছিল, শুনতে খুব ভাল লাগছিল বলে ডাকিনি। কিন্তু মন্দিরের দরজা খুলে দেখি... বিশ্বাস করুন... গয়না, রাধামাধব সব অদৃশ্য!"

ঘরে একটা অবাক হওয়ার রব উঠল। জটিল বলল, "কিন্তু তুমি তখনই চেঁচালে না কেন?"

সেখানে তখন আমি ছাড়া আর কেউ নেই। দানীদাদুও আপনমনে গান গেয়েই চলেছে। বুঝলাম সে আমাকে দেখতে পায়নি। ওই অবস্থায় লোক জানাজানি করলে সকলে তো আমাকেই সন্দেহ করত।"

"তাই তুমি ঝটপট আবারও তালায় চাবি দিয়ে, তালাটা ভাল করে তোমার ওই গেরুয়া ওড়না দিয়ে মুছে নিলে। তাই তো? তালায় কোনওরকম হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গিয়েছে তা হল তোমার সেই ওড়নারই একটা সূক্ষ্ম রোঁয়া।"

শর্মিষ্ঠা মাথা নীচু করে সম্মতি জানাল। জটিল বলল, "তুমি নিশ্চয়ই ততক্ষণে আন্দাজ করেছিলে যে কেতু তোমাকে ফাঁসাচ্ছে। তারপর তুমি ঘুরে পুকুরের পাশ দিয়ে পালিয়ে এলে আর পুকুরে ফেলে দিলে চাবিটা। ঠিক বলছি?"

শর্মিষ্ঠার মাথায় হাত। এটাও তার সম্মতিরই লক্ষণ।

"কিন্তু তাহলে চুরিটা করল কে? কিভাবেই বা করল?" এবার বললেন অক্ষয়।

"সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য অক্ষয়বাবু", জটিল আবারও বরাভয়ের ভঙ্গিতে হাত তুলল, "তার আগে বরং একটু অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক।" আবারও কেতুর দিকে লক্ষ জটিলের, "কালকেতু, তুমি তোমার ইমেলবক্সের বেশ কিছু মেল সম্প্রতি ডিলিট করেছ। জানতে পারি সেগুলো কার?"

"তার সঙ্গে খুন আর চুরির কী সম্পর্ক?" কেতু বলে ওঠে।

"অ্যাইদ্দ্যাখো, সম্পর্ক না থাকলে আর বলছি কেন। আমি কি আজ আসর বসিয়ে পিএনপিসি করতে এসেছি? বেশ আমিই বলছি। পুলিশের সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চকে তোমার মেলবক্স চেক করতে বলেছিলাম। সেই মেলগুলো ছিল তোমার সঙ্গে একজন মহিলার সম্পূর্ণ ইংরেজিতে প্রেমালাপ। তাঁর নাম লওরা ফ্লাওয়ার। "আপাতত শুধু জানতে চাই ভদ্রমহিলা কোথায় থাকেন।"

"লন্ডনে," কেতুর জবাব।

"আচ্ছা! বিদেশিনী তো?"

"অবশ্যই।"

"অবশ্যই না, মিস্টার কেতকুমার। আপনি আবারও মিথ্যে বলছেন।" এবার জটিলের চোখ বিদ্যুৎগতিতে শর্মিষ্ঠার উপর ঘুরে এল। শর্মির অবিশ্বাস ও ঘৃণাবহ দৃষ্টি কেতুর উপরে নিবদ্ধ। জটিল বলল, "সামলে শর্মি ম্যাডাম, সামলে। উওম্যান প্রপোজেজ আর ম্যান ডিসপোসেস। বুঝলে কিনা? হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেরকমই ছিল অন্তত দু'বছর আগে অবধি, যতদিন না কেতুও 'ডিয়ার এপ্রিল ফুল' বলে তাকে সম্বোধন শুরু করল।"

"মানে?" শর্মি উঠে দাঁড়িয়েছে।

"মানেটা বোধহয় মনিকাদেবী একটু পরিষ্কার করতে পারবেন। কী মনিকাদেবী, আপনার মেয়ের জন্মদিন তেসরা এপ্রিল তো?"

"হ্যাঁ", মনিকার ছোট্ট জবাবের ভঙ্গিতে মনে হল তিনি যেন আগে থেকেই আন্দাজ করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর অসন্তোষ ছিল।"

"লওরা ফ্লাওয়ার। ওলটালে কী হয়? ফুল-লরা। আসুন ম্যাডাম, সামনে একটু এগিয়ে আসুন, আপনার মুখটা দেখি।" জটিলের ডাকে ফুল্লরা বাধ্য হল জটিল আর সরোজের মাঝের ফাঁকা চেয়ারটায় এসে বসতে।

"দিল্লিতে গিয়েছিলে কি টুর্নামেন্ট খেলতে, কালকেতু? ফুল্লরার সঙ্গে ঘোরাঘুরিটা তো সেখানেই বোধহয় প্রথম হয়?"

"বেশ করেছি ঘুরেছি। আমি ফুল্লরাকেই ভালবাসি।" উঠে পড়েছে কালকেতু। রাগে তার ফরসা গাল লাল হয়ে উঠেছে। কপাল ঘেমে গিয়েছে, "বোকা তো, তাই ছোট থেকেই শর্মিকে ভালবেসেছিলাম। ফুল্লরা আমাকে মনেপ্রাণে চাওয়া সত্ত্বেও ওর দিকে ফিরেও তাকাইনি। আমার দাদুটাও বোকার হদ্দ। আমাকে আর শর্মিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে গেছে। আরে বাবা, কালকেতুর জন্য চিরকালই ফুল্লরা ছিল, থাকবেও। সেটাই তো স্বাভাবিক। আসল দুরদৃষ্টিটা ছিল আমার বাবার। আমার নাম কালকেতু তো বাবাই রেখেছিল। চৌধুরী বংশের পুরোহিত হিসেবে নামকরণগুলো তখন বাবাই করত। শর্মিষ্ঠা নামটা তাঁরই রাখা। কিন্তু কৃষ্ণকাকুর মেয়ে হতে তার নাম দুম করে ফুল্লরা রেখে দিল কি এমনি এমনি! এই নিয়ে অর্ধেন্দুদাদু কম রাগারাগি করেনি। কিন্তু কৃষ্ণকাকু-কাকিমা কখনও খারাপভাবে নেয়নি। তারা হয়তো ভেবেছিল আমরা দুজনে ভারতের দু'প্রান্তে আছি আর বছরে মাত্র একবার এ বাড়িতে দেখা। এতে কোনওরকম সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভবই না। কিন্তু ভুল করেছিলাম আমি। ওই শর্মি হারামজাদীটাকে ভালবেসে। প্রতিদানে কী দিল আমাকে? অন্য একটা ফালতু ছেলেকে ভালবাসতে শুরু করল! যাকে আমি সব দিলাম তার কাছে কি এটা পাওনা ছিল? তাহলে ফুল্লরা যে আমাকে ছোটবেলা থেকে চেয়ে এসেছে, আমি শর্মিকে ভালবাসি জানা সত্ত্বেও, তাকে আমি আমার ভালবাসা দেব না কেন!"

"শান্ত হও কেতু, বোসো," জটিল কেতুর কাঁধ চাপড়াল, "আমিও কাউকে একদিন ভালবেসেছিলাম মনপ্রাণ দিয়ে। তোমার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি। আচ্ছা এটা বলো তো, রতনের সঙ্গে শর্মির সম্পর্কটা তুমি কবে জানতে পারলে?"

"গত বছরের আগের বছরের ফেব্রুয়ারিতে।"

"কীভাবে জানলে?"

"লুকিয়ে শর্মির মোবাইলে আমি একটা চ্যাট কনভার্সেশন পড়ে নিয়েছিলাম। তারপরে আর কিছুই জানার বাকি ছিল না।"

"তুমি কি রতনকে দেখেছ?"

"দেখবার দরকার নেই।"

"সত্যি? আমি যদি বলি সে এখানেই আছে তাহলেও না?"

"এখানে? কোথায় সে? দ্যাখান!"

হেসে উঠল জটিল, "দাঁড়াও, তোমায় দ্যাখাচ্ছি।" জটিল সরোজের দিকে তাকাতেই সরোজ উঠে গিয়ে বাইরে থেকে লম্বা সুঠাম এক মাথানীচু যুবক পুলিশকর্মীকে নিয়ে এল।

জটিল ঘোষণা করল, "বন্ধুগণ, পুলিশকে যে আপনারা গালাগাল দ্যান, তার একটা ছোট কারণ অবশ্যই আমাদের এই রতন শিকদার।"

"আরে! এইবার মনে পড়েছে কেন একে চেনা-চেনা লাগছিল," এতক্ষণে মুখ খুললেন শর্মির বাবা নির্মলেন্দু।

"শয়তান!" কেতু ঘুসি বাগিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"বোসো কেতু। জানি রতন তোমাকে খুব জ্বালিয়েছে," রতনের ঘাড়ের কলার ধরে বলল জটিল, "তা রতনবাবু, শুধু সাসপেন্ডেই যদি খুশি থাকতে পারো, জেল যদি না চাও, তাহলে গুছিয়ে বলে ফ্যালো তোমার কাণ্ডকারখানা।"

একটু চুপ করে থেকে রতন বলল, "কলকাতায় নির্মলেন্দু স্যারের সিকিউরিটি কোম্পানীতে থাকতেই আলাপ হয়েছিল শর্মিষ্ঠার সঙ্গে। তখন সে গ্র্যাজুয়েশন পড়ছিল কলকাতায়। আমরা দুজন দুজনকে খুব ভালবেসে ফেললাম। শর্মিও বলে যে সে আমার মতো মানুষের জন্যই ওয়েট করছিল। কেতুর কথাও সে আমাকে বলেছিল। বলেছিল যে সে দানীবুড়োকে খুব ভালবাসে আর সেইজন্য দানীবুড়োর দিকে তাকিয়েই বাধ্য হয়ে কেতুর সঙ্গে অভিনয়টা চালিয়ে যাচ্ছে। বলেছিল কেতুও শর্মিকে খুব ভালবাসে।"

"তোমার পুলিশের চাকরিটা নির্মলেন্দুবাবুর সুপারিশেই হয়, তাই তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে এত লোক নিয়ে উনি ডিল করেন তো, আমাকে মনে না থাকারই কথা।"

"এই কেসে তুমি কীভাবে জড়িত সেটা সবাইকে বলো।"

"মানে, স্যার, কয়েকটা ঘরে সার্চিংয়ের সময় আমি সুপারভাইজার ছিলাম। সরোজস্যারকে বললাম, 'স্যার, শর্মিষ্ঠা ম্যাডামের ঘরটা অত সুন্দর গোছানো, ওরা তো সব ওলটপালট করে সার্চ করছে, আমি যদি একা ওই ঘরটা করি

তাহলে লণ্ডভণ্ডটা কম হবে। স্যার মেয়েটার মুখ দেখে খুব মায়া লাগল। সবাই বলছে দানীবুড়োকে ও খুব ভালবাসত।' তো, স্যার বললেন, 'আচ্ছা যা ঠিক আছে, কর গিয়ে'।"

জটিল আড়চোখে সরোজের দিকে তাকাতেই সরোজের অপরাধী-চোখ দেওয়ালের উপরে একটা টিকটিকি দেখতে লাগল। "তারপর? একদম সত্যি করে বলবে।"

"স্যার, তারপরে শর্মির ঘরে আমি একটা কাগজে মোরা কষ্টিপাথরের রাধামাধবের মূর্তিটা পেলাম। আমি তখন ঘরে একেবারে একা। আমার সারা শরীর কাঁপছিল। স্যার, বিশ্বাস করুন, শর্মিকে আমি যতটা চিনেছি তাতে ওই কাজ ও কিছুতেই করতে পারে না। আর যদি ভুল করে চুরি করেও ফ্যালে, ওকে যে আমি ভালবাসি। কীকরে ওকে ধরা পড়তে দিই বলুন?"

"তাই তুমি ওই মূর্তি বের করে কেতুর ঘর আবারও সার্চ করার নাম করে সেখানে রেখে এলে, তাই তো?"

"মানে, হ্যাঁ স্যার। আসলে এটাও ঠিক যে কেতুকে আমি ঠিক পছন্দ করতে পারতাম না। আমার বারে বারে মনে হত ওর চেহারা, ও গায়ের রং, ওর ওই ফটাফট স্মার্টলি ইংরেজি বলা, আবারও শর্মিকে ওর দিকে টেনে নিয়ে যাবে কোনওদিন।"

জটিল বলল, "বেচারা কেতু। তিন-তিনবার সার্চিং! ভাবা যায়!"

"কিন্তু এখনও তো বুঝতে পারছি না, শর্মি যদি চুরি না করে থাকে তাহলে করলটা কে? আর, মূর্তির সঙ্গে তো শর্মির চুলের কাঁটাও পাওয়া গিয়েছিল। তাহলে?" এবারে উত্তেজিত ফুল্লরার বাবা কৃষ্ণেন্দু।

"প্লিজ, আর একটু ধৈর্য ধরুন কৃষ্ণেন্দুবাবু। আমি তো সব কথাই বলতে এসেছি। কিন্তু আগেই যে বললাম, বিষয়টা অতীব জটিল। একেবারে টেনে ছাড়াতে গেলে আরও জট পাকিয়ে যাবে যে," জটিল এবার দু'হাত তুলে থামাল। তারপর একটা মালপোয়া ছিঁড়ে মুখে ফেলে বলল, "আচ্ছা কেতু, তোমার ইলেকট্রনিক্সের দোকানে একটা কর্মচারী আছে, তাই তো?"

"হ্যাঁ।"

"সে আমাকে জানাল যে তুমি নাকি খুনের দুদিন আগে থেকেই দোকানে বসছ না। কারণটা জানতে পারি?"

"কারণ তো খুবই সোজা, চৌধুরিবাড়িতে এত বড় অনুষ্ঠান। এত কাজ..."

"কিন্তু খুনের দিন সকালে তো তুমি কয়েক মুহূর্তের জন্য সাইকেল নিয়ে তোমার দোকানে গিয়েছিলে। কিসের জন্য?"

“আপনি নিশ্চয়ই সেটাও জেনে ফেলেছেন।”

“আমি তো সবই জানি। কিন্তু তুমি সবাইকে জানাও।”

“একটা ব্লুটুথ হেডসেট।”

“ওই ছোট্ট মতো, এক কানে লাগায় যেগুলো?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“ওটা তোমার দরকার ছিল?”

“হ্যাঁ তো।”

“তা, অত সস্তার জিনিস নিলে কেন?”

“তাতে কী?”

“না, তোমাকে অত সস্তার জিনিস ব্যবহার করতে তো দেখি না, তাই আর কী। তোমার মোবাইলটা অত দামী, আর হেডসেট অত সস্তার?”

“হ-হতেই পারে।”

“হ্যাঁ, তা হয়তো পারে। তা, জিনিসটা দেখি?”

“কেক্-কেন?”

“কেন নয়, বলো কীভাবে। কারণ সেটা তুমি দেখাতে পারবে না।” এই বলে জটিল নিজের বুকপকেট থেকে এবার বের করল একটা ছোট কালো রঙের ব্লুটুথ হেডসেট, “সেটা এখন আমার কাছে, আর পাওয়া গিয়েছে ফুল্লরার ঘর থেকে।”

“তো দিয়েছে তো কী হয়েছে? আমার দরকার ছিল তাই কেতু এনে দিয়েছে”, ফুল্লরা উঠে জটিলের হাত থেকে হেডসেটটা নেবার মৃদু চেষ্টা করল।”

জটিল সেটাকে আবার পকেটে রেখে ফুল্লরাকে বসতে ইশারা করে বলল, “দরকার ছিল? তা বটে। ওইদিনই কেতুর সঙ্গে লুকিয়ে কথা বলার দরকার ছিল। তোমার এলোচুলে ঢাকা ওই এক-কানের হেডসেট, দিব্যি ঘুরতে ঘুরতে কথা বলবে, কেউ তোমাকে দেখে ফেললেও যাতে বুঝতে না পারে যে তুমি ফোনে কথা বলছ, তাই তো?

আবার বলে দিয়ো না যে তুমি দিল্লি থেকে তোমার দু'কানের হ্যান্ডসফ্রিটা আনতে ভুলে গিয়েছ বলে ওটা দিয়ে কাজ চালাচ্ছ। কারণ ওই দামী হ্যান্ডসফ্রিটাও তোমার ঘর থেকে পাওয়া গিয়েছে আর তুমি যখনই মোবাইলে কথা বলো তখনই ওই দু'কানের হ্যান্ডসফ্রিটা দিয়েই কথা বলতে দেখা গিয়েছে। ফুল্লরা, আর লুকিয়ে লাভ নেই, তোমাদের জানিয়ে দিই যে তোমাদের প্রত্যেকেরই ফোনের কললিস্টও চেক করা হয়েছে। তাই আর সময় নষ্ট না করে গল্পটা বরং আমিই বলি, কোথাও ভুল বলছি মনে হলে আমাকে তোমরা যে-কেউ থামিয়ে দিতে পারো।"

পরপর তিন চুমুকে কাপের চা-টা শেষ করে জটিল নতুন উদ্যমে বলতে লাগল, "ফুল্লরা আর কেতু আগেই পরিকল্পনা করেছিল যে চুরিটা ফুল্লরা করবে, কেতু তাকে সাহায্য করবে আর তারা ফাঁসাবে শর্মিকে। সকালে দোকান থেকে ব্লুটুথ হেডসেট এনে ফুল্লরাকে দিয়েছিল কালকেতু। অর্ধেন্দুবাবুর ঘর থেকে মন্দিরের চাবি নিয়ে বেরিয়ে কেতু ঘরের বাইরে দাঁড়ানো ফুল্লরাকে ইশারা করে চলে যায়। যেতে-যেতে নিজের মোবাইল থেকে ফুল্লরাকে ফোন করে কল চলা অবস্থাতেই ফোনটা নিজের বুকপকেটে রাখে। তখন কলের অপরপ্রান্ত ফুল্লরার এলোচুল ঢাকা এক কানে। ফোনের আওয়াজে সে চুরি করার টাইমিং বুঝে নিচ্ছে।

"মোরামের রাস্তায় কথামতো অপেক্ষারত শর্মির সঙ্গে দেখা করল কেতু। পকেট থেকে বের করল একটা কাগজ। এই কাগজটা," এই বলে জটিল যেটা তুলে ধরল সেটাকে ঠিক একটা কাগজ বলা চলে না। একটা বড় পাতার উপরে আর একটা কাগজের অনেকগুলো কুচি জিগশ্য পাজলের মতো করে আঠা দিয়ে বসানো হয়েছে, "এটা হল একটা ইউরিন রিপোর্ট। এতে দেখা যাচ্ছে যে শর্মি অন্তঃসত্তা। দেড় মাসের।"

ঘরে এবার রীতিমতো চাঞ্চল্য। সরোজকে দায়িত্ব নিতে হল সকলকে শান্ত হয়ে বসানোর।

"বাবা কে, সে প্রশ্নে আমি যেতে চাই না," জটিল বলল। তবে আমার মনে হয়েছে শর্মি আর কেতু দুজনেই মনে করেছিল যে এই বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে দুজনকে দূরে সরে যেতে সাহায্য করবে। প্রসঙ্গত আর একটু ভালভাবে জানিয়ে দিই যে, কেতু জানত শর্মি তাকে ভালবাসে না, কিন্তু শর্মি জানত না যে কেতু তাকে ভালবাসে না। আবার তারা প্রত্যেকেই কিন্তু অন্য একজনকে ভালবাসে। কেতু ফুল্লরাকে আর শর্মি রতনকে। এই ইউরিন রিপোর্টটা আগেরদিন কেতু নিয়ে এসেছিল কাছের ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে। শর্মিকে সেটা দেখানোর ছুতো করেই চুরি-খুনের দিনে মোরামের রাস্তায় ডেকেছিল সে। এই রিপোর্টের টুকরোগুলো পাওয়া গিয়েছে কেতুর ঘরের পিছনের একটা ঘন ঝোপের নীচ থেকে।

"যাইহোক, শর্মিকে রিপোর্টটা দেখিয়ে কেতু তাকে মন্দিরের চাবি দিয়ে মন্দির খোলার কথা বলে। এই কথোপকথন যখন চলছে তখন ফুল্লরা ভিতরের ঘর দিয়ে মন্দিরের ভিতরে ঢুকে মূর্তির গা থেকে গয়না খুলতে শুরু করেছে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে সে সব গয়না খুলতে পারছিল না, তাই ঝটকা দিয়ে-দিয়ে খুলছিল। এতে অনেক গয়না বেঁকে আর ছিঁড়েও গিয়েছে। শর্মিকে ছেড়ে দিয়ে কেতু ফোনে তার গতিবিধি কমেন্ট্রি করতে থাকে। উপায়ন্তর না দেখে ফুল্লরা রাধামাধবের মূর্তিই উঠিয়ে নিয়ে চলে আসে গন্ধমাদনের মতো। অন্যঘরগুলোয় সবাই দরজা এঁটে

ঘুমোচ্ছে। শুধু শর্মির ঘর খোলা আর ফাঁকা। মূর্তির গা থেকে সমস্ত গয়না ঝটপট খুলে ফুল্লরা মূর্তিটা একটা কাগজে মুড়ে শর্মির ঘরে রেখে আসে।"

"আর, গয়না?" অনেকেই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

"ওহো, দেখেছেন কাণ্ড! আপনাদের তো বলাই হয়নি," জটিল ভুলে যাওয়ার ছদ্ম অভিনয় করল। তারপর বলল, "আজ সার্চ করে গয়নাগুলো পাওয়া গিয়েছে অর্ধেন্দুবাবুর সিন্দুকের মধ্যেকার একটা চোরা খুপরিতে।"

মুহূর্তে সারা ঘরে নেমে এলো বিষাদ ও নিস্তব্ধতার কালো মেঘ। সেই মেঘের মধ্যে দিয়ে একজনই প্রতীয়মান হয়ে জটিলের কথার সত্যতা সর্বাংশে স্বীকার করে নিচ্ছিলেন — নুয়ে পড়া দেহ নিয়ে কপালে করাঘাতরত অর্ধেন্দু দত্ত চৌধুরি স্বয়ং।

একটু সময় দিয়ে জটিল আবার বলতে থাকে, "এমনিতেই এমন সম্ভাবনার কথা পুলিশ ভাবতে পারেনি বলেই অর্ধেন্দুবাবুর ঘর সার্চ করা হয়েছিল দায়সারাভাবেই। তাঁর সিন্দুক খুলে দেখা হয়েছিল, কিন্তু তা চোখ বোলানোরই সামিল। তার উপরে গতকাল যখন আমি বললাম যে গয়না এ বাড়িতে নেই, তখন অর্ধেন্দুবাবু অনেকটাই নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছিলেন।"

"কিন্তু কেন বাবা, কেন?" নির্মলেন্দু বলে ওঠেন।

জটিল বলল, "কারণটা কিন্তু বোধগম্য, নির্মলেন্দুবাবু। আপনাদের সে জমিদারী তো আর নেই। অবস্থা ক্রমশই পড়তির দিকে। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা প্রতাপনারায়ণ যে সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন, তার বেশিভাগটাই বিলাসিতায় খুইয়েছেন অর্ধেন্দুবাবু নিজে। তাছাড়া একটা জিনিস অর্ধেন্দুবাবু ছাড়া কেউই জানতেন না। এক জানতেন, নিহত দীননাথ চক্রবর্তী আর বহুকষ্টে জেনেছেন এই অধম জটিলেশ্বর সেন। সেটা হল এই মন্দির আর পুকুর কিন্তু দেবত্র সম্পত্তি করে গিয়েছিলেন প্রতাপ। একমাত্র এই বাড়িটাই যা অর্ধেন্দুবাবুর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। অর্থাৎ ওই মন্দিরের যাবতীয় সম্পত্তি আর পুকুর শুধু ভোগ করতে পারবেন তিনি আর তাঁর বংশধর, কিন্তু বিক্রি করতে পারবেন না। তাই, মূর্তির গয়না যদি চুরি করে বিক্রি করে ফেলা যায় তবে হাতে বিপুল অর্থও আসবে আবার লোকজনের সহানুভূতি কুড়িয়ে রাধামাধবকে ইমিটেশনের গয়না পরিয়েও রাখা যাবে। কী, ঠিক বলছি তো, অর্ধেন্দুবাবু?

"ভক্তরাই যদি খেতে না পায়, তবে ভগবানের কি স্বর্ণালঙ্কার পরে থাকা উচিত?" এবার কথা বললেন অর্ধেন্দুবাবু।

জটিল মুচকি হেসে বলল, "সে আপনি আর আপনার ভগবান বুঝবেন। ঘটনা হচ্ছে, আমাকে পারুন বা না পারুন, ফুল্লরাকে আপনি এটা ভালই বোঝাতে পেরেছিলেন। ফুল্লরা আবার সেই সুযোগটা লাগাল আর একটা কাজেও। এই চুরিতে কেতুর থেকে সাহায্য নিল। ঠিক করেছিল পরে তার ঠাকুরদাকে জানাবে কেতুর মহানুভবতার কথা।

কেতুকে হিরো বানিয়ে দেবে। আর, ঠাকুরদা একবার রাজি হলেই ফুল্লরা আর কালকেতুর বিয়ে আটকায় কে! কী, তাই তো ফুল্লরা?"

ফুল্লরা উপরে-নীচে ঘাড় নাড়ল।

জটিল কৃষ্ণেন্দুর দিকে ঘুরল, "কী, কৃষ্ণেন্দুবাবু, আপনার প্রশ্নের উত্তর পেলেন তো?"

কৃষ্ণেন্দুবাবু নড়েচড়ে বসে তাঁর বিস্ময় লুকোলেন। গলা ঝেড়ে বললেন, "নিজেদের জিনিস আমরা নিজেরা নিয়ে রেখেছি সেটা তো আর চুরি নয়। কিন্তু খুন? খুনটা কে করেছে?"

হাসল জটিল, "দেবত্র সম্পত্তি চুরি করা, পুলিশকে চরম বিভ্রান্ত করা, অন্যকে চুরিতে উসকানি দেওয়া, প্রমাণ অনত্র পাচার করে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা — এসবের কোনটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, কোনটা আদৌ অপরাধ সেসব তো আইন ঠিক করবে কৃষ্ণেন্দুবাবু। আমি তো সত্যানুসন্ধান করে পুলিশকে সাহায্য করছি মাত্র। তবে হ্যাঁ, মানুষ খুনটা সর্বতোভাবেই অপরাধ বটে। তাই সে প্রসঙ্গে অবশ্যই আসব। তার আগে নিহত ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন? দীননাথ কি তুকতাক জাতীয় কিছু করতেন?"

কৃষ্ণেন্দু বললেন, "ছোটবেলায় দানীজেঠু একটু কবিরাজী করতেন বটে। ইদানীং শুনেছি তার সঙ্গে পুজোআচ্চা মিশে গিয়ে একটা তুকতাকের রূপ নিয়েছে। যদিও আমি মনে করি তুকতাক আলাদা জিনিস। পুরোপুরি লোক ঠকানো। দানীজেঠু পুজোআচ্চাটা নিষ্ঠাভরে করতেন। আবার, যেটুকু কবিরাজী করতেন সেটাও মন দিয়েই।"

"মুশকিল কী জানেন, আপনি তুকতাক না ভাবলেও অনেকেই ভেবে বসেন। বিশেষত শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত কিছু হতভাগ্য মানুষ। তাঁরা এসবকে তুকতাক, তান্ত্রিকশক্তি ইত্যাদি ভেবে ফ্যালেন। এই যে বাগানের মালি অমরনাথ। বছরের পর বছর তার সন্তান হয় না। প্রৌঢ় থেকে বৃদ্ধ হতে চলেছে, বংশে বাতি দেবার কেউ নেই। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রীয়ের প্রবল অনুরোধে একটি ছেলেকে সে দত্তক নিল। কিন্তু নিজের রক্ত যে এক আলাদা জিনিস। এদিকে বয়স আবার ষাট ছুঁই-ছুঁই। তার অবস্থা দেখে পুরোহিত দীননাথ অনেকদিনই তাকে অনুরোধ করেছে একটা বিশেষ শিকড় বেটে খাওয়ার। কিন্তু অমরনাথের মেল ইগোতে বড়ই বাধত। তা, একদিন সে চোখ বুজে খেয়েই নিল। তার স্ত্রী তখন এখানেই ছিল। ম্যাজিকের মতো ফল। বছর না ঘুরতেই কোলে একটা ফুটফুটে সন্তান জন্মাল তাদের উড়িষ্যার বাড়িতে। শিকড় খাবার কথা বউকে না জানালেও কৃতজ্ঞতাবোধটাও একেবারে হারিয়ে ফেলেনি অমরনাথ। পালিত পুত্র ও নিজের দু'বছরের পুত্র সহ সস্ত্রীক এসে পড়ল দীননাথের পায়ে। গাছের ফলটা, জমির শাকটা যতটা যা পারল উপহার দিল। নিজের ছেলের নামকরণ করাল দীননাথকে দিয়ে। কেদারনাথ।

"সন্দেহের উদ্রেক হতে অমরনাথের স্ত্রী আলাদাভাবে দীননাথের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করল। দীননাথও সরল মনে সব কথাই জানাল। আর এও বলল যে তাদের শিশুপুত্র কেদারের লক্ষণ ভাল নয়, তাই আর এক ধরনের বিশেষ শিকড় নিয়মিত সেবন করানো দরকার শিশুটিকে।

"অমরনাথের স্ত্রী তার পুত্রকে নিয়ে উড়িষ্যা ফিরে গেল। অমরনাথকে সে শিকড়ের কথা কিছুই জানাল না। শিকড় বেটে সে নিয়মিত খাওয়াতে লাগল তার ছেলেটাকে। কিন্তু এক বছর বাদে তিন বছরের সেই বাচ্চাটা নানারকম অসুখ-বিসুখে ভুগতে লাগল। ছায়ার মতো অসুখ তার সঙ্গে লেগে থাকতে লাগল সর্বদা। একদিন ভয় পেয়ে অমরনাথের বউ সব কথা বলে দিল তার স্বামীকে। অমরনাথ তাকে খুব মারধর করল। বলল এ নিশ্চয়ই দীননাথেরই ষড়যন্ত্র। সে কোথায় যেন শুনেছে যে, তান্ত্রিক-কাপালিকেরা নতুন শিশুর জন্ম দিয়ে এইভাবেই বলির জন্য তৈরি করে। এখন তো আর সর্বসমক্ষে বলি দেওয়া যায় না, তাই এইভাবে দূর থেকেই বাণ মেরে বলি।

"দীননাথবাবু খুন হওয়ার কদিন আগে থেকেই অমরনাথের ছোট ছেলেটা কঠিন জ্বরে ভুগছিল। একশো তিন-চার জ্বর প্রায় প্রতিদিনই। অমরনাথ তার দেশের বাড়ি ফেরার জন্য ছটফট করছিল। এমন সময় অন্য এক অভাবনীয় সুযোগ এসে গেল তার।

"সেদিন গোধুলিবেলায় যখন দীননাথকে একটা পাথরের বেদিতে হেলান দিয়ে বসিয়ে রেখে কালকেতু চলে গিয়েছে, শর্মিষ্ঠা চাবি নিয়ে মন্দিরের দরজা খুলতে এসেছে, তখনই গোলাপের চারায় জল দিতে আসছিল অমরনাথ। দরজা খুলে শর্মি মূর্তি আর গয়না না দেখতে পেয়ে হতবাক হয়ে মুখে ওড়না চেপে যখন দাঁড়িয়ে পড়ল, তখনই তাকে আড়াল থেকে লক্ষ করল অমরনাথ। সে বুঝল যে রাধামাধব অদৃশ্য এবং শর্মি তাড়াতাড়ি দরজায় তালা লাগিয়ে কেটে পড়ার তাল করছে। অর্থাৎ একটা চুরি ঘটে গিয়েছে এবং এই চুরি দেখে নেওয়ার শাস্তিস্বরূপ দানীবুড়োর খুন হওয়াটাই অতি স্বাভাবিক ঘটনা। শর্মি পুকুরের গা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সে দীননাথের পিছনে এসে দাঁড়াল, আর দীননাথ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই তার চুলের মুঠি আগাছার মতো করে ধরে সিমেন্টের বেদিতে এক মোক্ষম বাড়ি। দীননাথের লাশের ছবি আমি দেখেছি। বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মাথা জুড়ে বড় বড় সাদা চুল ছিল। তেল চুপচুপে করে পেতে চুল আঁচড়াতেন তিনি। কিন্তু তাঁর মৃতদেহের মাথার মাঝখানের এক গোছা চুল খাড়া আর জড়ো হয়ে ছিল।

"হ্যাঁ, খুনের অস্ত্র বলতে ওই সিমেন্টের বেদিই। তবে আঘাত যতই হোক, মৃত্যুর মতো গুরুতর ছিল না। রক্তক্ষরণ হয়েছে, তবে ধীরে। তাই বেদিতে রক্তের কোনও চিহ্ন নেই। কিন্তু ওই আঘাতই দীননাথের দুর্বল হৃদয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলেছে যে, দীননাথের মৃত্যুর কারণ হার্টঅ্যাটাক।

"শর্মিকে ছেড়ে গিয়ে কেতু কিছুক্ষণ চৌধুরি বাড়ির দিকে যাবার অভিনয় করল। ঘরে গিয়ে সামান্য অপেক্ষা। তারপর আবার সে ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে মোরাম রাস্তা ধরে। কৌতূহলটা আর যাবে কোথায়! কিন্তু সামনে কারও দৌড়ে আসার শব্দ পেয়েই সে আবার উলটোদিকে অর্থাৎ বাড়ির দিকে ঘুরল।

অমরনাথ দৌড়ে এসে কেতুকে খুনের খবর দিল। খুনটা তো সে নিজেই করেছে, কাজেই কেতুর গতিবিধি নিয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকবেই বা কী করে?"

এবার মেঝে ছেড়ে দাঁড়িয়ে বাগানের মালি অমরনাথ। সে তোৎলাচ্ছে, "এ-এঠো কঁড় হ্যালা? কুথাকে বাব্-বাত বানিয়ে বলছেন? আমাকে ভি প্রমাণ দিতে হিব।"

আর পারল না জটিল। একেবারে হো-হো করে অট্টহাস্যে বৈঠকখানা কাঁপিয়ে দিল, "প্রমাণ? আরে, এই বিজ্ঞানের যুগে প্রমাণ বের করা কি খুব কঠিন কাজ ভাব নাকি অ্যাঁ! আচ্ছা বেশ, একটা নয়, দুটো প্রমাণ দিই তাহলে। শর্মির সাধের গোলাপ চারাগুলো, যেগুলোতে তোমার উপরে জল দেওয়ার ভার ছিল, সেগুলোর কয়েকটা তো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে দীননাথবাবুর সঙ্গেই। এছাড়া আরও কয়েকটা অক্কা পেয়েছে তোমার বাঁপায়ের চাপে। সেই ছাপ কি তোমার পায়ের সঙ্গে মিলছে না মনে করেছ? ঝুঁকে পড়ে দীননাথবাবুর নাকের নীচে হাত দিয়ে নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা যখন দেখছিলে তখন বোধহয় সেটা তুমি খেয়াল করোনি, তাই না?

"পায়ের ছাপটা জোরালো প্রমাণ নয় বলছ নাকি? আচ্ছা বেশ। তাহলে তোমার ওই হাতের দাগটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, ডানহাতের কবজির উপরের ওই আঁচড়টার কথাই বলছি।"

"উটো গুলাবের কাঁটারো দাগো অছি," গোল স্টিকিংপ্লাস্ট লাগানো কবজিটা ঝট করে দেখে নিয়ে বলল অমরনাথ। স্টিকিংপ্লাস্ট ছাড়িয়েও আঁচড় সামান্য বেরিয়ে আছে।

"গোলাপ? বটে! এত বছর ধরে তোমাকে স্টিকিংপ্লাস্ট দিয়ে আঁচড় ঢাকতে কেউ দেখেছে কি না জিজ্ঞাসা করো তো। আমি করেছি। না, তারা দ্যাখেনি। তোমার মনে ভয় আছে বলেই তুমি ওটা লাগিয়েছ। না না, ওটাকেই আমি প্রমাণ বলছি না। আমি শুধু বলছি যে ওটা গোলাপের কাঁটায় নয়, দীননাথবাবুর নখের আঁচড়। আমি জেনেছি যে তাঁর হাতের নখ যথেষ্ট লম্বা ছিল। প্রাণ বেরোনোর আগের মুহূর্তে তিনি তোমার কবজি আঁকড়ে ধরেছিলেন। ওই নখের আগায় লেগে থাকা ময়লাটুকুর ডিএনএ টেস্ট করলেই বেরিয়ে যাবে তিনি কাকে আঁচড়েছিলেন। এখন, তুমি যদি দীননাথ-খুনের কথাটা নিজের মুখে স্বীকার করো তাহলে ডিএনএ টেস্টের খরচটাও বাঁচে আর আর হয়তো তোমার ফাঁসিটাও। তা না হলে আমার তো মনে হয় না ঠান্ডা মাথায় এই খুনটাকে বিচারক যাবজ্জীবনের উপর দিয়ে ছেড়ে দেবেন বলে। এখন, সিদ্ধান্তটা তোমার।"

"মুইকে মাফো করি দিয়েন বাবু। বুড়োটকে রাগেরো মাথায় খুনঅ করি ফেলুচি।" কেঁদে পড়ল অমরনাথ। পা ছাড়িয়ে সরোজের দিকে ইঙ্গিত করে জটিল উঠে পড়ল।

"একটা প্রশ্ন আছে, জটিল। সকলের ধোঁয়াশা কাটিয়ে যা", এবার বাধাটা এল স্বয়ং সরোজের কাছ থেকে। জটিল ঘুরে বলল, "বেশ, বল।"

"তুই বলছিস যে রাধামাধবের মূর্তিটা মার্ডারও ওয়েপেন নয়? তাহলে ওতে ওই রক্তের দাগটা এল কোত্থেকে?"

"আরে, সেইজন্যই তো সর্বাগ্রে তোমার ওই গুণধর রতনটিকে সাসপেন্ড করা দরকার। ব্যাটা খুনের দায়টাও কেতুর উপর চাপানোর জন্য দীননাথের সামান্য একটু রক্ত নিয়ে মাখিয়ে দিয়েছিল ওই মূর্তির আগায়। কী, তাই তো?" রতনের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করে জটিল। রতন মাটিতে প্রায় মিশে গিয়ে সম্মতি জানায়।

জটিল বলল, "এই ধরনের ডেঞ্জারাস কাজ যে করতে পারে, সে কিন্তু খুনের মতো জঘন্য অপরাধও যেকোনও দিন করে ফেলতে পারে। আমার মনে হয় রতনের কাউন্সেলিং করা দরকার।"

***

দুদিন বাদে নিজের ঘরে আরাম করে বসে ড্রিঙ্ক করছে জটিল। এইমাত্র সরোজ এসেছে। তাকেও একটা পেগ বানিয়ে দিয়েছে সে। দু'চুমুকের পরে একটু উশখুশ করতে-করতে সরোজ কথাটা পেড়েই ফেলল।

"বলছিলাম কী জটিল, সেদিন সকলের সামনে বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। লজ্জার ব্যাপার। আমার মনে কিন্তু এখনও কয়েকটা প্রশ্ন রয়ে গেছে।"

"আবারও প্রশ্ন? এসো তবে, বধো এ পরান।"

সুযোগ পেয়ে জটিল গ্লাস রেখে গুছিয়ে বসল, "আচ্ছা, অমরনাথের ব্যাপারে এত জানলি কী করে?"

"অতি সহজে। উড়িষ্যার আমার এক পুলিশ বন্ধুর সাহায্য নিলাম। ফোনে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিলাম। সে সাদা পোশাকে অমরনাথের স্ত্রীয়ের বাড়ি গেল। দীননাথের মৃত্যুসংবাদ দিল। আর ব্যাস্, গড়গড় করে স্মৃতিচারণ করতে লেগে গেল বউটা। অবশ্য দীননাথ যে খুন হয়েছে তাকে জানানো হয়নি। তাহলে পেট থেকে কটা শব্দ বেরোত কে জানে। আর একটা ব্যাপার যেটা সুবিধে করে দিয়েছে সেটা হল উড়িষ্যার ওই প্রত্যন্ত গ্রামে মোবাইলের টাওয়ার পৌঁছয় না। তা না হলে, বলা তো যায় না, অমরনাথ হয়তো শিখিয়ে দিতে পারত। তা-ই তো বাড়ি যাবার জন্য ছটফট করছিল।"

"আর, রাধামাধবের সঙ্গে যে শর্মির চুলের কাঁটা বেরোল, সেটা?"

"ভাই সরোজ," জটিলের গলায় চরম অবজ্ঞা, "এসব শিশুসুলভ প্রশ্ন কেন যে করিস! আগের দিন রাতে শর্মি যে কেতুর বাড়ি গিয়েছিল সেটা তো শুনেছিলিস। কাঁটাটা সে ফেলে এল, আর সেটা পেয়ে কেতুও রাধামাধবের সঙ্গে রেখে দিল। কেল্লা ফতে। ভাল করে শোন, অত জনের মধ্যে সবচেয়ে ধুরন্ধর কিন্তু ওই কেতকুমার। রতন সার্চ করে যাবার পরে সে কাগজের মোড়া মূর্তিটা তার ঘরে পেয়েছিল। তারপর থেকেই সে ইচ্ছে করে এমন ভাব করতে থাকে যেন নিজের ঘরে কিছু একটা লুকোচ্ছে পুলিশের কাছ থেকে। আসলে সেটা ছিল ওর দৃষ্টি আকর্ষণ

করারই একটা চাল। পুলিশ মূর্তিটা পেল, ওকে অ্যারেস্ট করল। মূর্তির সঙ্গে শর্মির চুলের কাঁটাও পেল। আর কেতুও এমন একটা ভান করল যেন সে শর্মিকে ভালবাসে বলে তাকে বাঁচাতে চাইছে। একটা কথা বোঝ যে, কেতুর কিন্তু ধরা পড়ে যাবার খুব একটা ভয় ছিল না। দাদুকে হারিয়ে আর শর্মিষ্ঠার কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা পেয়ে কেতু হয়ে উঠেছিল বেপরোয়া। সে আসলে শর্মিষ্ঠাকে সত্যিই প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছিল। কেতু একের পর এক পুলিশকে যেসব মিথ্যে বলে চলেছিল সেগুলো তোদের খুব কাঁচা মনে হতে পারে, কিন্তু আমার আদৌ মনে হয়নি। আসলে কেতু ইচ্ছে করেই ওরকম কাঁচা মিথ্যেগুলো বলছিল। যাতে অবশেষে ও যে শর্মির অপরাধ নিজের মাথায় নিতে চাইছে এরকম ধারণাটাই হয়। এদিকে দ্যাখ, ওই ভয়ে চাবি ফেলে দেওয়া ছাড়া শর্মিষ্ঠা আর কোনও অপরাধই করেনি।

“আচ্ছা, এবার লাস্ট কোয়েশ্চেন,” সরোজের ভুরু এখনও সোজা হয়নি, “ফুল্লরার বিরুদ্ধে জোরালো কোনও প্রমাণ?”

“সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স, উইটনেস এসব তো আছেই। জোরালো একটা প্রমাণও আছে বটে। মূর্তিটার সঙ্গে তুই পেয়েছিস শর্মির একটা চুলের কাঁটা। আর আমি পেয়েছি আরও একটা জিনিস।”

“কী সে জিনিস?”

“পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে তোর ফেভারিট কোন দুটো বল”, জটিল জিজ্ঞাসা করে।

“দৃষ্টি আর ঘ্রাণ।”

“বেশ, তবে এই দ্যাখ।” পকেট থেকে একটা ট্যাবলেট রাখার ছোট্ট সাদা কাগজের প্যাকেট বের করল জটিল। প্যাকেট থেকে অদৃশ্য কিছু একটা বের করে ইঁদুরের লেজ ধরার মতো করে তুলে ধরে বলল, “দেখতে পাচ্ছিস?”

চোখ সরু করে আধ মিনিট তাকিয়ে থেকে সরোজ বলল, “হ্যাঁ, তা পাচ্ছি বটে।”

“কী রং বল তো?”

“কাল... না না, কালো নয়, বাদামী।”

“হুম। এবার চোখ বুজে এটা নাকে ঠেকিয়ে শোঁক তো, দেখি তোর ঘ্রাণশক্তির বহর।”

সেটা জটিলের কাছ থেকে নিয়ে দু’চোখ বুজে এক নাকের ছিদ্র বন্ধ করে আর এক নাকের ছিদ্রে ঠেকিয়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এক মিনিট ধরে সুগভীর নিঃশ্বাস নিল সরোজ।

“কী রে সরোজ? কিছু পেলি?”

"হ্যাঁ পেলাম তো। বিরক্ত করছিস কেন!" সরোজের মনোযোগে বন্ধ দু'চোখে এখন তৃপ্তির ইঙ্গিত।

"কী পাইলে হে নারীবাজ সরোজ?"

"বৈঠকখানায় তোর আর আমার মাঝে এসে বসা এক অপরূপ সুন্দরী যুবতীর মেহেন্দি করা চুলের গন্ধ। লওরা ফ্লাওয়ার।"

প্রচ্ছদ ও সাজসজ্জা

শাক্যমুনি ও প্রোজ্জ্বল

বিশেষ ধন্যবাদ

শর্মিলা ব্যানার্জি

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

ধন্যবাদ

অতনু

সত্র্যজিত

পাগলা দাশু

হস্তিমূর্খ

সম্পাদনা

প্রত্যয়

এই অব্যবসায়িক প্রচেষ্টাটি কে সহযোগিতা করতে এখানে ক্লিক করুন